বাবাকে

যাঁর কাছ থেকে গল্পের বই পড়ার দুর্দম আগ্রহ পেয়েছি

॥ সূচীপত্র ॥

১. রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রস্থানভূমি ১

২. কল্লোলের কোলাহল ৩৩

৩. অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ছোটগল্প ৬৮

৪. প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প ৯১

৫. বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প ১১৮

৬. জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প ১৪৩

৭. শৈলজানন্দের ছোটগল্প ১৬৯

৮. যুবনাশ্বের ছোটগল্প ১৯৪

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত রবিন পালের "কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ" শীর্ষক ছোট প্রবন্ধ সংকলনটির ভূমিকা লিখে দেবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে আনন্দিত হয়েছি। এর কারণ আধুনিক যুগের প্রধান গল্পকারদের সঙ্গে একালের একজন তরুণ সমালোচকের চিন্তাধারার সংযোগ কতদূর যৌক্তিক পারম্পর্যে বিধৃত হয়েছে তারই স্বরূপ সন্ধান করা। বলা বাহুল্য লেখকের নিবন্ধটি আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও এর মধ্যে একটি যুক্তিনিষ্ঠ মনের এমন অবারিত প্রকাশ ঘটেছে যে, লেখক চিন্তাশীল পাঠকের অজস্র সাধুবাদের যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের জনক এবং পোষ্টা, তাঁর পরে যাঁরা ছোট গল্প রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁরাও এই বিভাগে নিজ নিজ প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর রেখেছেন। কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে একদা যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল লেখক খুবই নিঃস্পৃহ ভাবে তার মূল্য তৌল করেছেন। বহুকালাশ্রিত নীতি নিয়মের প্রতি হুংকার এবং কুলহারা গোত্রহীন ঐতিহ্যসৃষ্টির বোহেমিয়ান উদ্দামতা কল্লোলযুগের লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এঁরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইয়ংবেঙ্গলদের সঙ্গে কথঞ্চিৎ তুলনীয়। ইয়ংবেঙ্গলের ছাত্র ও যুবকগণ যেমন ভারতীয় সংস্কার চূর্ণ করতেই উৎসাহী হয়েছিলেন, তেমনি কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকগণও সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রচলিত সংস্কারকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নতুন জীবন প্রত্যয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ইয়ংবেঙ্গলগণ যেমন প্রভূত মানসিক শক্তি সত্ত্বেও গোটা দেশটাকে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি, তেমনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরাও বিষয়বস্তু ও বক্তব্য ভঙ্গিমায় অভিনবত্বের আয়োজন করলেও সাহিত্যরসিক বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে পুরোপুরি নিজ কক্ষের মধ্যে আনতে পারেন নি। তবু উত্তর- রবীন্দ্র যুগের সাহিত্য ঘটিত আধুনিকতার উদ্ধত পতাকাটি তাঁরাই বহন করে চলেছিলেন, ইতিহাসে এ-সত্য স্বীকৃতির যোগ্য। কল্লোলগোষ্ঠীর প্রধান কথাকারদের (অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, জগদীশগুপ্ত, শৈলজানন্দ ও যুবনাশ্ব) গল্প ও উপন্যাসের মূল বক্তব্যগুলি শ্রীযুক্ত রবিন পাল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্ন মধ্যবিত্তসমাজ, দরিদ্রশ্রেণী, সমাজের অন্তেবাসী সম্প্রদায়কে কেন্দ্র ক'রে যে নতুন জলকল্লোল উত্থিত হল, তাতে স্বাদু পানীয়ের চেয়ে ক্লেদাক্ত পাঁকই ঘুলিয়ে উঠল বেশী, এবং এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখকের তাই ছিল মনোগত অভিপ্রায়। রোমান্স-ধর্মী বাস্তবতা, অতি-আবেগবহুল গণিকাজীবনের আদর্শায়িত বর্ণনা, কেরানি স্কুল মাস্টারি জীবনের অভিশাপ, সমাজ সংস্কারের আওতা - থেকে - বেরিয়ে - আসা যৌনজীবনের স্বাভাবিক উর্ধ্বায়ণ প্রভৃতি, নিষিদ্ধ অঞ্চলের জীবন্ত বর্ণনা, ক্লেদ ও কালিমা এঁদের রচনায় বদ্ধ জলার মতো দুঃসহ বোধ হয়েছিল। কিন্তু এঁরা জোলা হামসুনের মতো পরবর্তীকালের সাহিত্যের ইতিহাসে উত্তপ্ত বহ্নিবন্যা আনতে পারলেন না; কেউ কেউ আশাহীন আনন্দশূন্য মর্বিডিটির অতলে তলিয়ে গেলেন, কেউ ফ্রয়েড - অ্যাড্‌লার-

য়ুং-কে গুরুপদে বরণ ক'রেও কিশোরসুলভ আপ্তবাক্যের উপরে উঠতে পারলেন না; কেউ-বা সৌখিন অধ্যাত্মবাদের গেরুয়া উত্তরীয়ের অন্তরালে 'লিবিডো' সর্প শিশুগুলিকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করলেন। আসলে এঁরা সকলেই অল্পবিস্তর 'ডাইকোটমির' শিকার হয়েছিলেন। বাক্ প্রতিমা রচনায় অতিশয় দক্ষ হয়েও জীবনের এই দ্বৈধতা থেকে এঁরা নিজেদের মুক্ত করতে পারলেন না। সুতরাং কল্লোল একটা গোষ্ঠী হয়ে রইল, যুগ হতে পারল না। এইভাবে কেউ কেউ কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মূল্য বিচার ক'রে থাকেন। ব্লুম্স্বেরি গোষ্ঠীর মতো এঁরা সদম্ভে বলতে পারলেন না যে, তাঁদের রচনার পর থেকে বাংলা উপন্যাসের ছোটগল্পের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। তবু তাঁরা যে সংস্কারের বেড়া ভেঙে নিজের স্বাধীন সত্তাকে লেখার মধ্যে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন, এ-জন্য বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁরা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

লেখক শ্রীযুক্ত রবিন পাল, রবীন্দ্রনাথ থেকে যুবনাশ্ব পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের যে বিবর্তন আলোচনা করেছেন তা তথ্যসমৃদ্ধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত। নিজস্ব ভাবাবেগের দ্বারা আন্দোলিত হন নি বলে তিনি লেখকদের যথাযোগ্য স্বরূপ ঠিক ধরতে পেরেছেন। এই যুগ এবং এ-যুগের কথাসাহিত্যিক সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। বস্তুগত ভাবে ও নিঃস্পৃহ বৈজ্ঞানিকের মতো নিজের ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগাকে সরিয়ে রেখে সাহিত্যালোচনাই এ যুগের সমালোচকের প্রধান কর্তব্য। যাকে নব্য সমালোচনা অর্থাৎ 'New criticism' বলে, তাতে এই সাহিত্য বিশ্লেষণরীতি স্বীকৃত হয়েছে। লেখক কিন্তু বহু তথ্যের ভিড়ে মূল বক্তব্যের সূত্র হারিয়ে ফেলেন নি। তাঁর লেখবার রীতিটিও প্রশংসার যোগ্য; অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার যথাসম্ভব বর্জন ক'রে এবং ভাষাকে শাণিত সংহত করে তিনি অস্ত্রসজ্জা করেছেন। আমাদের সাহিত্যে প্রবন্ধের যথার্থ ভাষাবন্ধন এখনও তেমন পূর্ণতা লাভ করে নি। যৌক্তিকতা ও বাক্সংহতি প্রবন্ধের রচনারীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর নিবন্ধের আদর্শ ভাষা তৈরি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সৌরভময় গদ্যের পুষ্পিত বাক্পুঞ্জ আমাদের চমৎকৃত করে, কিন্তু অনেক সময়ে তাতে অপ্রাসঙ্গিক অতিশয়োক্তির ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়; যার নান্দনিক মূল্য থাকলেও যথার্থ প্রবন্ধের পক্ষে সেই ঐশ্বর্যবান বাগ্বিভূতি কিছু বাহুল্য বলে মনে হয়। প্রমথ চৌধুরীর ভাষাতেও বানিয়ে বলার ড্রয়িং রুমের রীতিটিতে উইটের ফুলঝুরি ঝরলেও তাতেও বিষয়ের চেয়ে বক্তব্যের বক্রতাই অধিক প্রাধান্য পায়। সে যাই হোক, বর্তমান পুস্তকের লেখক অতিশয়োক্তি, অপ্রাসঙ্গিকতা ও বাগ্বাহুল্য বর্জন করে প্রবন্ধের ঋজুপথ ধরে চলেছেন, এজন্য তাঁকে অজস্র সাধুবাদ দিই। যাঁরা এই যুগের বিশিষ্ট কথাকারদের লেখার যথার্থ মূল্য বুঝতে চান এই স্বল্প পরিসর নিবন্ধগুলি তাঁদের দীপবর্তিকার মতো কাজ করবে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের কাছে

এতোদিন পাঠক ছিলাম, এখন কতোগুলো হরফ বোঝাই কাগজ সুতোয় মলাটে গেঁথে ফেলে লেখক বনে গিয়ে বড়ই বিব্রত। লেখককে কলমপেষা মজুর বলেছেন শুধু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ও। (বিশ্বসাহিত্য/সাহিত্য) আমিও মজুরের মতো পরিশ্রম করেছি দিনের পর দিন। ধুলো, পোকা বা বিস্মৃতির হাত থেকে কয়েক হাজার গল্প ছিনিয়ে নিয়ে কখনো আনন্দে, কখনো বিরক্তিতে যখন পড়েছি ভালোমন্দ-লাগাগুলো লিখে রেখেছিলাম। পিঠের পিছনে তখন অনেক বিরুদ্ধতা এলোমেলো ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা মেনে নেওয়া ছিলো অসহ্য। তাই পরিশ্রমের মাত্রা বেড়েছে। কিন্তু এতেই আমার আনন্দ।

প্রাসঙ্গিক বলে জানাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. ফিল. নামে একটা সম্মান কাগজে পাকিয়ে আমাকে দিয়েছিল। সে তিন বছর আগের কথা। শ্রদ্ধেয় পরীক্ষক ডঃ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ও ডঃ শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায়ের প্রশংসা পেয়েছিলাম। আর আমার নির্দেশক ডঃ শ্রীউজ্জ্বল কুমার মজুমদার আমার প্রতি যে স্নেহ ও উদারতা দেখিয়েছেন তার তুলনা নেই। ডঃ শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক অপরিচিত লেখকের প্রথম বইয়ের সুন্দর একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এতে ছাত্র হিসাবে শিক্ষকের কাছে আমার ঋণ বেড়েই গেল। আজ এই উপলক্ষে এঁদের আমি প্রণাম জানাই। আমার কিছু বন্ধু ও ছাত্রছাত্রী সকাল দুপুর সন্ধ্যায় সংকল্পের প্রদীপশিখাটিকে অনাহত রাখতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের জানাই উষ্ণ শুভেচ্ছা। সংকলনের কয়েকটি প্রবন্ধ 'চতুষ্কোণ' এবং 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই সুযোগে পত্রিকা সম্পাদকদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আর, ইউরেকা প্রেসের রূপেন বাবু ও তাঁর দলবল যাঁরা যন্ত্রে-মন্ত্রে চিন্তাকে কালো অক্ষরে ধ'রে দিয়েছেন, তাঁদের নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানাই।

বর্তমানে তরুণ লেখকদের ক্রমবর্ধমান বিপদের কথাটা সবাই জানেন। যা বাজার পড়েছে তাতে বই লেখা চলতে পারে, কিন্তু তা ছাপানো ক্রমশঃ অসম্ভব হ'য়ে যাচ্ছে। হয়ত, ভবিষ্যতে বিস্তর হাতে লেখা বই থাকবে, মধ্যযুগীয় পুঁথির মতো। আমি-ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পেশ করা লেখার একটি ছোট টুকরো ঘষে মেজে নিয়ে সাহিত্যের বড়োবাজারে ভয়ে ভয়ে আসছি। বাদবাকী অংশটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হবার পাথেয় আপাততঃ আমার নেই।

লিট্‌ল ম্যাগাজিনের একটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রধানতঃ সে সময় যে সব তরুণ হাত মক্‌সো করতে শুরু করেন ও ভবিষ্যতে খ্যাতকীর্তি হন, তাঁদের কয়েকজনের ছোট গল্প নিয়েই আমার আলোচনা। আমি কিন্তু সেই পর্বের ইতিহাস

লিখতে বসিনি, একথা পাঠক স্মরণ রাখলে আমার প্রতি সুবিচার করা হবে। এক একজন লেখকের গল্পের পর গল্পের বিষয়বস্তু বিচার করেছি, লেখক-মানসিকতা, যুগপরিবেশ, বিষয় ও মানসের সাম্য বৈষম্য নিয়ে সীমিত ক্ষমতায় দু চারটি কথা বলেছি। আর দেখতে চেয়েছি বর্ণনায়, সূচনায়, সমাপ্তিতে, সংলাপ বা উপমা প্রয়োগে, সিদ্ধি কতো দূরে বা কাছে। তবে, অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করা এক কথা আর তা লোকের কাছে বর্ণনা করা আর এক কথা। তা সীমিত ও আক্ষেপজড়িত হ'তে বাধ্য। এ গুরুদায়িত্ব আমি কতোটুকু পালন করতে পেরেছি তা পাঠক বিচার করবেন, বন্ধুজনোচিত পরামর্শ দেবেন। বেশ কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। এই ভুল অনভিজ্ঞতা ও অসতর্কতার ফল। এজন্য পাঠকের কাছে প্রশ্রয়প্রার্থী। এটি আমার প্রথম বই। আনন্দের ভাগ যদি কাউকে দিতে পারি, তবে পরিশ্রম সফল বলে মনে করব।

রবিন পাল

প্রথম অধ্যায় ঃ রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রস্থান ভূমি

॥ ক ॥

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর "আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক সংকলনটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়েই সূচনা করেছেন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। [সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন— " পরবর্তীরা আত্মশ্লাঘায় যতই অগ্রসর হোক না কেন, অনুভূতির রাজ্যেসুদ্ধ তারা এমন কোনও পথের সন্ধান পায়নি যাতে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন নেই।" ১ একথায় অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে "তিনি কেবল নিজে অনবদ্য লেখা লেখেননি, মেধা ও মনীষায় যারা নিতান্ত নগন্য তাদের সুদ্ধ নির্দোষ লেখা লিখতে শিখিয়েছেন।"২ তেমনি একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, "আধুনিক বাংলা গল্প সাহিত্যের পটভূমি খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথকেই স্মরণ করা ছাড়া উপায় নেই।"৩ এই কথা মনে রেখে গল্পগুচ্ছের কয়েকটি দিকের আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রকৃতি

রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির এমন সার্থক সমন্বয়, এমন অতলস্পর্শী সম্পর্ক বয়ন, প্রকৃতির এমন বিচিত্র ব্যবহারের তুলনা নেই। তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতা তো ছিল, আর ছিল বাল্যাবধি তীব্র প্রকৃতিপ্রীতি। "কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত।"৪ ব্যক্তিগত নৈরাশ্যের মলিনতা নিয়ে কবি যখন শিলাইদহে পৌঁছান তখন বাংলার পল্লীর সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় হল, তা যেন আর একবার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটাল বলা যেতে পারে। "এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা, আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।"৫ "আমি ও লিখছিলুম এবং আমার চারদিকের আলো এবং বাতাস এবং তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল।" ছিন্নপত্রাবলীর এই দুটি উল্লেখ তাঁর মানসিক প্রস্তুতির স্বীকারোক্তি বলা যেতে পারে। এই নগর মুক্তির প্রসন্নতা, প্রকৃতি প্রেম, আবিষ্টতা নানা ভাবে এসেছে তাঁর ছোটগল্পে। কালিদাস ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোমান্টিক কবিদের রচনা তাঁর এই প্রকৃতি চেতনাকে কিঞ্চিৎ গতি দিয়েছে বলা চলে। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতির অবাধ প্রবেশাধিকার। তাঁর প্রকৃতি চেতনা যেমন কখনো কবিত্বপূর্ণ, কখনো দার্শনিকতার স্তরে উন্নীত। কিন্তু কখনই প্রকৃতিগত বাস্তবতার প্রতি সতর্কতার ও পুঙ্খানুপুঙ্খতার অভাব তাঁর নেই।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রায় নব্বইটি গল্পের মধ্যে কয়েকটি গল্প বাদ দিলে প্রকৃতির প্রবেশাধিকার প্রায় প্রত্যেক গল্পেই অনায়াসলক্ষ্য আসন জুড়ে বসেছে। গল্পগুচ্ছ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে গ্রামপ্রকৃতির প্রাধান্য, বাদবাকী লেখায় শহর প্রকৃতির প্রাধান্য।

সাধারণ একজন লেখকের মতো গল্পে পটভূমি নির্মাণে প্রকৃতির ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ করেছেন। তাতে শিলাইদহ পতিসরের নদীমাতৃক পল্লীর চিত্র যেমন আমরা পেয়েছি, তেমনি কলকাতার টুকরো চিত্র ও পেয়েছি। সেক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ শিল্পী প্রসিদ্ধির গতানুগতিক পথ ধরেন নি, তাতে মিলবে নিজস্ব উপলব্ধির উষ্ণতা।

প্রকৃতি ও মানবজীবন যখন একে অন্যকে সংবেদনশীল উপভোক্তার সামনে তুলে ধরে, তখনই উভয়ে নবতর ব্যঞ্জনালাভ করে। প্রকৃতি যেন মানবজীবন নাট্য সংঘটনের নানামুহূর্তে নব নব রূপে এসে দেখা দিয়েছে। সে কখনো উদার, কখনো নিষ্ঠুর, কখনো উদাসীন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনকে কাঁদিয়ে পোস্টমাস্টারের চলে যাওয়ায় রতনের অব্যক্ত মর্মবেদনা প্রভাবিত করেছে প্রকৃতিকে। 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনী শ্মশানে গিয়ে মানবপরিত্যক্ত হয়ে প্রকৃতির কাছ থেকেই পেয়েছে স্নেহের স্পর্শ ও বাঁচার প্রেরণা। 'রাজটীকা' গল্পের প্রমথ ট্রেনের চলন্ত কামরায় বসে সূর্যাস্তের লাল রঙে অনুভব করে বিলাতি পোষাকের জন্যই সে ইংরাজ দারোগার কাছে অপমানিত হয়নি। তখন তার হৃদয়ে ধিক্‌কার ও ক্ষোভে চোখে জল দেখা দেয়। 'মানভঞ্জন' এর গিরিবালা স্বামীর কাছে প্রীতি সম্ভাষণ আশা করেও যখন পেল না তখন মর্মযন্ত্রণার সঙ্গী হয়েছে দক্ষিণের বাতাস। আবার দুঃখের দিনে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে নায়ক নায়িকা খুঁজেছে সান্ত্বনা, সহমর্মিতা। যেমন—'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তী নিজের লাঞ্ছনাগঞ্জনার দুঃখ ভোলার চেষ্টা ক'রেছে জানালার দিকে চেয়ে যেদিকে গোলাপিফুলে আচ্ছন্ন কাঞ্চনগাছ। 'রাসমণির ছেলে' গল্পের ভবানীচরণ ছেলে কালীপদর মৃত্যুতে শোক যন্ত্রণায় নিদ্রাহীন রাতে দরজাখুলে সামনের জমিতে ছেলের বসানো পল্লবিত ঝুমকালতার দিকে চেয়ে থাকে। (বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' স্মরণে আসে) 'মাস্টার মশায়' গল্পের হরলাল যখন ছাত্রের টাকাচুরিতে বিপর্যস্ত, তখন লুণ্ঠিত মর্যাদার যন্ত্রণায় সে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া নিয়ে ময়দানের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তপ্ত মাথা খোলা জানালার ওপর রেখে চোখ বোজায় যদি প্রকৃতি তার মানসিক যন্ত্রণার উপশম করতে সাহায্য করে। অন্যদিকে প্রকৃতি নিষ্ঠুর রূপে আসে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে শিশুটি জলে তলিয়ে যাবার কালে, কিংবা 'দুরাশা'গল্পে ব্যর্থ প্রেমের নায়িকার তীব্র মর্মযন্ত্রণা প্রকাশ পায় প্রকৃতিবাহিত 'গম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান'-এ। আবার প্রকৃতি উদাসীন ভূমিকা নেয়, মানবজীবনের ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক ঘটনা বিক্ষোভে 'বৃহৎ নির্বিকার উদাসীনতা' নিয়ে আসে। যেমন—'মেঘ ও রৌদ্রে' গিরিবালা শ্বশুর বাড়ী যাওয়াতে শশিভূষণের দুঃখের মুহূর্তে জলের ওপর প্রভাতীরৌদ্র ঝিকমিক করে, আমগাছে পাপিয়া গান গেয়ে চলে, খেয়া নৌকা লোক বোঝাই হয়ে পারাপার হতে থাকে। 'শাস্তি' গল্পে উত্তেজনাবশতঃ রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে 'পরিপূর্ণ শান্তি।' রাখালবালক গরু নিয়ে এবং চাষীরা চর থেকে পাকা ধানের আঁটি নিয়ে ফিরে আসে।

নিরপরাধ চন্দরা হত্যার দায়ে চালান হয়ে গেলে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ আগের মতই চলতে থাকে। "এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখদুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায় —কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে·····সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতাপূর্ণ মনে হয়।"৭ এই উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এমন উদাসীন উপস্থিতিকে তুলে ধরেন। শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দোপাধ্যায় রবীন্দ্র উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন মহৎ শিল্পে প্রকৃতি "ব্যক্তিত্বের সামনে গূঢ় থেকে গূঢ়তর প্রশ্নই সদাসর্বদা তুলে ধরে।"৮ গল্পগুচ্ছে সন্ধান করলে এ ধরনের উদাহরণও মিলবে। 'একরাত্রি গল্পে স্কুলমাষ্টারের মনে প্রকৃতি এনে দিয়েছিল জীবন সম্পর্কে এক নির্লিপ্ত বৃহৎ উপলব্ধি যাতে ক্ষুদ্র জীবনে সুরবালাকে না পাবার অবরুদ্ধ বেদনার পরিবর্তে সঞ্চারিত হয়েছিল মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে 'অনন্ত আনন্দের আস্বাদ।' 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে বর্ষার খরস্রোতা নদীতেই ইংরাজ ম্যানেজারের অত্যাচারে বিষন্ন শশিশেখরের হৃৎপিণ্ডে উত্তপ্ত রক্ত ফুটতে থাকে, সে পরাধীনতার মালিন্যকে দ্বিতীয়বারের মত প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বদেশক্ষুব্ধের মতো প্রতিকারে সক্রিয় হয়। 'অতিথি' গল্পের তারাপদ বর্ষা নদী-প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসেই বিবাহসূত্রে আসন্ন "আবদ্ধ আসক্ত ভাব"কে তীব্রমাত্রায় অনুভব করে, তার মনে প্রশ্ন জাগে—কোনটা গ্রহণীয়। শেষ পর্যন্ত সে ভাবী শ্বশুর পরিবারের সঙ্গ ত্যাগ করে যায়। 'গুপ্তধন' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় অবরুদ্ধ স্বর্ণভাণ্ডারে বুঝেছিল স্বর্ণলুব্ধতায় প্রাণের মুক্তি নেই। তখন গোধূলির স্বর্ণাভায় গ্রাম্যকুটির থেকে আরম্ভ করে গ্রামের 'ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার' এবং "ধরণীর উপরিতলের বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার" অপরিসীম মূল্য সে তীব্রতায় উপলব্ধি করতে পারে।

শ্রীযুক্ত আনোয়ার পাশা তাঁর 'রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা' নামক গ্রন্থে সুন্দর দেখিয়েছেন নদী, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি ঋতু ঝড় ও জ্যোৎস্না—প্রকৃতির এইসব উপকরণ ও বৈচিত্র্য রবীন্দ্র গল্পে নানান মেজাজে নানা ইঙ্গিত বহন করে উপস্থিত হয়েছে। যেমন 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন-এ খোকাবাবুকে পদ্মা গ্রাসের মুহূর্তে, 'শাস্তি' গল্পে ছিদাম-দুখিরামের গরীব পরিবারের ভাঙনের মুখে বৃথাই অন্তিম অবলম্বনের মুহূর্তে ভয়ঙ্করী পদ্মার বর্ণনা পাই। অন্যদিকে 'অতিথি' গল্পের 'বন্ধন অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয়' তারাপদর দোসর হয়ে উঠেছে গল্পান্তের সেই অতুলনীয় নদী চিত্র। বর্ষা বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই দুঃখ বেদনার আবহ রচনা করেছে। রতন যখন পোষ্টমাষ্টারের চলে যাওয়ার কথা শুনল বা পোষ্টমাষ্টার চলে গেল, এ দুজায়গাতেই বর্ষা ও বর্ষাবিস্ফারিত নদীর কথা এসেছে। কাদম্বিনীর একমাত্র আশ্রয় সইয়ের গৃহত্যাগের মুহূর্তেও অবিশ্রাম

বৃষ্টি পড়ে। শহর জীবনে অতিষ্ঠ ফটিকের নিরুদ্দেশ হওয়া এবং পুলিশের সঙ্গে ফিরে আসার মুহূর্তে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ে। 'মেঘ ও রৌদ্রে' গিরিবালার বেদনা কান্না অভিমানের চিত্রে ও শশিভূষণের শেষ যাত্রার বেদনায় বর্ষা পরিবেশ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্ততঃ দুটি গল্পে (মানভঞ্জন, হালদার গোষ্ঠী) নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্বের জয় শেষপর্যন্ত সূচিত হয়েছে বসন্তের আবহে। শরৎ ঋতুতে বাৎসল্যস্নিগ্ধ পরিবেশটি সুন্দর ফুটেছে 'কাবুলিওয়ালা'র। 'খাতা' গল্পে উমার শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পে সন্তানদের সাধ মেটাতে না পারায় পিতৃহৃদয়ের বেদনা শরতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল-তায় বৈপরীত্যে আঁকা হয়েছে আর, ঝড় এসেছে জীবনের সব নিয়মকানুনকে বুঝি তছনছ করে দেওয়ার জন্য। 'একরাত্রি' বা 'মহামায়া' গল্পের নায়ক-নায়িকা গতানুগতিকতার গণ্ডী ভেঙ্গে পরস্পরের পাশে এসেছে ঝড়ের মধ্যে। অনুরূপভাবে জীবনে ঝড় উঠেছে প্রাকৃতিক ঝড়ের তালে তালে 'দৃষ্টিদান', 'আপদ', 'প্রতিবেশিনী', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পে। আর 'নিশীথে' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে চাঁদের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম গল্পে, নায়কের দু'বার ভালোবাসার স্বীকারোক্তির কালেই জ্যোৎস্নালোক মানসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। 'ক্ষুধিত পাষান'-এর নায়কেরও এক ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে মনে হয়েছিল আরব্যউপন্যাসের একটি রাত যেন তার কাছে উড়ে এসেছে। আর, জ্যোৎস্না মনের অভ্যন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে 'মহামায়া' বা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে।

রবীন্দ্রনাথের আরো কতকগুলি গল্প আছে যেখানে প্রকৃতি যেন অভেদকল্পনার সজীব প্রধান্য পেয়েছে। যেমন—'সুভা'। বোবা মেয়েটির তাকানো বা নৈঃশব্দ্যকে লেখক প্রকৃতির উপমান দিয়েই বলেন ("অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষ ভাবে চাহিয়া থাকে" এবং "নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন")। সুভার বাক্যগত অভাব-পূরণে প্রকৃতি নিয়েছে পরিপূরকের ভূমিকা—"প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়"। সেই সুভা যখন প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয় তখন যে তার দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে, সেটা স্বাভাবিক। 'বলাই গল্পেও নিঃসঙ্গ মাতৃহারা বলাই প্রকৃতিকে যেন মানুষেরই পরিবর্ত হিসাবে পেয়েছিল, তাই ঘাসের লনে গড়াতে গিয়ে "সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিলখিল করে হেসে উঠত" কিংবা, "দেবদারুবনের নিস্তব্ধ ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছমছম করে—এই সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়"। বলাইএর এই অনুভূতি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও হুইটম্যানের প্রকৃতিসম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে তুলনীয়, যদিও সামগ্রিক বিচারে দেখা যায়, রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকৃতির অতিশয় প্রাধান্য থাকলেও গল্পে কোনো প্রকৃতি বিষয়ক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতির এই অপর্যাপ্ত ও অতুলনীয় ব্যবহারের উত্তরাধিকার নিয়ে স্বভাবতঃই উত্তরসূরী লেখকদের যুগপৎ গর্বিত ও বিব্রত বোধ করার কথা। বুদ্ধদেব বসুর গল্পে প্রকৃতির ব্যবহার কম নেই। তাঁর 'রোদ' গল্পে সকালে ঘাসের গন্ধে সুরথ শৈশব অনুষঙ্গ ফিরে পায়, তারপর দুপুরে খর রৌদ্রে সব কোমলতা হারিয়ে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। 'আমরা তিনজন' গল্পে অন্তরার মৃত্যুতে তিন তরুণ প্রেমিকের দুঃখ প্রকৃতিতে আরোপিত—"যে তারা ছিলো মাথার উপর নেমে এলো পশ্চিমে, যে-তারা ছিলো চোখের বাইরে উঠে এলো দিগন্তের উপরে, পুবের কালো ফিকে হলো, ছোটো ছোটো অনেক তারা মুছে গিয়ে মস্ত সবুজ একলা একটি তারা জ্বলজ্বল করতে লাগলো সেখানে"। গল্পগুচ্ছের কয়েকটী গল্পে পদ্মাপরিবেশ ধরা পড়লেও তাকে আঞ্চলিকতা বলা যাবে না, কিন্তু এ ব্যাপারে রানীগঞ্জ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলকেন্দ্র করে শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্কর যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধতা সুন্দরভাবে এসেছে বিভূতিভূষণের গল্পে। তিনি কখনও প্রকৃতিকে অলৌকিকত্বের বর্ণনায় ব্যবহার করেন('মেঘমল্লার গল্পে জ্যোৎস্না) কখনও প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথের বলাইয়ের মতোই মানবের অভেদকল্পনায় দেখেন (কনে দেখা)। রুক্ষ-প্রকৃতিকে তারাশঙ্কর ব্যবহার করেছেন মানব অনুভবের বর্ণনায়, যাতে রবীন্দ্রনাথের ছায়া নেই। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর যেন বিলীয়মান দেশ, রীতিনীতি ও ভূদৃশ্যের দলিল রচয়িতা হয়ে থাকেন। তারপরে লেখকরা যতই শহরবাসী হয়েছেন, শহর যত প্রকৃতির প্রতি অত্যাচারী ও উদাসীন হয়েছে, সাহিত্যে ততই প্রকৃতির ব্যবহার বৈচিত্র্য কমে এসেছে।

প্রেম

বাঙলা সাহিত্যে প্রেমের অভিষেক করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ একথা অস্বীকার করা যাবে না। রবীন্দ্রগল্পের সূচনাপর্ব থেকে প্রেমপ্রসঙ্গ নানা ভাবে উপস্থিত হয়েছে। প্রাক রবীন্দ্রগল্পে প্রেম চিত্ররচনায় বঙ্কিম বা সঞ্জীবচন্দ্র সামাজিক রক্ষণশীলতা ও নৈতিক শুচিতার শিকার হয়েছেন। যে ক্ষেত্রে বাল্য-বিবাহের যুগে প্রেমের গল্প লেখাটাই দুঃসাহসের পরিচয় সেখানে রবীন্দ্রনাথ নারীর বিচিত্র মনোলোককে উদ্‌ঘাটন করেছেন, সমাজের সঙ্গে তার বিরোধ বর্ণনা করেছেন, অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতঃই বিদ্রোহের পক্ষে। তাই তাঁর গল্পে বৈধব্য প্রেমের পথে বাধা হয়না (প্রতিবেশিনী), কুলমর্যাদা প্রেমের তরঙ্গে ভেসে যায় (ত্যাগ)। এ ব্যাপারে যত বয়স বেড়েছে তিনি দুঃসাহসী হয়েছেন। 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম গল্প 'ঘাটের কথা'ই প্রেমের গল্প। স্বামীকে পুনর্বার ফিরে পেয়ে কুসুমের হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া স্বামীর প্রত্যাখ্যানে সে আত্মহত্যা করে। 'মহামায়া' গল্পের মহামায়া ও রাজীবের প্রেম ছিল সামাজিক ভাবে অস্বীকৃত। বলপূর্বক তাকে গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন বিধবা হয়ে সহমৃতা হবার কালে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়ে সে রাজীবের কাছে যায়

ও দুজনে সংসার করতে থাকে। তবে মহামায়া কখনোই ঘোমটা খোলে না। অবশেষে একদিন ঘটনাচক্রে তার দগ্ধ কুৎসিত মুখ রাজীব দেখে ফেললে মহামায়া ঘর ছেড়ে যায়। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের রুগ্ন হরসুন্দরী ও তার স্বামী নিবারনের ভালবাসা দ্বিতীয় বধূ শৈলবালার আগমনে ঈর্ষাদীর্ণ হয় ও শৈলের মৃত্যুর পর প্রেমের সে ব্যবধান আর কাটে না। 'সমাপ্তি'-তে প্রেমের স্নিগ্ধতার প্রাধান্য। দুরন্ত গ্রাম্য মেয়ে মৃন্ময়ী কি করে প্রেমময়ী গৃহবধূ হয়ে উঠলো তারই সুন্দর চিত্র। 'উদ্ধার' গল্পে সন্দেহপ্রবণ স্বামী স্ত্রীর জীবনকে কিভাবে বিষময় করে তুলল তার চিত্র আছে। নায়িকা গৌরী নিরুপায় হয়ে গুরুদেবের কাছে গিয়েছিল তার সহযোগিনী হয়ে সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করবে বলে। কিন্তু সেই গুরুদেবকেই যখন সে লুব্ধ দেখল, তখন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেম প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা প্রনিধানযোগ্য ঃ— "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের মধুর ও প্রেমময় চিত্র বড় চোখে পড়ে না, যেখানে আছে—পাত্র-পাত্রীর সেখানে গৌণ ভূমিকা।"৯ ব্যতিক্রম-তারাপ্রসন্নের কীর্তি, প্রতিহিংসা, চোরাই ধন।

রবীন্দ্র পরবর্তী ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা দাম্পত্য প্রেম অপেক্ষা অন্যধরণের প্রেম প্রসঙ্গেই বেশী মনোযোগী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে দু'ধরণের প্রেমের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়েছে। কল্লোলপর্বের লেখকদের গল্পে বিবাহিত প্রেমের চিত্র থাকলেও সেই প্রেমকে অর্থনৈতিক সংকট, আদর্শগত ব্যবধান বা স্বামীর পূর্বপ্রণয় জটিল করে তুলেছে দেখা যায়। যেমন প্রেমেন্দ্রের 'স্টোভ' ও 'ভূমি কম্প'। আদর্শগত ব্যবধান এবং স্ত্রীর গৃহত্যাগের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন 'স্ত্রীর পত্র' বা 'পয়লা নম্বর'—এ। এতটা স্পষ্ট বিদ্রোহ বিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকের বাংলা গল্প উপন্যাসে বিরল। আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবিরোধে স্ত্রীর গৃহত্যাগের প্রসঙ্গ যা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'মমতাদি' গল্পে দেখা যায়, তা রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বহির্ভূত ছিলো। বিবাহপূর্ব প্রেম বিষয়ে (অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ভাষায় বিবাহের চেয়ে বড়ো) রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। 'দালিয়া' গল্পে ধীবরগৃহে লালিত রাজকন্যা আমিনার সঙ্গে আরাকান রাজ দালিয়ার প্রেমের রোমান্টিকতা বর্ণিত হয়েছে। 'জয়পরাজয়'—এও তাই। ভারতী গোষ্ঠীর চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা'য় জয়পরাজয়ের ছাপ আছে। 'কংকাল' গল্পের নায়িকা, প্রণয়ীকে বিয়ে করতে যেতে দেখে তাকে বিষ খাইয়ে ও নিজে বিষ খেয়ে মরে হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্তটিকে অমর করে রাখার চেষ্টা করে। 'একরাত্রি' গল্পের ব্যর্থ স্বদেশব্রতী স্কুল শিক্ষক বিনয় তার বাল্যপ্রণয়িনী সুরবালাকে দুর্যোগময় দিনে এক উঁচু জায়গায় তারই মত আত্মরক্ষার্থে

উপস্থিত দেখে অপ্রাপ্তির এতাবৎ বাঞ্ছিত দুঃখ ভুলে এই ক্ষণমুহূর্তের মধ্যে বিভোর হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পে ব্রাউনিং প্রভাবিত এই রোমান্টিক চিন্তনের অনুসরণ মেলে। 'নষ্টনীড়' গল্পে বৌদি ও দেবরের প্রণয়-মানসিকতার বিস্তৃত চিত্র আছে। 'আঁতের কথা বার করে দেখানো'র নতুনত্বের জন্য সেকালের রক্ষণশীল সমাজে রবীন্দ্রনাথ নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের সমাজ গল্প উপন্যাসে এ ধরণের অসম সম্পর্কের প্রেমকে মেনে না নিয়ে পারেনি। প্রেমের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরবর্তীকালের অনেক লেখকের কাছেই তা প্রেরণাস্থল হয়ে আছে। রবীন্দ্রমানসেও যে এককালে সামাজিক দ্বিধা ছিল তা প্রেমের গল্পের ঘটনা সমাপ্তিতে ও নায়িকা নির্বাচনে স্পষ্ট হয়। তাঁর গল্প সাহিত্যে প্রাক সবুজ পত্র যুগে প্রেমের গল্পের অনেক নায়িকাই অকাল বিধবা যেমন—কুসুম (ঘাটের কথা), নায়িকা (কংকাল), মহামায়া (মহামায়া), গিরিবালা (মেঘ ও রৌদ্র) ইত্যাদি।

তবে কয়েকটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছেন দেখা যায়। 'ত্যাগ' গল্প অসবর্ণ বিবাহে রক্ষণশীল পরিবারে অসন্তোষ চিত্রিত হয়েছে। হেমন্ত যে শেষপর্যন্ত তার স্ত্রী কুসুমকে ত্যাগ করল না, সমসাময়িকভাবে কালের বিচারে এই সামাজিক বিদ্রোহ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালের রচনায় অনেক নায়িকা রক্ষণশীল সমাজের কাছে নতি-স্বীকার না করে গৃহত্যাগ করেছে, যেখানে গৃহত্যাগের পরের সমস্যা নয়, বেদনাই আলোচ্য হয়েছে। যেমন—পয়লা নম্বর। ইতিমধ্যে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ক্রমশঃ ভেঙে যাওয়ায় এবং অসবর্ণ বিবাহের ক্রমজনপ্রিয়তায় গল্প উপন্যাসে প্রেমের গতিবিধি বেড়েছে।

'বোষ্টমী গল্পে গুরুঠাকুর বোষ্টমীকে বলেছিল—"তোমার দেহখানি সুন্দর"। কিন্তু রবীন্দ্রগল্পে এই দেহনির্ভর প্রেমের স্পষ্ট উপস্থিতি বিরল। এই প্রসঙ্গে 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পে দেবর কর্তৃক বৌদিকে চুম্বন বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যায়। শেষজীবনে 'ল্যাবরেটরী' গল্পে মোহিনীর 'প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস'—এর ইঙ্গিত দিয়ে, অধ্যাপকের 'দুইগালে চুমো' দেবার কথা বলে এবং পাতলা শিল্কের সেমিজ পরা নীলার রেবতীর কোলের ওপর বসে গলা জড়িয়ে ধরা'র বর্ণনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ যতই 'সাদায়-কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজম' সৃষ্টির চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর গল্পপাঠে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে এসব অংশ বেমানান মনে হয়। অবশ্য, বিস্ময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কবিতা বা নাটকেও শরীরী প্রেমের, শরীরী বর্ণনার কিন্তু অভাব নেই। (যেমন, ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ১৪নং কবিতা, 'কড়ি ও কোমল'-এর 'স্তন'

'চুম্বন', বিবসনা, দেহের মিলন' প্রভৃতি কবিতা) যে কোন কারণেই হোক কথাসাহিত্যে তিনি এতটাও আসতে চান নি।

পরবর্তীকালে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্প উপন্যাসে দেহাশ্রিত প্রেম অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর হুইটম্যান, হ্যামসুন, এইচ জি ওয়েলস ও লরেন্সপড়া বুদ্ধদেব বা অচিন্ত্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সরব হয়েছেন। কল্লোল শ্রাবণ ১৩৩৪-এ প্রকাশিত ভবানী ভট্টাচার্যের "কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের 'সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা'। তাই প্রেমের দৈহিকতা ও শরীরী স্বেচ্ছাচারিতার 'পাপের, কথা লিখে তাঁরা যেমন রবীন্দ্রনাথের অপূর্ণতা মোচন করতে চেয়েছিলেন, তেমনি 'দেশের তরুণ-তরুণীদের Universal প্রেমের মন্ত্রে মন্ত্রণা দিতে চেয়েছিলেন'। বুদ্ধদেবের 'রজনী হল উতলা', অচিন্ত্যের 'বেদে' যুবনাশ্বের 'কালনেমি' গল্পের কথা এই সূত্রে মনে পড়ে। রবীন্দ্র সৃষ্টির এই অপূর্ণতা মেনে নিলেও প্রেম মনস্তত্ত্বে তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতাকে অস্বীকার করা অনুচিত হবে। একে অতিক্রম করা তরুণদের কাছে বেশ কষ্টকর হয়েছে। তরুণ প্রেমেন্দ্র যখন লেখেন "জীবনের সার্থকতা এই প্রেমের জাগরণে। যতদিন না এই প্রেম জাগে ততদিন মানুষ খণ্ডিত থাকে, সে নিজেকে পায়না সম্পূর্ণ করে"১০ তখন রবীন্দ্রনাথের প্রেমচিন্তনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'শেষের কবিতা'কে বুদ্ধদেব যখন 'আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ ধাঁধানো মূর্তি'১১ রূপে দেখেন এবং এর 'বিষয় নির্বাচনে, রীতি-গঠনে, তরুণ প্রভাবের কথা" বলেন,১২ তখন সেখানেও অন্যোন্য সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রগল্পে প্রেমিক-প্রেমিকা প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত। শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্কর সেক্ষেত্রে নীচের তলার মানুষের প্রেম বর্ণনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

দেশকালসমাজ ও বাস্তবতা

শোনা যায় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাকি রসিকতা করে বলেছিলেন, ওটাতো দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের জীবনী হয়েছে। কিন্তু এটা নেহাৎই কথার কথা। মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, একথা মানতে যদি আমাদের গোঁড়ামি না থাকে, তাহলে রবীন্দ্র মূল্যায়নের শুরু করতে হবে কিন্তু ওই জমিদার-পৌত্র পরিচয় থেকেই। সৌন্দর্যপ্রীতি, সংগীত প্রেম, নানা সুকুমার কলাচর্চা, ইংরেজীচর্চা, প্রভৃতির প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রেই। বাঙালী চরিত্রের জাড্যের বৈপরীত্যে রবীন্দ্রনাথ আজন্ম যে গতির জয়গান গেয়েছেন, কর্মযোগী হতে চেয়েছেন, নানাবিধ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি আনার এবং ধর্মের ব্যাপারে সংস্কার বর্জন করার চেষ্টা করেছেন, এগুলোও এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে।

কিন্তু, একথাও বলতে হবে, জমিদারের পুত্র বা পৌত্র বলতে আমাদের যে ধারণা হয়, রবীন্দ্রনাথ সে ধারণা নিজের হাতেই ভেঙেছেন। ফরাসী সাহিত্যিক বালজাক অভিজাত-তন্ত্রের সমর্থক হয়েও বিত্তবানের অর্থলালসা, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য কুফলগুলিকে স্পষ্ট তুলে ধরেছিলেন, সহানুভূতি জানিয়েছিলেন শোষিত শ্রমজীবীর প্রতি। শিলাইদহের এই পৃথিবীখ্যাত জমিদারকেও আমরা দেখেছি (অন্ততঃ একবার) মনুমেন্টের তলায় বক্তৃতা দিতে। দেশকাল সমাজ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ যে তরুণ বয়স থেকেই আমৃত্যু ছিল এর বিস্তর প্রমাণ আছে। একদা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলাসাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয় নি।"১৩ এটা ঠিকই বাংলাদেশ, বিশেষ করে গ্রামবাংলার প্রকৃতি, মানুষ, সমাজ-বিন্যাসের খানিকটা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা গল্পে নিয়ে আসেন। তবে শিলাইদহ পর্বে "অভিজ্ঞতার উৎসাহ' যতটা ছিল, কলকাতা বা শান্তিনিকেতন পর্বে তা কমেছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প লেখা হয়েছে প্রধানতঃ তিনটি জায়গায়—কলকাতা, শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন। ১৮৭৭-এ প্রকাশিত হয় 'ভিখারিনী' আর ১৯৪১-এ রচিত হয় "মুসলমানীর গল্প"। বলা যেতে পারে ছোট গল্প রচনায় তাঁর আগ্রহ চিরকালের।

১৮৯১-এর আগে কলকাতা থাকাকালীনই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল বিষাদ এবং নিষ্ফলতা ও ঔদাস্যের বোধ। সমসাময়িক ধর্ম, রাজনীতি সমাজ সাহিত্যের প্রচলিত ধরণে তাঁর অনুমোদন ছিল না। অগত্যা জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হলে তিনি প্রথমত অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও পরে রাজী হন। এই জমিদারী দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ থেকেই স্বদেশলক্ষ্মীর সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে, গল্পের পর গল্প লেখাও চলে "বাংলাদেশের আতিথ্যে"। গল্পগুচ্ছ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের দেশকাল হলো উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশ, বিশেষতঃ গ্রাম। পরবর্তীকালের গল্পে নগর জীবন, নাগরিক চরিত্র ও কিছু কিছু নাগরিক সমস্যা এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথেফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।"১৪ সত্যই, গল্পগুচ্ছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নের সামন্ততান্ত্রিক গ্রামসমাজের অনেক প্রসঙ্গ আছে। এখানে এসেছে পণপ্রথার কুফল, স্বামীর প্রভুত্ব, স্ত্রীর নিগ্রহ, বৈবাহিকদের স্বার্থ সম্পর্কের কথা (দেনা-পাওনা. যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ), পরিবর্তমান মূল্যবোধের প্রভাবে ধর্মভীরু সত্যনিষ্ঠ স্বামীর অবমাননা, পুত্রের সই জাল (রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা), সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতৃবিবাদ (ব্যবধান), কামার্ত নায়েবের হাতে ন্যায়ের পরাজয়, অসহায়াকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য সৎব্যক্তির নিগ্রহ (উলুখড়ের বিপদ), অসবর্ণ বিবাহে রক্ষণশীল পরিবারের প্রতিক্রিয়া

(প্রায়শ্চিত্ত), লুপ্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার গৌরব স্বপ্ন (ঠাকুরদা), জারজ সন্তানের প্রসঙ্গ (সমস্যাপুরণ), সহমরণ প্রথা (মহামায়া) দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া (পুত্রযজ্ঞ) প্রভৃতির কথা। এসব প্রসঙ্গ অধিকাংশই পল্লীপরিবেশে বর্ণিত। এই সূত্রেই উল্লেখ্য নূতন অর্থনীতির প্রভাবে অনেকেই কলকাতায় আসার আকর্ষণবোধ করছিল, ফেলনা, ফটিক, অপূর্ব-র লেখাপড়া শিখতে এবং ভাগ্যান্বেষণে তারাপ্রসন্ন-র কলকাতা যাত্রার মধ্যে তার ইঙ্গিত মেলে।

পল্লীপ্রসঙ্গের পাশে কিছু নাগরিক প্রসঙ্গও ছায়াপাত করেছে। যদিও এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কম, রূপায়ণদক্ষতা আরো কম। এরকম কয়েকটি হল—নাগরিকার ক্ষুব্ধ মর্যাদাবোধ (পয়লা নম্বর), মুৎসুদ্দির বংশে অর্থসর্বস্বতা (মাষ্টারমশায়), কলকাতায় মেসে ছাত্র-জীবন (রাসমণির ছেলে), মূল্যবোধের ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা, মনস্তত্ব নিয়ে বিত্তবান তরুণ-তরুণীর বেআব্রু আলোচনা (রবিবার), প্রেমে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি ও দেহের প্রাধান্য (ল্যাবরেটরী) ইত্যাদি।

গল্পগুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের সমাজপর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা অজস্রবার ধরা পড়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। বাঙালী রায়বাহাদুর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রেণীর উদ্ভব, তাদের বাড়িতে বিয়ে দেবার বাসনার কথা যেমন পাই, তেমন পাই নীলকুঠির সাহেবরা পোষ্ট অফিস বসাচ্ছে, রেশমের কুঠিতে বাঙালীরা চাকরী পাচ্ছে, অর্থনৈতিক কারণে কলকাতার ছেলে সামান্য বেতনে গ্রামে পোষ্টমাষ্টারি করতে যাচ্ছে। ডফ বা ডিরোজিয়ো সাহেবের ছাত্ররা যে এককালে নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ ক'রে, আচার না মেনে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল তাদের কথা পাচ্ছি। পাচ্ছি কলকাতায় লিটলম্যাগাজিন ও লেখক সংখ্যার প্রসার ও বঙ্কিমী উপন্যাসে আগ্রহের কথা। আর যক্ষ বা বিষকন্যায় গ্রামের লোকের বিশ্বাসের কথা।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমটায় গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও দ্বিতীয়টায় কলকাতার সচ্ছল চাকুরের ছবি আছে, হুতোমের বইয়ে বা সমসাময়িক স্মৃতিকথায় যার তুলনীয় চিত্র অজস্র মেলে।

(ক) "এমন কি মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকা হস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।" (সম্পত্তি সমর্পণ)

(খ) নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া এক ছিলিম তামাক পানের সহিত

নিঃশেষপূর্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যা:বেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়ন গৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।" (মধ্যবর্তিনী)

দুটো চিত্রই বাস্তব ও দীর্ঘকাল অবলুপ্ত প্রশান্ত জীবনচর্চার ছবি—রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ীর বাইরের পরিবেশ থেকেই নিখুঁত এই ছবি সংগ্রহ করেছেন গল্পের জন্য।

পূর্বোল্লেখ থেকে বোঝা যায় ছোট গল্পে ব্যবহারের জন্য এরকম অজস্র উপাদানে তাঁর দৃষ্টি ছিল। বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা যা আপাতভাবে তুচ্ছ, তা নিয়ে যে অপরূপ ছোটগল্প হতে পারে, বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ মিলতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের দেখালেন। তিনিই আমাদের পল্লীপ্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন, তবে পল্লীসমাজ ও তার গোটা বাস্তব চেহারার দিকে ততটা নয়। 'জীবনের ক্রূরতা কুটিলতা নগ্নতাকে" তিনি পরিহার করতে চান সজ্ঞানেই। কারণ, তাঁর ইচ্ছা 'আনন্দ-বিস্মিত দৃষ্টির' ভিতর দিয়েই বাংলাদেশকে দেখবেন ও দেখাবেন।

রবীন্দ্র পরবর্তী 'ভারতী' গোষ্ঠীর জলধর সেন, নিরুপমা, অনুরূপা দেবীর রচনায় প্রধানতঃ গ্রাম অবলম্বিত হয়েছে। যেমন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, গোকুল নাগ প্রভৃতির রচনায় নগরের দেশকালসমাজ উপস্থাপনের প্রয়াস আছে। তবে, এঁরা কেউ যথার্থ কালসচেতন বাস্তববাদী লেখক ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রধানতঃ পল্লীসমাজের সমস্যা বহু বৈচিত্র্যে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তার-ও সীমাবদ্ধতা আছে। কল্লোলীয়রা প্রধানতঃ নগরমুখী যদিও কেউ কেউ পল্লীমুখী। বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র প্রধানতঃ নাগরিক সমাজ, শৈলজানন্দ প্রধানতঃ পল্লীসমাজ, অচিন্ত্য এ দুই সমাজকেই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের রচনায় যেমন জমিদারী নিপীড়ন, ধনীর শোষণ, অত্যাচার, ষড়যন্ত্রের কথা আছে, তেমনি আছে স্বামী নিগ্রহ, মুসলমান কর্তৃক হিন্দু বিধবা হরণ, পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম ইত্যাদি। তবে, পল্লী সম্বন্ধে এঁদের কারুরই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের থেকে ব্যাপ্ত নয়। নৈরাশ্য যেমন রবীন্দ্রনাথকে পল্লীমুখী করেছিল, তেমনি নৈরাশ্য তরুণ লেখকদের অভিজ্ঞতার নূতনজগৎসন্ধানে কিছুটা তৎপর করেছিল। কিন্তু নানা কারণে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। পরবর্তীকালে চতুর্থ দশকেই সামাজিক কারণেই গ্রাম বাংলার দিকে অধিকাংশ লেখকেরই সহানুভূতির দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল—তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের গল্পে তার সার্থক পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত প্রতিঘাত ছিল।"১৫ গল্পগুচ্ছে এর স্বাক্ষর আছে। যেমন—রাজনৈতিক আন্দোলনে অন্যায়ের ব্যর্থ প্রতিবাদ, তজ্জনিত নিগ্রহ ও দাসমনোবৃত্তি

(মেঘ ও রৌদ্র), কংগ্রেসী রাজনীতি ও তোষণ প্রবৃত্তিদ্বারা খেতাবলাভের প্রতি ব্যঙ্গ (রাজটিকা), আমলাতান্ত্রিকতা ও পুলিসের সমালোচনা (দুর্বুদ্ধি), তাঁতশিল্পের সংকট, তাঁতির দুরবস্থা (পণরক্ষা), অসহযোগ রাজনীতিতে আদর্শত্যাগ অপেক্ষা হুজুগের আধিক্য (নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার) ইত্যাদি। কিন্তু তিনি পল্লীচিত্রে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত প্রতিঘাতকে প্রাধান্য দিতে চান না, বরং তাঁর অভিষ্ট "মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে।" ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্যাপক জনসাধারণের ওপর ইংরেজশাসক, জমিদার, মহাজন ও অনুগৃহীত ব্যবসায়ীদলের শোষণ ও অত্যাচারের কথা কোথাও কোথাও বললেও সাধারণভাবে গল্পে এ ব্যাপারে স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ করতে তিনি নারাজ। নীলকর অত্যাচারের বিষাক্ত অভিজ্ঞতা গল্পগুচ্ছের সূচনা কাল থেকে খুব দূরের ঘটনা নয়। কিন্তু 'পোষ্টমাষ্টার' ও 'মহামায়া' গল্পে নীলকুঠির উল্লেখ থাকলেও নীলকর অত্যাচারে বিপন্ন বাংলা কৃষক সমাজের একটি চিত্রও তার কথাসাহিত্যে নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"গল্পে পলিটিকসপ্রবণ কোন ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পলিটিকসের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি জোগান দেওয়ার দিকে ঝুঁকে না পড়ে চরিত্র রচনার দিকেই নিবিষ্ট থাকে।"১৬ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি করেছেন? তাঁর গল্পগুচ্ছে একটি গল্পের নায়ক সক্রিয় রাজনীতির কর্মী কিন্তু গল্পটা রাজনীতি নিয়ে নয়, সুরটাও রাজনৈতিক ক্ষোভের নয়, গল্পের নামটাও 'নামঞ্জুর গল্প।' 'রাজটিকা' প্রসঙ্গেও কথাটি প্রযোজ্য। কিন্তু গল্পগুচ্ছের পাতায়, নায়ক বাদ দিলুম, পার্শ্বচিত্র হিসেবে রাজনৈতিক চরিত্র বা প্রসঙ্গ তিনি প্রায় বর্জন করেছেন সযত্নে। যেখানে এসেছে সেখানেও পুলিশ ইন্‌স্পেকটর বিপ্লবী নেতা সবাইয়ের আচরণ অবাস্তব যেমন—বদনাম। অথচ প্রবন্ধে, পত্রে তিনি তো রাজনীতি নিয়ে ক্ষোভের কথা কম বলেন নি। ভারতী, কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে (নজরুল বাদে) এই উদাসীন দৃষ্টিই প্রধানতঃ কাজ করেছে। শরৎসাহিত্যে অবশ্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই বিবেচিত হতে দেখেছি। এই সচেতনতা তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

রবীন্দ্র ছোট গল্পে বিষয় বৈচিত্র্যের পথ বেয়েই চরিত্রবৈচিত্র্য এসেছে। শ্রী শিশির দাস তাঁর গ্রন্থে গল্পগুচ্ছ প্রসঙ্গে অধ্যাপক থেকে হরকরা পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশাধিক প্রকারের জাতি ও বৃত্তির লোকের উল্লেখ করেছেন। তাঁর হিসাবমত গল্পগুচ্ছের মোট চরিত্রসংখ্যা প্রায় ২৩২, তাঁর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৫০, নারীর সংখ্যা ৮২। ১৭

গল্পগুচ্ছের কয়েকটি পুরুষ চরিত্রের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে, যারা সমাজের নানা শ্রেণী ও বৃত্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন—কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা রামসুন্দর (দেনাপাওনা) ধর্মভীরু রামকানাই (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা), মুখচোরা লেখক তারাপ্রসন্ন (তারা-প্রসন্নর কীর্তি), বাস্তব সচেতন সম্পাদক (সম্পাদক) বিশ্বস্ত ভৃত্য রাইচরণ (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) জাতিভেদ বিরোধী প্রেমিক হেমন্ত (ত্যাগ), অলস নিষ্কর্মা অথচ অর্থতৃষিত বৈদ্যনাথ (স্বর্ণমৃগ) ও মৃত্যুঞ্জয় (গুপ্তধন), হৃদয়বান পিতা রহমত (কাবুলিওয়ালা), পূর্বজীবনে লালসাগ্রস্ত পরজীবনে অতিরিক্ত রক্ষণশীল বিচারক মোহিত মোহন (বিচারক) প্রভৃতি। এই সব পুরুষ চরিত্রের কয়েকটি 'টাইপ', অধিকাংশই ব্যক্তিত্ব পেয়েছে। পারিবারিক অনুশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করার দিক থেকে পূর্বোক্ত হেমন্ত (ত্যাগ) এবং বনোয়ারীলাল (হালদার গোষ্ঠী) স্মরণীয়। এরকম উদাহরণ আরও অজস্র দেওয়া যেতে পারে।

পরবর্তী লেখকদের রচনায় পুরুষ চরিত্রের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের যেন অবধি নেই। প্রমথ চৌধুরী তাঁর গল্পে জমিদার রায় মহাশয়, লাঠিয়াল ঈশ্বর পাটনী, মজলিসী ঘোষাল ও নীললোহিত প্রভৃতি কয়েকটি উজ্জ্বল, পুরুষ চরিত্র উপস্থিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে লেখকের বলিষ্ঠ প্রাণধর্ম প্রতিফলিত হয়েছে। হেমেন্দ্র রায়ের অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র নায়ক ললিত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর আদর্শবাদী অরুণ রবীন্দ্রনাথের হেমন্ত বা বনোয়ারীর উত্তরসূরী। শরৎচন্দ্রের রচনায় পুরুষ বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। গোমস্তা অধর রায়, পুরোহিত তর্করত্ন, একাদশী বৈরাগী বা বঞ্চনার শিকার গোফুর লেখকের চরিত্ররচনার দক্ষতা প্রমাণ করে। শ্রীকান্তের যাযাবর মনোবৃত্তি এতই হৃদয় গ্রাহী যে কল্লোলের তরুণ লেখকদের অনেকের রচনাতেই এই চরিত্রের প্রভাব পড়েছে। বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যের প্রথম দিকের নায়করা তাদের অসংযত ও অসঙ্গত রোমান্টিকতার জন্যই আজকের পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। প্রেমেন্দ্র, শৈলজা ও অচিন্ত্য প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কাটিয়ে উঠে অনেক বিচিত্র চরিত্রে সৃষ্টি করেছেন। তাতে যেমন হিন্দুস্থানী সহিস, চোর, সাঁওতাল কুলি, ক্রূর পল্লীবাসী এসেছে, তেমনি এসেছে কোর্ট কাছারীর নিয়মদুরস্ত কর্মচারী, মুসলমান সারেঙ, চাষীমজুরের দল। তারাশঙ্কর গ্রামীণ স্বভাব বিশিষ্ট অথচ তীব্র আকর্ষক কিছু আঞ্চলিক চরিত্র রচনা করে এ তালিকা বৃদ্ধি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্রও সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সংগ্রহ করেছেন। তার থেকে কয়েকজনের উল্লেখ করা যায়। যেমন—সন্তানহারা বিধবা কাদম্বিনী (জীবিত ও মৃত), প্রেমে একনিষ্ঠ ও অদৃষ্টবঞ্চিত নবাবজাদী (দুরাশা), বুদ্ধিমতী পতিব্রতা সরলা নারী

(দৃষ্টিদান), প্রেমিকা চারুলতা (নষ্ট নীড়), ধনী নিঃসন্তান সুকুমারী (কর্মফল) অহংকারী সুন্দরী প্রতিশোধলিপ্সু ইন্দ্রানী (প্রতিহিংসা) প্রভৃতি। রক্ষণশীলতার প্রতিভূ কিছু বর্ষীয়সী সংসারাসক্ত গৃহিণী চরিত্রেরও সাক্ষাৎ মেলে। যেমন—রামকানাইয়ের স্ত্রী (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা), মৃন্ময়ীর শ্বাশুড়ি (সমাপ্তি), দিদিমা সম্প্রদায় (হৈমন্তী) ইত্যাদি। পরবর্তী-কালে শরৎচন্দ্র ও শৈলজানন্দের সাহিত্যেও বেশ কয়েকবার তাদের সাক্ষাৎ মেলে। প্রথম দিকের নারী চরিত্রগুলি স্বামীসমর্পণমুখী, ঐতিহ্য ও সামাজিক শাসন মেনে চলারই পক্ষপাতী, তাদের অনেকেই পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু 'সবুজপত্রযুগের গল্পধারায় (স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, পয়লানম্বর, চিত্রকর ইত্যাদি) নারী হয়েছে বিদ্রোহী—কখনো সমাজ শাসনের বিরুদ্ধে, কখনোও স্বামীশাসনের বিরুদ্ধে। দেনা পাওনা ও হৈমন্তী—দুই যুগের দু'টি গল্পকে উদাহরণ সূত্রে আনা যেতে পারে। দুটি গল্পেই শ্বশুর বাড়ির নিগ্রহের প্রসঙ্গ আছে। ক্ষুব্ধ নিরুপমা (দেনাপাওনা) তার দরিদ্র পিতার অসম্মান দেখে বলেছিল ঃ ''তোমার মেয়ের কি কোন দাম নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণ আমার দাম।' এই নারীমর্যাদার প্রশ্ন তীব্র হয়েছে 'হৈমন্তী' গল্পে। অবশ্য হৈমন্তীর ক্ষেত্রে নিগ্রহের কারণটা আর্থিক অসামথ্য নয়, ব্যক্তিত্বের ঋজুতা। এই ব্যক্তিত্ব রক্ষায় হৈমন্তী অবশ্য নীরব প্রতিবাদিনী, কিন্তু স্ত্রীর পত্র, পয়লানম্বর, বোস্টমী, চিত্রকর বদনাম প্রভৃতি গল্পের নায়িকারা প্রতিবাদে সরব। এযুগের রচনায় ''নারীকে প্রচলিত নীতিবোধ ও সতীত্বের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচারের পরিবর্তে তার ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় স্বরূপকে অধিকতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।'১৮

রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা গল্পে নারী চরিত্রের বৈচিত্র্য কম নেই। বুদ্ধদেবের নাগরিকা তার মর্জিত শিক্ষাদীক্ষারুচি নিয়ে যেমন সেখানে উপস্থিত (প্রথম পর্বে 'চরিত্র সৃষ্টির থেকে বুলির ব্যবহার'টাই মুখ্য), তেমমি প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অসংখ্য নারীচরিত্র উপস্থিত। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'টাইপ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বময়ী। অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট (যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রকষ্ট প্রভৃতি) নারীজীবনে জটিলতা এনেছে। কোথাও দেহজ-প্রেমের আকাঙ্খা ও অপ্রাপ্তির বেদনায় তারা দীর্ণ। রবীন্দ্রনাথকে এইখানে পরবর্তী লেখকরা অতিক্রম করেছেন। তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা চিহ্নিত ও বিভূতিভূষণের সরল গ্রাম্যনারী চরিত্রগুলি বাংলাসাহিত্যের গৌরব বাড়িয়েছে। রবীন্দ্রসৃষ্ট বিদ্রোহীনারী কল্লোলের তরুণদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। শরৎচন্দ্রে (কমল), তারাশঙ্করে কচিৎ ('ধাত্রীদেবতা'র মা) ও মানিকের রচনায় ('বৃহত্তর মহত্তর' গল্পের মমতা, 'মঙ্গলা' গল্পের মঙ্গলা) তাদের দেখা মেলে।

রবীন্দ্রগল্পে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল বালক বালিকা চরিত্রকে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কয়েকজন হল—রতন, মিনি, ফটিক, সুভা, উমা, নীলকান্ত, কালীপদ, বলাই। এই চরিত্রগুলির অধিকাংশই গ্রামীণ পটভূমিতে এবং প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপস্থাপিত হয়েছে। কিছু গল্পে রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা বালকের মতোই সরল ও সহজ। যেমন—রামকানাই, ছিদাম, দুখিরাম, বংশীবদন। বয়স এদের যতই হোক, মনের দিক থেকে এদের মধ্যে রয়েছে কিশোরের অসহায়তা। বিভূতিভূষণের গল্পে এ ধরণের চরিত্রের পরিচয় মেলে। কল্লোল পর্বের গল্পে শিশুর ভূমিকা বিরল। ব্যতিক্রম হিসাবে, অচিন্ত্যের 'অরণ্য' ও শৈলজানন্দের 'বেনামী বন্দর ঃ জনি ও টনি' গল্পের কথা মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের প্রধান অবলম্বন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করলেও কখনও কখমও দরিদ্র, অন্ত্যজ শ্রেণীর দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এই সূত্রে ভৃত্য রাইচরণ (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন), জনমজুর দুখিরাম ও ছিদাম রুই (শাস্তি), পতিতা ক্ষীরোদা (বিচারক), যাত্রাদলের ছোকরা নীলকান্ত (আপদ), সর্পদংশনে নিহত কন্যার কৃষকপিতা (দুর্বুদ্ধি) প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। তবে, একমাত্র 'শাস্তি' গল্পেই মজুর জীবন পটভূমিসহ যথাযথ মর্যাদায় উল্লিখিত হয়েছে। 'দুর্বুদ্ধি' গল্পের সমস্যা কৃষকটির প্রতি সহানুভূতির সূত্রে মধ্যবিত্তেরই সমস্যা। বুঝতে অসুবিধে হয় না শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতায় রবীন্দ্রনাথ অন্ত্যজজীবন সমস্যা রূপায়ণে দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

তিনি এব্যাপারে যে অখ্যাতজনের কবিকে ডাক দিয়েছেন তাঁর 'ঐকতান' কবিতায়, গদ্যে সেই অখ্যাত জনের 'কবি'রূপে অবশ্যই শরৎচন্দ্র উল্লেখ্য। তাঁর উপন্যাস বাদে কয়েকটি ছোটগল্পে এ ধরণের চরিত্রের পরিচয় মেলে। যেমন, গফুর ও কাঙালী। জলধর সেন, হেমেন্দ্র কুমার রায়, শৈলবালা ঘোষজায়ার কোন কোন গল্প উপন্যাসে এ ধরণের চরিত্রের পরিচয় মেলে। এসব লেখায় বাস্তবতার ত্রুটি থাকলেও কৃষক, মজুর, নমঃশূদ্র থেকে মুসলমান ড্রাইভার পর্যন্ত নায়কের মর্যাদা পেয়েছে ও পূর্ববর্তী লেখকদের থেকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কল্লোল ও পরবর্তী কালের লেখকদের গল্পে এই মনোভাবেরই প্রসারিতরূপ মেলে। প্রেমেন্দ্র কেরাণী (শুধু কেরাণী), হিন্দুস্থানী (কসৌলিয়া, মোটবারো), চোর (সংসার সীমান্তে) নিয়ে, অচিন্ত্য মুসলমান কৃষক, সারেঙ নিয়ে, শৈলজানন্দ কয়লাখনির কুলিকামিন নিয়ে, যুবনাশ্ব চোর, ভিখিরি, পকেটমার নিয়ে গল্প লিখেছেন। পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের গল্পে বৈরুবী (রসকলি), বেদে মেয়ে

(যাদুকরী, বেদেনি), মুসলমান রাজমিস্ত্রী (ইমারত), কৃষক (পৌষলক্ষ্মী), ভিখিরী (তমসা) ইত্যাদি নিয়ে গল্প লেখার সাথক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র প্রসঙ্গে পতিতা ও জারজ সন্তান প্রসঙ্গ উঠবে। এক্ষেত্রে 'বিচারক' ও 'সমস্যাপুরণ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরী। প্রথম গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন পতিতাবৃত্তির জন্য মানুষই দায়ী, আর যে পুরুষ নারীকে পতিতা হতে বাধ্য করে সে-ই তার বিচারক হয়ে বসে। দ্বিতীয় গল্পে জারজ সন্তানের সঙ্গে বংশজ সন্তানের বিরোধ দেখানো হয়েছে অবশ্য জমিদার ও উদ্ধত প্রজার বিরোধ রূপে। শরৎচন্দ্র পতিতা বৃত্তির জন্য মানুষকে দায়ী করেছেন বা পতিতার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে চরিত্রগুলি গৃহস্থঘরের মেয়ের মতোই চিত্রিত হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'অভিনেতা', হেমেন্দ্ররায়ের 'কুসুম' ও 'শিউলী' গল্পে পতিতাচরিত্র মেলে। পতিতার প্রতি সহানুভূতি ছাড়া এ গল্পগুলির আর কোনো সার্থকতা নেই। বুদ্ধদেববসুর প্রথমদিকের গল্প 'টান'-এর পতিতা মোটেই বাস্তব নয়। তবে, প্রেমেন্দ্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে শুধু সহানুভূতি নয় পতিতার বীভৎস জীবনের বাস্তবতাও সাহিত্যে এল। 'সাগর-সঙ্গমে' গল্পে পতিতাদলের বর্ণনায় অবশ্য এ বীভৎসতা নেই। 'মহানগর' গল্পের পতিতা চপলা শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী এবং বিভূতিভূষনের 'বিপদ' গল্পের হাজুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যুবনাশ্বের লেখায় পতিতাজীবনের ক্লেদাক্ত পরিবেশটি ভালোই ফুটে উঠেছে। অচিন্ত্যের 'হাড়' এবং মানিকের 'আজকাল পরশুর গল্পে' দুর্ভিক্ষ সংকটে পতিতাবৃত্তি গ্রহণের সমস্যাকে তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে। তারাশঙ্করের পতিতারা অঞ্চলবিশেষের 'গড়' ও 'ব্যক্তি' দুই-ই।

চরিত্রবৈচিত্র্যের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতা বৈচিত্র্যেরই পরিচায়ক। কিন্তু তবু গল্পগুচ্ছকে 'যুগের দপণ' বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতাকে দোষারোপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ অভিযোগ নিতান্ত অমূলক। রবীন্দ্রজীবনী থেকে জানা যায়, শিলাইদহে জমিদারী দেখাশুনার কালে তিনি নিজেকে নানা সংস্কারমূলক কার্যে যুক্ত রেখেছিলেন, যেমন—তাঁতের প্রচলন ও কাপড় বোনা, স্বদেশীমেলা, গুটি পোকা চাষ, ধান পাটের কারবার, আখমাড়াই কল, পল্লীবাসীর চিকিৎসা, পল্লীর তথ্য সংগ্রহ, শরীর চর্চায় উৎসাহ দান। তার অঞ্চলে কালীগঙ্গায় ব্রিজ তৈরী ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ, বাজার স্থাপন, রাস্তা নির্মাণ, প্রজাদের জন্য মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তন ব্যাপারে তাঁর সক্রিয়তার কথাও জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য—"প্রজা বা কর্মচারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কি আশ্চর্য কৌশলে প্রাণখোলা ভাবে মিশতেন তা

একটা ভাববার জিনিষ।" এবং "রবীন্দ্রনাথের মানুষ চিনবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—বৈষয়িক অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর।"১৯ পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে তিনি বীরভূমের পল্লীসমাজের সঙ্গে যোগ রাখতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে সমাজ বা বাস্তব অচেতন বলা চলবে না, গজদন্ত মিনারবাসী বলা যাবে না। এখানে তারাশঙ্করের কথা তোলা যেতে পারে। উভয়েই জমিদারী ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণুতাকে লক্ষ্য করেছেন, উভয়ের রচনাতেই ক্ষীয়মান সামন্তব্যবস্থা ও তার সংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হওয়ার কিংবা না পেরে বেদনা পাওয়ার পরিচয় আছে। তারাশঙ্কর তাঁর রচনায় পল্লীসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে সাধ্যমত তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অত্যন্ত সীমিত। আবার, তারাশঙ্কর আজীবন গ্রাম সমাজের মুখপাত্র, সহর নিয়ে তিনি বিব্রত বোধ করেন। আর, রবীন্দ্রনাথ গল্প-গুচ্ছের ৩য় খণ্ড থেকেই নাগরিক জটিলতার আবর্ত্তে পা দিলেও অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াতে তৎপর নন। অন্যদিকে গল্পগুচ্ছে গ্রামবাংলার প্রতি তাঁর আত্যন্তিক মমতার স্বীকারোক্তি থাকলেও বিংশ শতাব্দীর গ্রামবাংলার স্বরূপ তাঁর গল্পে প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর একটি উপন্যাসেও গ্রামের গুরুত্ব নেই। স্বীকার করতেই হবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামাজিক সমস্যা-গুলির থেকেই ঘটনাবিন্যাসের সূত্রপাত করেছেন, কিন্তু সামাজিক সমস্যার যেটুকু সমকালীন, স্বল্পস্থায়ী, সেদিকে বেশী না ঝুঁকে সমস্যার চিরন্তন দিকগুলোকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেগুলি একই সঙ্গে অনেক কালের ও অনেক দেশের। এখানে বিরুদ্ধ যুক্তি হচ্ছে মানব প্রবৃত্তি চিরকালীন হলেও তার প্রকাশ চিরকাল একরকম নয়। অসবর্ণ বিয়েতে রক্ষণশীল পরিবারের বাধা বা পণপ্রথা চতুর্থ দশক থেকেই কোনো সমস্যা নয়, দেবর বৌদির বা বিধবা প্রেমও বিরল নয়। কালে সমস্যা বহু বিচিত্রমুখী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কালের অগ্রগতির বাঁকে বাঁকে পিছিয়ে পড়তে একান্তই নারাজ ছিলেন। কিন্তু নানা কারণেই সেক্ষেত্রে তাঁর সীমাবদ্ধতা সুপ্রকট।

এই সমস্যার একটা কারণ অবশ্য তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ কলা-কৈবল্যবাদীদের মতো বলেছেন, সাহিত্যিককে আর কিছুই করতে হবে না, তাঁরা কেবল সৌন্দর্য্য ফোটাতে থাকুন।২০ সাহিত্যের শেষমূল্য হল আনন্দ। বর্ত্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যতের ধারাপথে স্থাপনের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানকে অতিক্রম ক'রে সর্বকালের দিকে তিনি সাহিত্যিকের অভিনিবেশ আশা করেন।২১ কথা সাহিত্যের অন্যতম শর্ত যেকালে দেশকালপটে চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপন সেখানে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হল, সাহিত্যকে দেশকালপটে ছোটকরে দেখলে ঠিকমত দেখাই হয় না। সত্যকে 'গোচর' করে দেওয়া নয়, তাকে 'মনোহর' রূপে দেখানোর দিকেই তাঁর পক্ষপাত। তিনি আরও বলেন,

লোকশিক্ষার জবাবদিহি সাহিত্যের নয়, সাহিত্য তা নিয়ে চিন্তা করবে না।২২ সাহিত্যে তিনিও বাস্তবতার পক্ষে, তবে তাঁর মতে "বিষয় বাছাই নিয়ে ····· রিয়ালিজম নয়, রিয়ালিজম ফুটবে রচনার জাদুতে।"২৩ মোটামুটি এই তাঁর সারাজীবনের বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'সাধনা' পর্বের আগেথেকেই তিনি রাজনীতি ও সমাজনীতি সচেতন, প্রবন্ধে পত্রে বক্তৃতায় সে বিষয়ে বেশ খানিকটা স্পষ্টভাষী, কিন্তু সৃষ্টিশীল রচনায় সমসাময়িক অপ্রধান হয়ে যায়। এই তাঁর চিরকালের ধরণ। আবার এ-ও দেখি, শিলাইদহে (যখন গল্পগুচ্ছের সূচনা) তিনি আনা কারনিনা পড়তে পীড়িত বোধ করেন।২৪ পরিবর্তে চান, 'বেশ শাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ' কিছু ২৫ আর 'মনের সুখে' নির্জন ও শান্ত পরিবেশে 'সুমিষ্ট সজীব' গল্পের পর গল্প লিখতে চান।২৬

যুগ ও পরিবেশের প্রভাব এবং নিত্য নতুন সমস্যার প্রতি বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর তেমন ছিল না, তাই দেশ ও বিদেশে তিনি বারে বারে ভুলের পথে পা বাড়িয়েছেন। ১৮৬১-১৯৪১—তাঁর জীবৎ কালের পরাধীনতার বেদনা, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ, অনুগত মুৎসুদ্দীদের উন্মোচনে এবং শ্রমিক কৃষকের দুর্গত জীবন চিত্রণে তিনি অনাগ্রহী। অবশ্য মধ্যবিত্ত জীবনের একাংশের চিত্রে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথ ঘটনাপরম্পরার বিবরণ না দিয়ে ঘটনার ঘনঘটায় না ঝুঁকে আঁতের কথা বের ক'রে দেখাতে চেয়েছিলেন। ফলে বাইরের ঘটনার বদলে ব্যক্তির মনোজীবনের নানা সংঘাতই (যেগুলো বাইরের ঘটনারই জের) প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় বা গোর্কীর লেখা পড়েছিলেন কিন্তু তাঁদের ঘটনাচিত্রণের ভঙ্গি স্বভাবতঃই তাঁর মনের অনুমোদন লাভ করেনি। বরং চেকভ, বিশেষ করে টুর্গেনিভের মনোভঙ্গির সঙ্গে তাঁর মেলে। টুর্গেনিভের মতোই তিনি চরিত্রের দেশকালাতীত চিরন্তন আবেদনের দিকে ঝোঁকেন, জীবনের অসুন্দরকে বর্জন করতে চান, উদার নৈতিক মনোভাবকে প্রাধান্য দিতে চান, গ্রাম সমাজও প্রকৃতিকে "কাব্যাঞ্জন মাখিয়ে' দেখতে চান। দুজনের মধ্যেই পাই "মার্জিত বাচন সুষমা।"২৭ তবে এই দুজনের মধ্যে পার্থক্যও আছে। সে যাই হোক, এই মনোভঙ্গিজাত সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদীরা বাস্তবতার আদর্শ নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন (যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা চলে—"ভাবাবেগের বাস্তবতা"২৮) কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা তাতে অনেক অতৃপ্তি নিয়ে বিচরণ করবেন। নির্বিচারে মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন, ইংরাজের সর্বগ্রাসী শোষণ ও অত্যাচারের মুখে অসহযোগের পথে আত্মমর্যাদাবোধের অনুশীলন বা জাতিনির্মাণ

তাঁদের পছন্দ হবার নয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে বাস্তবতাসৃজন শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, অনুভূতি এবং রূপায়ণ দক্ষতাও সেক্ষেত্রে প্রয়োজন। পক্ষপাতদুস্ট না হ'লে দুপক্ষই স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যতটুকু বাস্তবস্পর্শী তার তুলনা নেই। সেক্ষেত্রে মানব অনুভূতির সূক্ষ্মবিশ্লেষণে, রোম্যান্টিক হলেও তিনি অসাধারণ। তখন সহজেই বোঝা যায়, এই অমিতবিস্ময় লেখকের কাছে আমাদের ঋণস্বীকার মোটেই অগৌরবের নয়।

॥ খ ॥

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে কোনো লেখক ছোট আকারের গল্প লিখলেও সচেতনভাবে ছোটগল্পের যথার্থসৃষ্টি যেন রবীন্দ্রনাথের জন্যই অপেক্ষিত ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'ইন্দিরা' সম্পর্কে বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর (সাহিত্য পরিষদ সং) সম্পাদকদ্বয় বলেন—"ইন্দিরা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনা পরীক্ষার প্রথম ফল।" কিন্তু দেখা যায় পরে ক্ষুদ্র কলেবর এই রচনাটি বঙ্কিমের হাতেই ৮ থেকে ২২ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত হয় এবং গোড়া থেকেই তাতে ছোটগল্পের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব ছিল। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'—এই তিনটি গল্পই টেল বা আখ্যায়িকা শ্রেণীর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের পত্রিকায় 'গল্প', 'ক্ষুদ্রগল্প', 'ক্ষুদ্রকথা' প্রভৃতি নামের ব্যবহার দেখা যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প। নামটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ নূতনধরণের কাহিনীসৃষ্টি ও গল্পের ছোটত্ব এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।২৯ রবীন্দ্রনাথই প্রথম 'ছোটগল্প' আখ্যাটি ব্যবহার করেন।৩০

রবীন্দ্রনাথের "ছোটগল্প রচনার হাতেখড়ি হয় ভারতীর প্রথম সংখ্যায়" (১৮৭৭) 'ভিখারিণী' দিয়ে, যদিও দ্বিতীয়বার বিলাত থেকে ফিরে তিনি ১৮৯১ সাল থেকেই গল্পরচনা শুরু করেন পুরোমাত্রায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন গল্প লেখকের আবির্ভাব হয় প্রায় একই কালে। তাঁরা হলেন—এডগার অ্যালান পো, গী দ্য মোপাসাঁ, আন্তন চেকভ ও রবীন্দ্রনাথ। চারজনেরই গল্পরচনার সূত্রপাত পত্রিকার তাগিদে। রবীন্দ্রনাথ যে বিদেশী সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক ছিলেন সেকথা সবাই জানে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর যে সব প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পকারের লেখা মূলভাষা থেকে অনুবাদ করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন—গতিয়ের, জোলা, দোদে, দুমা, মপাসাঁ ইত্যাদি। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথঠাকুর, আশুতোষ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরীর সংস্পর্শে এসেও রবীন্দ্রনাথ ফরাসী গল্পের বিষয় ও রীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

অন্যদিকে তিনি যে টলস্টয়, চেকভ টুর্গেনিভ বা গোর্কীর গল্প পড়েছিলেন তা-ও জানা যাচ্ছে। আর পো-র লেখা পড়তে তো ভাষাগত অসুবিধে ছিল না। অনুমান করতে পারি, ইংরাজী ছাড়া-ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের সান্নিধ্যলাভে বিলাতবাস নিশ্চয়ই সহায়ক হয়েছিল। একটা নতুন শিল্পমাধ্যম আয়ত্ত করার জন্য অন্যত্র বিচরণ নিশ্চয়ই নিন্দার নয়, যেক্ষেত্রে, সকলেই জানে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রথম পর্যায় থেকেই স্বাতন্ত্র্যের ও স্বক্ষমতার বিস্ময় নিয়ে উপস্থিত।

'ছোটগল্প' সংজ্ঞার মধ্যে 'ছোট' শব্দটি থাকলেও একথা সুপরিজ্ঞাত যে কয়েকটি আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের (যথা, প্রতীতির সমগ্রতা রক্ষা, একমুখিতা ইত্যাদি) ওপরই ছোট গল্পত্ব নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ নানা আকারের ছোটগল্প লিখেছেন। তাতে 'উলুখড়ের বিপদ' এর মতো পৌনে দুই পৃষ্ঠার গল্পও আছে, আবার 'নষ্টনীড়'-এর মতো সাড়ে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার গল্পও আছে। (এখানে পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে)

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে চরিত্র ও প্রসঙ্গ যেমন বিস্তর তেমনি গল্পের ধরণ ও অনেক। সুপ্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখক ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের ত্রিবিধ প্রবণতার কথা বলেছেন।৩১ সে অনুযায়ী রবীন্দ্র ছোটগল্পকে বিন্যস্ত করা যেতে পারে ঃ- (ক) ঘটনামুখ্য— দেনাপাওনা, ব্যবধান, সম্পত্তি সমর্পণ, দানপ্রতিদান ইত্যাদি। (খ) চরিত্রমুখ্য—রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, কাবুলিওয়ালা, সুভা, ছুটি ইত্যাদি। (গ) ভাবমুখ্য—একরাত্রি, ক্ষুধিত পাষাণ ইত্যাদি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পকে অন্যভাবেও বিভক্ত করেছেন। সে অনুযায়ী-ও বিন্যাস করা যেতে পারে ঃ— (ক) সমাজ সমস্যা—দেনাপাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, অনধিকার প্রবেশ, বিচারক (খ) পারিবারিক—সমস্যাপূরণ, শাস্তি, স্বর্ণমৃগ, ঠাকুর্দা, দানপ্রতিদান (গ) জীবন ও প্রকৃতি—অতিথি, সুভা, একরাত্রি, বলাই, ছুটি (ঘ) রোমান্স—ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, দালিয়া, নষ্টনীড়, দুরাশা (ঙ) রাজনীতি—মেঘ ও রৌদ্র, দুর্বুদ্ধি, রাজটিকা।৩২

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে গল্পহীন গল্পলেখার রেওয়াজ এলেও প্লটের গুরুত্ব ও মর্যাদা কোনদিনই কমেনি। রবীন্দ্রগল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে যেমন স্টেয়ারকেস প্লটের (অর্থাৎ আদিমধ্যঅন্তযুক্ত কাহিনী) গল্প আছে (দেনাপাওনা, সমাপ্তি), তেমনি আছে রকেট প্লটের (আঘাতের আকস্মিকতা, প্রচণ্ডতাযুক্ত) গল্প (অধ্যাপক, মানভঞ্জ), আবার লুজ প্লটের (শিথিলবিন্যাস) গল্প (মেঘ ও রৌদ্র)। তবে তাঁর লেখায় প্যানরোমিক প্লটের (শিথিলবিন্যস্ত, কিন্তু একটিমাত্র সূত্রে কেন্দ্রীভূত নয়) বা পাঁচালীর প্লটের (জীবনের টুকরো টুকরো ছবি, একটি ভাবদৃষ্টি, কয়েকটি চরিত্রের সূত্রে আবদ্ধ) গল্প পাই না।

গল্পের কাঠামোর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা চলে। যেমন—

(ক) একটি আবেগানুভূতি বা তার উদ্দীপকে পৌছানোর উপায় হিসাবে কাহিনী রচনা গিন্নী, একরাত্রি, সংস্কার। (খ) জীবনের একবিন্দু থেকে শুরু হয়ে কাহিনীর ক্রমপ্রসার—দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। (গ) যে বিন্দুতে গল্পের জন্ম, সমাপ্তিও সেই বিন্দুতে - দুর্বুদ্ধি, দৃষ্টিদান, দর্পহরণ কতকটা এই লক্ষণাক্রান্ত। (ঘ) মূল গল্পের মধ্যে আর একটি গল্পের উপস্থিতি—পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প। (ঙ) বর্তমানের একটা কাঠামো খাড়া করে তার মধ্যে অতীত জীবনের কাহিনী —কংকাল, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মণিহারা, দুরাশা।৩৩

সাধারণতঃ গল্প উপন্যাসে কাহিনী উপস্থাপনায় তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে—প্রত্যক্ষ, আত্মজীবনীমূলক, প্রামানিক পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথের গল্পে এই তিনটি ধরণই দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে দেখা যায় লেখক সর্বজ্ঞ, তাঁর ভূমিকা নিছক দর্শকের। এরকম গল্প হল—দেনাপাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ত্যাগ ইত্যাদি। আত্মজীবনী মূলক পদ্ধতিতে একটি চরিত্রের জবানীতে গল্পটি বলা হয়। যেমন—একরাত্রি, সম্পাদক, ডিটেকটিভ। কখনো কখনো দেখা যায় গল্পের কথক 'আমি' কিন্তু তার সঙ্গে গল্পের যোগনিবিড় নয়। যেমন—কংকাল, অসম্ভব কথা, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, বোষ্টমী। প্রামানিক পদ্ধতিতে চিঠি পত্র, ডায়েরী ইত্যাদির ধরণটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—স্ত্রীর পত্র।

ছোটগল্পের সূচনা ও সমাপ্তি রচনা লেখকের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় বহন করে। সমালোচকদের মত হল "ছোট গল্পকে ধরতে হবে মাঝখান থেকে।"৩৪ অথবা "At the very opening a writer, at any rate a modern writer, must make an immediate and intimate contact with the story."৩৫ কিন্তু তবুও সূচনা রচনায় নানান বৈচিত্র্য যে কোন সার্থক গল্পকারের রচনায় মেলে। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে সূচনাগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থিত করা যাচ্ছে। তাঁর বহু গল্পে গল্পান্তর্গত চরিত্রের কথা দিয়েই শুরু হয়েছে। একেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (ক) চরিত্রটির স্বভাব ধর্মপ্রকাশক—"লেখক জাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন।" (তারাপ্রসন্নের কীর্তি) এরকম উদাহরণ পাওয়া যাবে 'মুক্তির উপায়' গল্পে। চরিত্রটির আকৃতি, বৃত্তি ইত্যাদির পরিচয় প্রকাশক ঃ "রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যাম চিক্‌কন ছিপছিপে বালক।"

(খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) এরকম উদাহরণ পাওয়া যাবে—জীবিত ও মৃত, সুভা গল্পে। (খ) চরিত্র উল্লেখে ঘটনার সূত্রপাত—"প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্ট-মাস্টারকে আসিতে হয়।" (পোস্টমাস্টার) এরকম উদাহরণ পাওয়া যাবে সমাপ্তি, ছুটি, রাসমণির ছেলে গল্পে। (গ) কোথাও কোথাও প্রথম বাক্যেই কখনও সংলাপের আশ্রয়ে কখনও বিবরণভঙ্গীতে সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ— যেমনঃ "বৃন্দাবন কুণ্ডু মহাক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাবাকে কহিল, আমি এখনই চলিলাম।" (সম্পত্তি-সমর্পণ) (ঘ) বিবরণ ভঙ্গীর উদাহরণ—"মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।" (মহামায়া) এসব ক্ষেত্রে পাঠকের মনে মুহূর্তেই কৌতূহল জাগ্রত হয় বৃন্দাবনের ক্রোধের কারণ কি, চলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম কি। কিংবা মহামায়া ও রাজীবলোচনের এই গোপন সাক্ষাৎকার কেন, এর গতি কোনদিকে। এ ধরণের গল্পে দেখা যায়, প্রথমে কৌতূহল জাগ্রত ক'রে, কিন্তু প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা ক'রে তারপর পাত্র-পাত্রীর পরিচয় দান করা হয়েছে। (ঙ) অনেক সময় প্রথমেই সংলাপ ব্যবহৃত, তাতে গল্পের সূচনা হয়েছে নাট্য ধর্মী, যেমন—

"ডাক্তার! ডাক্তার!'

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—" (নিশীথে)

এরকম উদাহরণ মিলবে 'শেষের রাত্রি' গল্পে। (চ) কিছু গল্পে জীবন, জগৎ, বা সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশের পর তাঁর উদাহরণ স্বরূপ গল্পের উপস্থাপনা। এখানে কখনো কখনো উপমার আশ্রয় নিতে দেখা যায়। যেমন—

"লেজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেই রকম।" (ফেল) এই মন্তব্যের পর গল্প শুরু হয়েছে। এরকম উদাহরণ মিলবে 'প্রতিবেশিনী', 'দৃষ্টিদান', 'শেষকথা', 'চোরাই ধন', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি গল্পে। (ছ) কিছু গল্পে প্রকৃতি বর্ণনার মারফৎ গল্পের সূচনা—এর মধ্যে দুটো তাৎপর্যপূর্ণ সূচনা আছে 'ত্যাগ' ও 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে ঃ

"ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে।" (ত্যাগ) হেমন্ত ও কুসুমের সুখতপ্ত জীবনের উপস্থাপনা হিসাবে সার্থক ব্যবহৃত। এর বৈপরীত্যে বিপর্যয়ের ঝোড়ো মেঘ বর্ণিত হয়েছে পরে। 'মেঘ ও রৌদ্রে' মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, শশিভূষণ ও গিরিবালার জীবনের সুখদুঃখের রূপক হিসাবে ব্যবহৃত, মাঝেমাঝেই সাজাতে হবে এই প্রসঙ্গ উপস্থাপিত। (জ) পত্রধর্মী—"শ্রীচরণকমলেষু, আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে। আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি।" (স্ত্রীর পত্র) (ঝ) টেলধর্মী —"পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন।" (দালিয়া)

(ঞ) মূল কাহিনী নয়, অন্য কিছু দিয়ে সূচনা—কংকাল, ক্ষুধিত পাষাণ।

(ট) সরল বিবৃতিমূলক—"নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার।" (ল্যাবরেটরি)

'বিচারক' গল্পে এই সরল বিবৃতি মূলকতা মাঝে মাঝে সজীব, নাট্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

(ঠ) গল্পের শেষ থেকে শুরু করে তাকে সম্পূর্ণতা দানের চেষ্টা—"ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।" (দুর্বুদ্ধি) এই ধরণটি মিলবে 'অপরিচিতা' ও 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পে।

(ড) ভূমিকা সহযোগে গল্পশুরু—দালিয়া।

ছোটগল্পের সমাপ্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর গুরুত্বকে একজন সমালোচক শেক্‌সপীয়রীয় সনেটের সর্বশেষ দ্বিপদীর সঙ্গে তুলনা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন।৩৬ সব বৈচিত্র্য সত্তেও ছোটগল্পের সমাপ্তিকে সাধারণতঃ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে—ব্যঞ্জনাগর্ভ ও বক্রোক্তি জীবিত।৩৭

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বক্রোক্তির চেয়ে ব্যঞ্জনাই বেশী"৩৮—একথা যথার্থই বলা হয়েছে। উদাহরণ—(ক) "ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।" (ছুটি)
(খ) "স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ-বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।" (অতিথি) ব্যঞ্জনাগর্ভ উপসংহার রচনায় রবীন্দ্রনাথ সত্যই অতুলণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বক্রোক্তিজীবিত উপসংহারও কোথাও কোথাও মেলে, যেমন—
(গ) "জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"
চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"
ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"
চন্দরা কহিল, "মরণ"। (শাস্তি)
এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যথার্থ বলেছেন যে, 'দয়ালুর' কথাটির মৃদু শ্লেষ থেকে শুরু ক'রে 'মরণ' কথাটির বহুমুখী ব্যঞ্জনা পর্যন্ত যেন তীরের ফলকের মতো ক্রমশঃ সরু হয়ে সংহত হয়ে বুকে এসে বিঁধল।"৩৯
(ঘ) "হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল 'আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না'।

হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল 'জাত খোয়াইবি'
হেমন্ত কহিল 'আমি জাত মানিনা।'
'তবে তুই দূর হইয়া যা।' (ত্যাগ)
এই ধরণের সমাপ্তি লেখকের ভাবাবেগ অপেক্ষা অন্ধ জাতিভেদের প্রতি ঋজু সমালোচনা প্রকাশ করেছে।

বর্ণনা

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত একদা লিখেছিলেন—"বাংলা ভাষায় পায়ের বেড়ী খুলে দিয়ে হাঁটতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তার পায়ে নূপুরও বেঁধে দিয়েছেন (কল্লোল, ভাদ্র ১৩৩২)।" ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে এই মন্তব্যে তরুনমহল থেকে রবীন্দ্রনাথের শক্তিমত্তারই স্বীকৃতি মেলে। এখন রবীন্দ্রগল্পে ভাষা ও বর্ণনাবৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে মাধুর্য ও কৃতিত্ব অনেক ক্ষেত্রে বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল। লক্ষণীয় যে কালে তিনি সোনার তরী চিত্রা কল্পনা প্রভৃতি কাব্যে উচ্ছ্বাসময়, ঝংকারযুক্ত, সমারোহ-পূর্ণ বর্ণনার পক্ষপাতী সেখানে গল্পগুচ্ছে (১ম/২য়) প্রায়ই এসেছে অনুচ্ছ্বসিত বাকভঙ্গী, তাতে চমক নেই, তা অনেক ক্ষেত্রেই জমকালো নয়। বড় বড় ঘটনাগুলিকে সহজে বিবৃত করার নির্লিপ্ত ভঙ্গির মধ্যেও এর পরিচয় মেলে। একেবারে প্রথম দিকের গল্প 'ঘাটের কথা'য় শোকাহত কুসুমের আত্মহত্যার বর্ণনায় এর পরিচয় মেলে। "এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না।" 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে খোকাবাবুর অপমৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনাটিও এ প্রসঙ্গে উদাহরণ-যোগ্য। পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পের রাবেয়ার আত্ম-হত্যার বর্ণনায় এর অনুরূপ ব্যবহার মনে পড়ে। তবে দুই গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা।

বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলেছেন—"ঘটনা যেখানে জমকালো ধরণের, সেখানেই রবীন্দ্র-নাথ সবচেয়ে নিচুগলায় কথা বলেন এবং বলেন সবচেয়ে কম।"৪০ এই নির্লিপ্ততার শিক্ষা পরবর্তীকালের অনেক ছোটগল্পকারই নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। 'শাস্তি' গল্পে দুখিরাম যখন ক্রোধবশতঃ স্ত্রীকে হত্যা করল তখন ঘটনার আকস্মিকতায় দুখিরাম হতবুদ্ধি হয়ে দা ফেলে বসে পড়ল, চন্দরা ও ছোট ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। এর পরই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখাল বালক গোরু লইয়া গ্রামে

ফিরিয়া আসিতেছে।" ইত্যাদি। (খ) "হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতুহলবশতঃ তাহার আয়-ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমদ্দি কাটারী তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনা বেচা চলিতে ছিল চলিতে লাগিল।" (সমস্যা পূরণ) এ রকম উদাহরণ মিলবে 'মানভঞ্জন' গল্পের সমাপ্তিতে-ও। রবীন্দ্র বর্ণনার এই সরল সহজ প্রবাহবৎ ভঙ্গির অপূর্বত্ব কিন্তু সবুজ পত্র পর্ব থেকে পাওয়া যায় না, পরিবর্তে সেখানে এসেছে বাকচাতুর্য, উইট ও এপিগ্রামের যথেচ্ছ ব্যবহার। যেমন— ক) "রূপ জিনিষটাকে যদি কোন সেকেলে পণ্ডিত গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ওর আদর থাকত ; কিন্তু ওটা যে কেবল বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েছেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে এর দাম নেই।" (স্ত্রীরপত্র) খ) "আমরা সাধুতার জেলখানায় সততার লোহার বেড়ি পরিয়া মানুষ।" (ভাই ভোঁটা) গ) "আমি কৌমার্যের লাস্ট বেঞ্চিতে বসে শূন্য সংসারের কড়িকাঠ গণনা করে কাটিয়ে দিতুম।" (পাত্র ও পাত্রী) ঘ) "আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লংকাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তর কাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেছে, তা ছাড়া সেই অগ্নিদাহের খেলা বন্ধ।" (নামঞ্জুর গল্প) ঙ) "তার ভাগ্যে বধূটি এল প্রথমে, তার পরে দাম্পত্যের মাঝখানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মুক্তি।" (ল্যাবরেটরি) সবুজ পত্র থেকে যে গল্পধারা শুরু তাতে অনেক নূতন শব্দবন্ধ নির্মানের ঝোঁক-ও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য যেমন—কর্তাত্বি, সুন্দর হানো, পোষ্টগ্রাজুয়েটী, ঝাঁঝালো লোক, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজেস্ট্রিটি, কেজো করে তুলতে, নারী প্রভাবের ম্যাগনেটিজম্, বেস্কুল।

গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ উপমা এবং বিশেষণ প্রয়োগে যে অজস্র কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা তুলনা রহিত। বুদ্ধদেব বসু যথার্থ ই বলেছেন—"গল্প গুচ্ছের অধিকাংশ উপমায় শুধু বাহ্যবস্তুর প্রতিকৃতি নয়, মানসিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে, অর্থাৎ ঘটনার তাৎপর্য বিষয়ে লেখক আমাদের এই উপায়েই সচেতন করে তোলেন। এরকম ক্ষেত্রে উপমা হয়ে ওঠে ভাষা—অলংকার নয়—লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগের সেতু।" ৪১ এ কথার স্বপক্ষে উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ—"গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন......মেয়েদের মুখ রঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকা পতন হয়।" (সমাপ্তি) খ) " তাহার দেহের অভ্যন্তরে কণ কুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মতো একটা শব্দ হইতে লাগিল।" (প্রায়শ্চিত্ত) (স্বামীর দুষ্কর্মে বিন্ধ্যবাসিনীর লজ্জা ও মৃত্যুকামনা প্রকাশিত।) গ) "রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো

জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকার-লুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল।" (মাস্টার মহাশয়) (ছাত্র টাকা চুরি করে পালানোর পর উদ্‌ভ্রান্ত হরলালের আতঙ্কের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকেই বোঝাচ্ছে)।

তাঁর গল্পে যেমন জীবন পরিক্রমায় তেমন চিত্রকল্পেও প্রকৃতির অবারিত প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। যেমন—ক) "অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ পুটের মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত"। (ঘাটের কথা) খ) "যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল।" (পোস্টমাস্টার)

(রতনের অব্যক্ত দুঃখকে এই ভাবে লেখক বর্ষা নদীর উপমায় প্রকাশ করলেন।)
গ) "সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মতো স্থির হইয়া আছে।" (ত্যাগ)
(স্বামীকর্তৃক পরিত্যাক্ত হবার দুশ্চিন্তায় হতবুদ্ধি কুসুমের মানসিকতার প্রতিফলন।)
ঘ) "কোটরনিবিষ্ট চকিত নেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মতো একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।" (স্বর্ণমৃগ) ঙ) "অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখোমুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না, এমনি ভাবে খাড়া হইয়া মিটমিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল।" (মাস্টার মহাশয়) চ) "তাহার গানে নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রাম্যশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত।" (অতিথি) ছ) "খর রৌদ্র তাপে সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোটো ছোটো কল শব্দগুলি জননীর ঘুমপাড়ানি গানের মতো অতিশয় মৃদু এবং সকরুণ হইয়া আসিল।" (অধ্যাপক) জ) 'ঐ সমস্ত মাঠের ও ঘরের কাজকর্মের মাঝখানে শীতের রৌদ্রটি গ্রামের ঠাকুরদাদার মতো আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিল।' (বোস্টমী)

এ রকম আরো অজস্র উদাহরণ দেওয়া চলে। এর কতকগুলিতে শুধুই উপমান হিসাবে প্রকৃতির ব্যবহার, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে মানব গুণ ও মনোভাবের আরোপ দেখা যায়। এতে প্রকৃতি বর্ণনা ও অনুভব রূপায়ণে নূতনত্ব ও গভীরতার সুযোগ এল।

কিছু উপমায় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রাণীকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন—
(ক) "ইঁদুর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই সেটাকে কেটেকুটে ফেলে, তা সেটা খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক, শিশুকাল থেকেই তেমনি ছাপার বই দেখলেই সেটা পড়ে ফেলা আমার স্বভাব ছিল।" (পাত্র ও পাত্রী)

(খ) "বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন ...... ।" (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)
এক্ষেত্রে জান্তব ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় নয় । তারাশঙ্কর ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় উপমাব্যবহারে প্রাণী-উপমান সহজেই চোখে পড়ে । তবে দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিন্নতা থাকায় শেষোক্ত দুজনে'র উপমায় ক্রূরতা ও বিরাটত্ব এসেছে ।

রবীন্দ্রবর্ণনায় তথা ভাষা ব্যবহারে একটা প্রসন্ন উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা যায় যাকে শ্রী প্রমথনাথ বিশী "স্মিত হাস্যরস" বলেছেন ।৪২ এই স্মিতহাস্যরস সংলাপ, ঘটনা-বর্ণনা, চরিত্র পরিকল্পনা তিনটি ক্ষেত্রেই যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । উদাহরণ—
(ক) 'উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল ভাদ্রের প্লাবনেও উক্তনালা দিয়া এত জল কখনও বহে নাই ।' (ব্যবধান) (খ) "ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতি··· ঠাণ্ডা জল, হিম এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না ।" (মুক্তির উপায়) গ) 'ইহারা (আদালতের ছোট কর্মচারী) আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা, তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ ।' (একরাত্রি)
গল্পগুচ্ছের ১ম ও ২য় খণ্ডের বাক্যগুলি অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত । শিলাইদহ ত্যাগ তাঁর ভাষাতেও প্রভাব ফেলে । শান্তিনিকেতন পর্যায়ের গল্পে বর্ণনা অপেক্ষা মন্তব্য বেশী, ঘটনা অপেক্ষা বিশ্লেষণ বেশী, বার্তমানিকতা অপেক্ষা স্মৃতিরোমন্থনের নিরুত্তাপ ভঙ্গি বেশী । তৃতীয় খণ্ড থেকেই বেশী করে চোখে পড়ে "গল্প বলার ভাষাও জোগাচ্ছে প্রকৃতি ।"৪৩ যেমন—(ক) 'ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া ওঠে, সংসারের দুই কুল ছাপাইয়া হাসিকান্নার তুফান চলিতে থাকে' (হালদার গোষ্ঠী) (খ) 'কটুকথার হাওয়া দিয়েছে ।' (হৈমন্তী) (গ) 'অভিমান সেদিন ঘা খাইয়া আরও ঢেউ খেলাইয়া উঠিয়াছিল ।' (ভাইফোঁটা)
তবে তৃতীয় খণ্ডের আগে যে এরূপ ভঙ্গি পাওয়া যায় না, তা নয় । যেমন—(ঘ) 'এখন কেবল আর একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে, বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে, খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই ।' (একরাত্রি) (ঙ) "এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে, আমার কোনটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয় ।' (কাবুলিওয়ালা) ভাষাব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ যুগের দাবী অস্বীকার না ক'রেও বিস্তর নূতনত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু তাতে প্রদর্শনমুখিতা নেই । আমরা যেমন পাই তৎসম শব্দের সমাসবদ্ধ প্রয়োগ (নব যৌবনোচ্ছ্বাস, তরুচ্ছায়ানিমগ্ন, বর্ষাবিস্ফারিত, পরমায়ুহন্ত্রী, একতানশব্দপূর্বক) দেশীবিদেশী শব্দের প্রয়োগ (পোস্ট আপিস, বাইজোভ, বর্জ্জইস, ভ্যালুপেবেল, থলু, সেকেণ্ড), তেমনি সাধারণ গৃহস্থঘরের প্রচলিত শব্দ (ন্যাকামি,

হেঁশেল, কিল, চড়, ঝালচচ্চড়ি, ব্যামো) বা অমার্জিত শব্দের প্রয়োগ (মাগী, মিনসে, পোড়াকপালে)।

রবীন্দ্র ছোটগল্প থেকে ভাষাবৈচিত্র্যের কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। পরবর্তীকালের 'বিদ্রোহী' লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র অনুসরণ মেলে 'কল্লোলে' প্রকাশিত ফুলের আকাশ (দীনেশরঞ্জন), মন্দিরে (সুনীতিদেবী) ও প্রবাসীতে প্রকাশিত 'শুধু কেরানী'তে (প্রেমেন্দ্র)। আবেগের উৎসার, অবাধ বর্ণনার প্রবাহরচনা, বাক্যের বিন্যাস, শব্দ নির্বাচন প্রভৃতিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রকথাসাহিত্যে বিস্তর প্রেরণা পেয়ে থাকবেন। সবুজপত্র যুগের রবীন্দ্রগল্পের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, উইট, এপিগ্রাম-সহযোগে সূক্ষ্ম সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভঙ্গিটি প্রমথ চৌধুরীর রচনায় (নীল লোহিতের আদিপ্রেম, ঘোষালের ত্রিকথা), শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন, কল্লোলের কিছু লেখায় (অভিনয় নয়, অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস আর বুলু—বুদ্ধদেব, স্বাহা—যুবনাশ্ব, অমরকবিতা—অচিন্ত্য) পেতে পারি। সাধুভাষাআশ্রিত শৈলজানন্দের ও জগদীশগুপ্তের কোথাও কোথাও, রবীন্দ্র ভাষাভঙ্গিমা তুলনীয় মনে হয়। পল্লীবর্ণনায় রবীন্দ্রস্নিগ্ধতার পরিচয় প্রধানতঃ বিভূতি-ভূষণে মেলে। তারাশঙ্করের কোনো কোনো গল্পের সূচনা রবীন্দ্রগল্পের সূচনা স্মরণ করিয়ে দেয় (নুটু মোক্তারের সওয়াল, শাপমোচন)। গল্পের মধ্যে গানের ব্যবহারের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন শৈলজানন্দ ও তারাশঙ্কর। গল্পগুচ্ছে একাধিক বিশেষণ প্রয়োগের আলোচক বুদ্ধদেববসুর রচনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ('ক্ষুধার, অজ্ঞতার, লুব্ধতার, হিংস্রতার, বীভৎস, অকথ্য কাহিনী'—শেষ গ্রীষ্ম)। অচিন্ত্যের লেখাতেও এমন মেলে ('লুব্ধ, বিজ্ঞ, তৃপ্ত, ব্যর্থ, ধূর্ত, ভণ্ড, তঞ্চক, বঞ্চক অনেক রকম কাক'—'কাক')।

সাধু ও চলিত রীতির ব্যবহারের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পকে কয়েকটি ভাগ করা যেতে পারে৪৪— বর্ণনা ও সংলাপ সাধুভাষায় (ব্যবধান), বর্ণনা ও সংলাপ চলিত-ভাষায় (চোরাইধন), বর্ণনা সাধু, সংলাপ চলিতভাষায় (পোস্টমাস্টার), বর্ণনা সাধু, সংলাপ কখনো সাধু কখনো চলিতভাষায় (তারাপ্রসন্নের কীর্তি, রাসমনির ছেলে), বর্ণনা ও পুরুষের সংলাপ সাধু কিন্তু স্ত্রীলোকের সংলাপ চলিতভাষায় (রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা)। তরুণ লেখকেরা সাধু ও চলিত দুই রীতিতে লেখা শুরু ক'রে শেষপর্যন্ত চলিতকেই একমাত্র অবলম্বন করেছেন। শৈলজানন্দ প্রধানতঃ সাধুভাষার, যুবনাশ্ব প্রথমাবধি চলিতভাষার পক্ষপাতী।

গল্পের ধরণের দিক থেকে রবীন্দ্রগল্পে যেমন বৈচিত্র্য আছে, পরবর্তী তরুণদের

লেখাতেও সে কৃতিত্ব অব্যাহত। যেমন—ঘটনা বিহীন (স্বর-বুদ্ধদেব), নাট্যধর্মী বেঞ্জার কাঁটা—অচিন্ত্য, সুখের ঘর—বুদ্ধদেব), পত্রধর্মী (প্রথম ও শেষ—বুদ্ধদেব, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে সংলাপ অংশ কম, বৈচিত্র্যও কম। (চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, বৃত্তি ইত্যাদির ভিন্নতা যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে)। অথচ তাঁর গল্পে চরিত্রবৈচিত্র্যতো কম নেই। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি ধরা যাক। এখানে কাবুলির মুখে 'দো-আঁশলা' বাংলা বসিয়েছেন—'খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না।' কিন্তু অন্যত্র দেখা যায়—'কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।' এই ত্রুটি অন্য কিছু কিছু চরিত্রের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। ছোটগল্পের ভাববস্তু উদ্ঘাটনে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ যখন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তখন তা লেখকের সুদক্ষতা প্রমাণ করে। যেমন—

(ক) "আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না" (পোস্টমাস্টার) [পোস্টমাস্টার রতনের দুঃখ বুঝতে না পেরে একথায় আরো দুঃখ বাড়াচ্ছে। রতনের অব্যক্ত দুঃখ বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য]

(খ) "তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, চলো চারু আমার সঙ্গেই চলো। চারু বলিল, না থাক।" (নষ্টনীড়)

[মহীশূরে যাবার সময় বিদায়কালে চারু ভূপতিকে বলেছিলো তাকে নিয়ে যেতে। কারণ সে অমলের বিচ্ছেদ স্মৃতি ভুলতে চায়। কিন্তু ভূপতিও তো বাইরে যেতে চায় প্রবঞ্চনার যন্ত্রণা ও চারুর প্রেম যন্ত্রণা এই দুইয়ের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে। তাই সে রাজী হয় না। একথায় চারুর পায়ের তলার মাটি সরে যায়। ভূপতি তা বুঝতে পেরে চারুকে নিয়ে যেতে চায়। চারু এবার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। নষ্টনীড় সম্পূর্ণ হয়।]

অনুরূপ উদাহরণ মিলবে 'ত্যাগ', 'ছুটি' ও গুপ্তধন গল্পের শেষাংশে। প্রথম দুইখণ্ড গল্পগুচ্ছের সংলাপ অনেক সরল, কিন্তু 'পয়লা নম্বর' থেকে নানা গল্পের সংলাপে নাগরিক বুদ্ধিদীপ্তি, তাতে উইট, এপিগ্রামের ছড়াছড়ি। যেমন—

(গ) 'বিয়েটা আর্টিস্টের পক্ষে গলার ফাঁস। ইনস্পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়।' (রবিবার) (ঘ) 'আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়।' (ল্যাবরেটরী) সংলাপের আরো কিছু বৈচিত্র্যের উদাহরণ দিই। (ঙ) ছন্দে দোলায়িত (রূপকথা বর্ণনার ঢং) ঃ

'তখন কেহ কহিল, 'তার এত দাড়ি ছিল না।'

কেহ বলিল, 'সে এমন একহারা ছিল না।'

কেহ কহিল, 'সে যেন এতটা লম্বা নয়।' (ঘাটের কথা) (চ) ব্যঙ্গাত্মক ঃ 'এ আবার তোমার কোন্ পরমবন্ধু লিখিল! কোন্ টিকিট কালেকটার, কোন চামড়ার দালাল,

কোন গড়ের বাদ্যের বাজনাদার।' (রাজটিকা) (নির্বোধ ধনীপুত্রের নির্বিচার ইংরাজপ্রশংসা-লোলুপতার প্রতি ব্যঙ্গ) (ছ) নাট্যধর্মী—সতীশ—'জেঠাইমা।' জেঠাইমা—'কী বাপ।' (কর্মফল) (জ) ক্রুদ্ধ বাঙালী চরিত্রের মুখে হিন্দী: 'অব্ হি ইস্কো কান পকড়কে বাহার নিকাল দো।' (ফেল) (ঝ) ইংরাজী: Babu, what nonsense are you talking! (রাজটিকা) (ঞ) গালাগালিকে শুদ্ধভাষায় প্রয়োগ:- 'হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়। অপবিত্র জন্মজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!' (মেঘ ও রৌদ্র) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অসামান্য শালীনতা রচনাবলীতে প্রকাশ করলেও কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম দেখা গেছে। যেমন (ট) 'ওরে ও পোড়াকপালে মিনসে, তুই মা বললি কাকে।' (মুক্তির উপায়) (ঠ) 'এমন স্বামীর মুখে আগুন।' (দিদি) (ড) 'মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? (শাস্তি)

রবীন্দ্র পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে ভারতীগোষ্ঠীর ও শরৎচন্দ্রের রচনায় পল্লী ও নাগরিক সমাজের নিম্নবিত্তের প্রবচন, অশালীন শব্দ, বিকৃত উচ্চারণযুক্ত সংলাপ দেখা গেছে। কল্লোলের তরুণ লেখকরা এ ব্যাপারে নবতর সংযোজনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেবের লেখায় নাগরিক বুদ্ধিদীপ্ত কখনো ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক সংলাপের যে ভঙ্গিটি মেলে তার সূচনা রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের গল্পে। এ ব্যাপারে অচিন্ত্যের কথা বলা চলে। অচিন্ত্যের সংলাপে আছে কাব্যপ্রাণতা। তেমনি আছে উচ্চবিত্ত মানুষ, আইন আদালতের কর্মচারী, মুসলমান চাষীমজুরের আরবী ফারসী শব্দ মিশ্রিত সংলাপ। প্রেমেন্দ্রের রচনায় নিম্নবিত্ত কেরানী, হিন্দুস্তানী গোয়ালা, গণিকার কন্ঠস্বর ও শুনতে পাওয়া যায়। শৈলজানন্দের বাড়তি আকর্ষণ সাঁওতালি সংলাপ। যুবনাশ্বে পাওয়া যাবে নীচের মহলের কথাবার্তা। পরবর্তীকালে সংলাপ রচনায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তারাশঙ্কর (গ্রাম্য চরিত্রের ক্ষেত্রে) বিভূতিভূষণ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছের বিষয় ও প্রকরণগত কয়েকটি দিকের সঙ্গে পরবর্তীকালের গল্পধারার কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা করা গেল। আলোচনা থেকে একটা জিনিষ স্পষ্ট হয়। "রবীন্দ্রনাথ থেকে সময়ের হিসাবে আমরা (অর্থাৎ রবীন্দ্র পরবর্তী তরুণ লেখকরা) দূরে সরে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তাঁকে ভুলতে পারিনি, পারা সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই রবীন্দ্রোত্তর কালের সূচনা।"৪৫ চিন্তন ও প্রকরণে পরবর্তীকাল নানাভাবে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছে বটে কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্য প্রগতির অত্যাধুনিক পথপ্রদর্শকদেরও শীর্ষস্থানীয়",৪৬ তাঁকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্র পরবর্তীকালের কথা ভাবা অসম্ভব।

কল্লোলের লেখকেরা তাঁদের সাহিত্যজীবন প্রভাতে রবীন্দ্রনাথকে অশেষ সম্ভবের উৎসরূপেই জেনেছিলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর প্রথম রবীন্দ্রদর্শনের বর্ণনায় 'সেই

দৈবত আবির্ভাবে'র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"ভাবতুম রবীন্দ্রনাথই বাংলাসাহিত্যে শেষ তারপরে আর পথ নেই সংকেত নেই। তিনিই সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা।"৪৭ কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীতে এসে সেই অচিন্ত্যই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। হয়ত এই জেহাদের ভিতর ছিল 'ভারসাম্যের আকাঙ্খা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান",৪৮ কিন্তু অচিরেই তাঁরা বুঝতে পারেন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়, স্বীকার করেই খুঁজে নিতে হবে রবীন্দ্রপরবর্তী পথের সন্ধান। তখন উষ্মা বিসর্জন দিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছেই ছুটলেন লেখা প্রার্থনা করে। এখানে তথ্য হিসাবে স্মরণীয় যে 'কল্লোল' পত্রিকায় (আয়ু ৭ বছরের) রবীন্দ্রনাথের মোট নটি কবিতা বেরোয়। রবীন্দ্রনাথের 'কবির কামনা' নামক কবিতা প্রসঙ্গে লেখা হয়—"কল্লোলের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ। অনুমতি চাহিবামাত্রই কল্লোলে প্রকাশ করিতে সম্মতি দিয়াছেন।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) যখন তরুণ সাহিত্যের 'বিদ্রোহ' নিয়ে সাহিত্য সমাজে আলোড়ন উঠেছে, তখন বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠী ছুটে গিয়েছে তাঁরই কাছে সমাধানের সূত্র সন্ধানে। সুতরাং "রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই শুরু হয়েছিল বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর পর্বের প্রস্তুতি"৪৯ একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। বরং বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেন রবীন্দ্র পরবর্তীকালের গৌরচন্দ্রিকা করে গেলেন নিজ রচনার মাধ্যমে, আর তরুণ লেখকরা তাঁর রচনায় পুণ্যস্নান ক'রে উদ্ধতবেগে এগিয়ে চললেন নতনের সন্ধানে।

(১) কুলায় ও কালপুরুষ, পৃঃ ৮ (২) ঐ, পৃঃ ১৩ (৩) রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী— প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩৪৭ (৪) জীবনস্মৃতি, র-র ১০, পৃঃ ১৪ (৫) ছিন্নপত্রাবলী, পৃঃ ৩২৫ (৬) ঐ, পৃঃ ৩২৩ (৭) ঐ, পৃঃ ৫৭ (৮) বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর (জানুয়ারী ১৯৭৬ সং), পৃঃ ২০৭ (৯) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, পৃঃ ৭৩ (১০) কল্লোল যুগ (আষাঢ় ১৩৫৮ সং) পৃঃ ৬৮-৬৯ (১১) রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য, পৃঃ ১২৫ (১২) ঐ, পৃঃ ১৪৩ (১৩) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৬ (১৪) ঐ, পৃঃ ৫ (১৫) ঐ, পৃঃ ৪৮ (১৬) সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্ররচনাবলী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ১৪ নং খণ্ড, পৃঃ ৫১৪ (১৭) বাংলা ছোটগল্প, পৃঃ ১১১, ১১৪ (১৮) দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য—ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫৬ (১৯) রবীন্দ্র-মানসের উৎস সন্ধানে— শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (২০) কবির কাজ, র,র ১৪, পৃঃ ৬০৮ (২১) সাহিত্যের বিচারক, র,র ১৩, পৃঃ ০৪৭ (২২) বাস্তব, র,র ১৪, পৃঃ ২৯৯ (২৩) সাহিত্যের স্বরূপ, র,র ১৪, পৃঃ ৫১২ (২৪) ছিন্নপত্রাবলী, পৃঃ ১৪

(২৫) ঐ, পৃঃ ৯৪ (২৬) ঐ, পৃঃ ৪৫৬ (২৭) রুশসাহিত্যের রূপরেখা—গোপাল হালদার, পৃঃ ১৫২, ১৫৪, ১৬০ (২৮) সাহিত্যের স্বরূপ, র,র ১৩, পৃঃ ৫১০ (২৯) বাংলা ছোটগল্প—শিশির দাস, পৃঃ ৭০ (৩০) ঐ, পৃঃ ৯০ (৩১) সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃঃ ৩৭০ (৩২) কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১১-১২ (৩৩) রবীন্দ্র ছোটগল্পের আঙ্গিক পর্যালোচনা—আনোয়ার পাশা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫২, (৩৪) সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃঃ ৩১৩ (৩৫) The short story—Sean O' Faolain, Pg. 192. (৩৬) English literature of the Twentieth Century—A. S. Collins, Pg. 274. (৩৭) ছোটগল্পের কথা--রথীন্দ্রনাথ রায়, পৃঃ ১৪৩ (৩৮) ঐ, (৩৯) রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, পৃঃ ৬৫ (৪০) ঐ, পৃ: ৬৩ (৪১) ঐ, পৃ: ৮৪ (৪২) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, পৃ: ৮৯ (৪৩) রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা—আনোয়ার পাশা, পৃ: ২০৮ (৪৪) শিশির দাসের প্রবন্ধ, 'একতা' (ক, বি, ছাত্রসংসদের মুখপত্র) ১৩৫২ (৪৫) 'সূর্যাবর্ত' সংকলনে সরোজ আচার্যের প্রবন্ধ (৪৬) কুলায় ও কালপুরুষ, পৃঃ ৬৭ (৪৭) কল্লোলযুগ, পৃঃ ১৪৭ (৪৮) সাহিত্যচর্চা—বুদ্ধদেব বসু, পৃঃ ১১৮ (৪৯) সরোজ আচার্যের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কল্লোলের কোলাহল

॥ ক ॥

রবীন্দ্রনাথ গল্পসাহিত্যে যে বিস্ময়বৈশিষ্ট্যের সমাহার আমাদের উপহার দিলেন, সে বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীকরণ বা প্রত্যাখ্যান এবং পাশে পাশে নূতন সৃজনের স্পৃহা নিয়ে তাঁর পৌঢ় বয়স থেকেই বাংলা পাঠক ও সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ তারুণ্য চিরকালই বিদ্রোহ-পন্থী, সে নিজের তৈরী পথে চলতে ভালোবাসে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই তারুণ্যের সমস্বর শোনা গিয়েছিল কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), সংহতি (১৯২৪), উত্তরা (১৯২৫), বিচিত্রা (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকায়। বিরোধ সৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছিল শনিবারের চিঠি (১৯২৪)। কল্লোল ছোট কাগজ হলেও চলে প্রায় সাতবছর, শনিবারের চিঠি বাদে অন্যগুলোর আয়ুও দীর্ঘ নয়। এইসব পত্রিকায় সাহিত্যের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপায়ণগত কতকগুলো নূতনত্ব গড়ে উঠতে থাকে। প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত, নবীন এবং অস্থিরচিত্ত সাহিত্যিক ও পাঠকের দল নূতনের পক্ষে বা বিপক্ষে গিয়ে সহর নগরের একাংশে হৈচৈ ফেলে দেন। তা ছিল যেমন আনন্দ তেমন আতঙ্ক বিস্তারী। এ ব্যাপারে গল্প-উপন্যাস বা কবিতা দুইই উদ্দীপকের কাজ করেছিল। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এই কালটার নামকরণ করেছেন—কল্লোলযুগ।

বিখ্যাত সমালোচক জি. লুকাচ বলেছেন—"it is the evolution of society that determines the line the evolution of an author will take."[১] এই নিরিখেই 'কল্লোল-যুগ'এর সাহিত্যবৈশিষ্ট্য সমকালীন কোন্ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে লালিত হয়েছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। A. C. Ward যথার্থই বলেছেন—"in that first fifty years of the twentieth century the human race moved faster forward and backward—than during perhaps fifty generations in the past."[২] এই সর্বপ্রথম সংঘটিত সমষ্টিগত যুদ্ধ, যুদ্ধের বিস্তৃতি, মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার, বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির গঠনে পরিবর্তন, পরাধীন দেশসমূহে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের জাগরণ, গণতন্ত্রের প্রসার, কোথাও বা একনায়কত্বের প্রবর্তন, যুব সমাজের জাগরণ, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং পৃথিবীব্যাপী অর্থসংকট প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কালটি

চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব উল্লেখযোগ্য না হলেও পরোক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ভারতবর্ষ। যুদ্ধের কালে বিদেশী পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রতি-যোগিতা দেখা দেয়, যা দেশীয় অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধাবস্থার দরুণ জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য হল, জীবনযাত্রার মান দ্রুত অবনতির দিকে যেতে থাকল। শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে দেখা দিল ঘোর অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ঘন ঘন ধর্মঘট, খাজনা বন্ধের চিন্তা, সন্ত্রাসবাদের স্ফুরণ ইত্যাদিতে তার প্রকাশ মেলে। এদেশে এ সময় যেমন চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়, তেমনি বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ চরমে উঠলে ১৯০৫-১১ সালের স্বদেশী আন্দোলনে তার চরম প্রকাশ দেখা যায়। চম্পারণে নীলচাষীদের সংগ্রাম, গুজরাটে কৃষকদের সত্যাগ্রহ, ১৯১৯ রাওলাট আইনের দেশব্যাপী বিরোধিতা, অমৃতসরে গণ-অভ্যুত্থান, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি এ সময়ের কয়েকটি চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী ঘটনা। ১৯২০ খ্রীঃ খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এই দুটি ধারা এক সংগ্রামের মঞ্চে মিলিত হওয়ায় এক অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত হল। এই সূত্রে সারা ভারতব্যাপী হরতালের সাফল্যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যও দৃঢ়বদ্ধ হয়। ১৯২১-এ কংগ্রেসের ডাকে অসংখ্য উকিল, অধ্যাপক, ছাত্র চাকরী ছেড়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয় ও দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। দেশের জনতা যখন ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলন শুরু করার দাবী জানাল, তখন কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য এক কোটি টাকা তোলার, এক কোটি সভ্য সংগ্রহ করার ও কুড়ি লক্ষ চরকা তৈরীর ডাক দিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস শুধুমাত্র বিলাতী কাপড় পোড়ানোর সংকল্প নিলেও বোম্বাইয়ে যে প্রতিরোধ আন্দোলন হয়, তাতে ৫৩ জন লোক নিহত ও ৪০০ জন গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজী এর অনুমোদন না করলেও শীঘ্রই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন, ৩০,০০০ সত্যাগ্রহী জেলে যায়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলছিল ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি। এমন সময় চৌরীচেরাতে জনতা কর্তৃক থানা আক্রমণ, ২১ জন কনস্টেবল ও ১ জন সাব-ইনস্পেকটরকে জীবন্ত দগ্ধ করার প্রতিবাদে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল—দেশব্যাপী অবসাদ ও হতাশা। কিন্তু যে যুবকবৃন্দ অবসাদগ্রস্ত হতে চাইলেন না, তারা ক্রমশঃ সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করলেন। এই পথেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টি রাজনীতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্যেও এর প্রতিফলন পড়ে। ডি, এইচ, লরেন্স তাঁর 'ক্যাঙ্গারু' উপন্যাসে এক জায়গায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর মূল্যবোধের

পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছেন—"It was in 1915 the old world ended. In the winter 1915-16 the spirit of the old London collapsed ; the city, in some way, perished, perished from being the heart of the world, and became a vortex of broken passions, lusts, hopes, fears, and horrors." ভারতীয় পরিস্থিতিতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু প্রাচীন মূল্যবোধের জগৎ সুনিশ্চিত ভাবেই শিথিল হতে শুরু করে। বাংলাদেশের সমাজকাঠামো তখনও গ্রামকেন্দ্রিক, কৃষিভিত্তিক। ফলে, চাকরীর কারণে কলকাতায় আসা-যাওয়া করতে হলেও বাঙালীর মনের আকর্ষণ ছিল গ্রামের বাস্তুভিটার পানে। কিন্তু সেখানে ম্যালেরিয়ার বিস্তার, গ্রামীণ উদ্যমহীন নিষ্ক্রিয়জীবন আর জমি নিয়ে কলহে ক্রমশঃ বাঙালীর গ্রামের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হচ্ছিল। ফলে, তারা ক্রমশঃ শহরের মুখ্যত কলকাতার বাসিন্দা হলো। এছাড়া চতুর্দিকে কলকারখানার প্রসার ঘটেছে, কলকাতাতেও বাঙালী শ্রমিকসম্প্রদায় ব্যাপকতর হতে লাগল। পল্লীজীবনের আকর্ষণ যত কমল, বাঙালী একান্নবর্তী পরিবার প্রথাও ততই ভাঙতে লাগল। ফলে প্রাচীন পরিবারব্যবস্থায় অভ্যস্ত বাঙালীর প্রথা, রুচিও সাধ্যের মধ্যে নানান দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। আর্থিক, রুচি ও প্রয়োজনগত কারণে যেমন বাল্যবিবাহ জনপ্রিয়তা হারাল, তেমনি পর্দা-নশীন মেয়েরা ক্রমশঃ ঘরের বাইরের জগতে, স্কুল, কলেজ ও চাকরীতে যেতে আরম্ভ করল। ফলে তাদের রুচিও বদলাতে থাকে। এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা দশ বছরের মধ্যেই আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। 'কল্লোল'-এ লেখা হয়েছিল—"শুধু এক বাঙ্গালা দেশে প্রায় একলক্ষ মধ্যবিত্ত বেকার বসিয়া আছে।" চাকরীর অভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা থেকেই যুব মনে জন্ম নেয় প্রবল অসন্তোষ। এই থেকেই জন্ম নেয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন সন্ত্রাসবাদের ব্যাপকতা, সামাজিক ক্ষেত্রে তেমনি নানান স্বেচ্ছাচারিতা। 'কল্লোল'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোকুল নাগ ১২ই কার্তিক, ৩১-এর এক পত্রে নিজেদেরকে আখ্যাত করেছিলেন 'ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদী' বলে।৩ আখ্যাটি লক্ষণীয়। ইংরাজী সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর যুবমনেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ভিক্টোরীয় যুগের বিরুদ্ধে।

"Young men and women during the twentieth century looked back upon the Victorian age as dully hypocritical . . . at the turn of the new century came a succession of writers with powerfully sceptical minds untouched by reverence for custom or the established order."৪ বাংলাদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

লিখেছেন—'সেই সাড়াটা (অর্থাৎ, কলকাতার তৎকালীন রাজনীতিক অস্থিরতা) কল্লোলের লেখকদের মধ্যেও এসে গেল। চিন্তার প্রকাশে এল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ।''[৫] লক্ষ্য স্পষ্ট না হলেও একালের তরুণ মন চাইছিল প্রচলিত সমাজ ও সংস্কারের অচলায়তনের মধ্যে মুক্তধারা প্রবাহিত করতে। উদ্ধত যৌবনের এই ফেনিল উদ্দামতা নবীন লেখকের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠলো 'কল্লোল' প্রভৃতি তরুণদের পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে। অবশ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গ ভঙ্গের এই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাঁরা কতদূর সচেতন ছিলেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। বুদ্ধদেব বসু কালসচেতনতার সামান্য পরিচয় দিয়েছেন সেকালেরই একটি প্রবন্ধে : ''বর্তমান বাংলাদেশে জীবনসংগ্রামে যে কঠোর প্রতিযোগিতা চলেছে তাকে মুখের গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না। দারিদ্র্যের তাণ্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, আনন্দ, প্রাণ, আয়ু, ইহকাল, পরকাল—সব। ...প্রাচীন বাংলা সমাজের জাতিগত আভিজাত্য এখন আর নেই, কেবলমাত্র জন্মগত শ্রেষ্ঠতার অজুহাতে কেউ আর আজ কৌলীন্যের দাবী করতে পারে না; আস্তে আস্তে নূতন আদর্শের আভিজাত্য গড়ে উঠছে—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, সঙ্গে সঙ্গে অর্থেও। ...একটি লোক এখন নিষ্কর্মা বসে খেতে পায় না, ছেলে উপযুক্ত হলে বাপ অতিরিক্ত বোঝা মনে করে' তাকে ঝেড়ে ফেলতে চায়, ভাই ভাইকে আশ্রয় দেয় না, দিতে পারে না। ফলে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে পড়ছে—আত্মনির্ভরশীল হবার চেষ্টা সবার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের স্বোপজীবিকা উপার্জন করতে হয় বলেই তাদের প্রতি যে ঘৃণা তা-ও দূর হচ্ছে।''[৬]* বঙ্কিমী বা পরবর্তী যুগের সামনে ছিল স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। সমসাময়িক সমাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবার মতো বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয়। কিন্তু কালের সংঘাতে সে প্রত্যয় ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেছে। আধুনিকেরা আর অতীতের প্রতি বিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকাতে পারেনা, ভবিষ্যতের মিথ্যা স্বপ্ন দেখতেও সাহস পায় না। আমরা দেখি প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশে দেশে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, মহামারী

---

* 'কল্লোলে'র 'ডাকঘর' শীর্ষক ফিচারেও সমকালীন পরিবেশ সম্পর্কে দুচার কথা পাই—''মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির যে কি দুরবস্থা তাহা যাঁহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। এমন অবস্থা আসিয়াছে একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জনে আর একটি পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য বা বস্ত্রও যোগাড় হইয়া ওঠে না। এই অবস্থায় আবশ্যকবোধে হয়ত নারীকেও উপার্জন করিয়া পরিবারকে সাহায্য করিতে হইতেছে। এরূপ পরিবারও আছে, শিক্ষিতা নারীর উপার্জন দ্বারা সমগ্র পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে।''

—মাঘ, ১৩৩৪

আর নৈতিক বিপর্যয়ের আতঙ্কজনক ইতিহাস। অন্যদিকে রুশ বিপ্লবের সাফল্য সারা পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলনে নূতন শক্তির সঞ্চার করে। এই সাফল্যকে রোধ করার ও ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ইচ্ছায় দেশে দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়, এদেশেও তার ছাপ পড়ে। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের মনোজগতের নানান বিকলতার উৎস খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড, ইয়ুং, এলিস প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদরা মানুষের চেতনলোকের অন্তরালে এক অচেতন লোকের রহস্য উন্মোচনে আগ্রহী হন। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও মনস্তত্ত্ব-বিদদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ফলে, প্রচলিত সামাজিক ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনে যা কিছু নিষিদ্ধ, অস্পৃশ্য, সাহিত্য ও শিল্পের জগতে তারা পেতে থাকে বেপরোয়া প্রবেশাধিকার। এই সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, রুশ বিপ্লবের ইতিহাস ও রুশ সাহিত্যের ব্যাপক পঠনপাঠন শুরু হয়ে যায়। সমকালীন বাঙালী জীবনের ক্রমান্বয় ভাঙন ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশীয় ভাব ও চিন্তাধারার সংঘাত দেখা দেয় জাতীয়জীবনে। নানান আবিলতা, উজ্জ্বলতা ঘিরে, সাহিত্যে নূতন একটা পর্যায় যে সূচিত হতে যাচ্ছে 'কল্লোল'-এর 'ডাকঘর' শীর্ষক ফিচারে তার একটি সুন্দর পরিচয় মেলে—"যে অবস্থায় দেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহারই সূচনা মাত্র আজ বাঙলাদেশে। দেশের ও সমাজের অবস্থা তরুণের দলকে জর্জরিত করিতেছে, (যাঁহাদের মুখ চাহিয়া তাহারা এ যন্ত্রণা ভুলিতে পারে) তাঁহাদের মুখেও কোনও উচ্চ আদর্শের জ্যোতি দেখিতে পায় না, আজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াই তাহারা এই নিষ্ঠুর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ইহাতে যদি গুরুজনদের মনকষ্ট হয়, বা কাহারও কাহারও অপযশও হয় তাহাও তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত। তবু তাহারা তাহাদের সামর্থ্যমত এই অপকৃষ্ট রচনার ভিতর দিয়াই বাঙলার মুখ ফিরাইবে, যশশোভায় প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।" ৭

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বর্ণনাতেও আমরা এই উদ্ধৃত বক্তব্যের শুধু বেদনার দিকটারই পরিচয় পাই—"আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা যে জায়গায় পাচ্ছে তা তার আত্মার আনুপাতিক নয়—এই অসন্তোষে, এই অপূর্ণতায় সে ছিন্নভিন্ন।" ৮

সাহিত্যে পুরানো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনা যে আর চলবে না আর একবার এই বোধ উপলব্ধ হওয়ার সূচনা হল 'কল্লোলে'র কাল থেকে। শৈলজানন্দ বলেছিলেন—"আজকের দিনে যত নতুন লেখক আছে স্তব্ধ হয়ে সবাইর ভাষাই ঐ কল্লোল।" (কল্লোল যুগ, পৃঃ ৩৭) সবাইয়ের ভাষা তার মধ্য দিয়ে রূপ না পেলেও কল্লোলের কোলাহল

যে অবরুদ্ধ যৌবনের সৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।* 'কল্লোল'-এর ২য় সংখ্যাতে নজরুলের কবিতায় এই মনোভাবের পরিচয় মেলে ঃ

"আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে/ বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙ্গা কল্লোলে।" (সৃষ্টি সুখের উল্লাসে)

বিজয়চন্দ্র মজুমদার-ও এই সংখ্যায় লিখেছিলেন—"বিধাতার আইনের উপরে আত্মদম্ভের আইন চাপাইয়া নূতন নূতন বিশ্বামিত্র সাজিয়া তাড়াতাড়ি নূতন সৃষ্টি করিতে চাই।" কিন্তু এই সৃষ্টিসুখের উল্লাসকে সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়নের দ্বারা জারিত করার ধৈর্য তাঁদের অল্পই ছিল। নূতন বিশ্বামিত্রের উগ্রতা আর অস্থিরতায় তাদের পেয়ে বসেছিল। দীনেশরঞ্জন একটি কবিতায় লিখেছিলেন—"আমি কল্লোল শুধু কলরোল দিশাহীন।" কিন্তু দিশাহীনতার ফল যে অপমৃত্যু, এ বোধের উদ্বেগ তাঁদের ছিল না।

কল্লোলের লেখকদের মুখে বিদ্রোহ এবং ভাঙনের অনেক চমকপ্রদ কথা উচ্চারিত হয়েছে সন্দেহ নেই। অচিন্ত্য বলেছেন, কল্লোল ছিল "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচাভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।' ৯ কিন্তু 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা দেখব, এই বিদ্রোহ-উচ্চারণে শুধুই ভাঙার কথা, গড়ার কথা নেই। অচিন্ত্যবাবু দীনেশরঞ্জনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন "তাঁর বিদ্রোহ রাজনৈতিক নয় জীবনবাদের বিদ্রোহ।"১০ তিনি সত্যভাষণের আলোকে নিজেকে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অনির্বাণ করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ শুধু কথার কথা, তাঁর রচনায় এ সবের পরিচয় নেই, প্রচেষ্টাও নেই। এই দীনেশরঞ্জনের নেতৃত্বে তাঁরা চিরকুমার থেকে সাহিত্যিকদের কমিউন বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অবাস্তব প্রস্তাব বলেই 'সে সুন্দর স্বপ্নের উপনিবেশ স্থাপন' সম্ভব হয় নি। বলা হয়েছে, কল্লোলের "সাধনাই ছিল নবীনতার অনন্যতার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি।"১১ কিন্তু তাঁদের রচনায় এই প্রচণ্ড অস্বীকৃতি নেই, দেখা যায়, একটা 'রঙিন উচ্ছৃঙ্খলতা'র ১২ পরিমণ্ডল ঘুরেছেন তাঁরা—তা অনেকটাই বাইরের ব্যাপার। যথাযথ আত্মবিশ্লেষণের অভাবে, সমকালীন বৈপরীত্যের স্বরূপ

---

* এই প্রসঙ্গে তথ্য হিসাবে স্মরণীয় যে, "সুখ দুঃখ প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি জীবনে তৃষ্ণার তাড়না কামনার বেগ, বেদনার দাবদাহ, প্রেমের অভিষেক" এবং "স্বপ্নের মানসী প্রতিমা"কে অর্ঘ্য নিবেদন—ফোর আর্টস ক্লাবের এইসব ধ্যানধারনাই পরে বিশদভাবে প্রকাশিত হয় তরুণদের রচনায়। কল্লোলের কাল—জীবেন্দ্র সিংহরায়, পৃঃ ৪, ১৯।

বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে না পারায়, দেশজ সংস্কৃতি ও শিল্পগত ঐতিহ্যের প্রতি নির্বোধ উদাসীনতা থাকায় তাঁরা বৃথাই কৃত্রিম বিদ্রোহের কেল্লা গড়েছেন। 'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকার পাতা ওল্টালেও একথাটাই স্পষ্ট হয় যে, তাঁদের বিদ্রোহের পা শক্ত মাটিতে ছিল না। কারণ যাঁদের বিরুদ্ধে, যে সবের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ, সেই সব প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখা 'কল্লোল' প্রভৃতি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে স্বয়ং অচিন্ত্যই স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন—"পূর্বাগতদের প্রায় সকলেরই স্পর্শ পড়েছিল কল্লোলে।"১৩ (প্রধান প্রতিপক্ষ বলে ঘোষিত রবীন্দ্রনাথের ৯টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোলে'-এ।) "কল্লোলে ওঁদের লেখা প্রকাশিত হলেও ওঁদের লেখায় কল্লোল প্রকাশিত হয়নি"—অচিন্ত্যবাবু একথা বলে নিজেদের বিদ্রোহীসত্তার মর্যাদাকেই খাটো করেছেন, একথা অস্বীকার করা চলে না। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত কাগজে এইসব বিদ্রোহী লেখকদের লিখে প্রতিষ্ঠা পাবার বাসনাও পুরোমাত্রায় ছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, যতীন্দ্র বাগচীর সাহিত্যবৈঠকে প্রবেশলাভের স্বপ্ন দেখতেন।১৪ 'প্রবাসী'তে কল্লোলীয়দের আসন করে দেওয়াকে সবচেয়ে বড় কাজ—সংকীর্ণ গিরিসংকট থেকে প্রশস্ত রাজপথে যাওয়া, জাতে ওঠা প্রভৃতি বলা হয়েছে।১৫ প্রবীণপন্থী 'ভারতবর্ষ' কাগজের 'হৃদয়ের দাক্ষিণ্য'-ও এই বিদ্রোহীদের কম দরকার ছিল না।১৬ তাই সজনীকান্তের মন্তব্য কিঞ্চিৎ রূঢ় হলেও সত্য—"কল্লোল আসিয়া আমাদের পাড়ায় পৌঁছিল।...বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত এমন কিছু নহে ; পাঁচটা পত্রিকা যেমন হয়, সেই রকমই পাঁচমিশেলী ব্যাপার, থোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি থোড় ; লেখক রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, নৃপেন্দ্র, বুদ্ধদেব পর্যন্ত ; পুরাতন এবং নূতনের মিশাল, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের লেখাই ইহাতে থাকিত।"১৭

কল্লোল-লেখকদের আর একটি বৈশিষ্ট্য—ভাবনার শিথিলতা। সে যুগের সামগ্রিক চরিত্রেই ছিল এই মানসিক দ্বিচারিতার বীজ। সমসাময়িক কালের আগ্রাসী নৈরাশ্যের বন্ধ দরজায় তার মাথা খোঁড়া, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনা। একদিকে প্রবল বিরুদ্ধবাদ' অন্যদিকে 'বিহ্বল ভাববিলাস।' এই দুই ভাবের প্রভাবে তাঁরা কখনো উন্মত্ত কখনো আনমনা। কখনো সংগ্রাম, কখনো জীবনবিতৃষ্ণা। অমলেন্দু বসু লিখেছিলেন—"আমাদের অন্তরের নিভৃতনীড়ে আশা ও নৈরাশ্য উভয়ে পাশাপাশি বাস করে, সেই ব্যথিত, নিপীড়িত প্রাণধারাকে আমরা সযত্নে প্রতিপালন করিতে চাই।"১৮ কিন্তু সে সযত্ন প্রতিপালনের ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। 'বিরতিহীন সংগ্রাম' (কিসের সংগ্রাম ? কি ভাবে ?) ও দায়িত্বহীন বোহিমিয়ানিজম'কে এক সঙ্গে লালন করে অগ্রগতি সম্ভব নয়।

তরুণ লেখকরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নিজেদের আত্মবিকাশের পথগুলোকে ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে যেতে দেখে ধর্ম, সমাজ ও পারিবারিক সংস্কারগুলোকে ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকায় বলা হয়—"তরুণেরা বলে, নিজেদের দোষ দুর্বলতাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করাই কুরুচির পরিচয়। তাহারা মনে করে দেশেরএমন একটা অবস্থা আসিয়াছে যে, দেশের সমাজ, ধর্ম বা রাষ্ট্রে যে সকল গ্লানি রহিয়াছে তাহা নিজেদের স্বীকার করা প্রয়োজন এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া নির্ভীকচিত্তে তাহা অপসারণ করার চেষ্টা করাও আবশ্যক। তাই কেহ কেহ সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই চেষ্টা করিতেছে।"১৯ দীনেশরঞ্জন অচিন্ত্যকে লিখেছিলেন—"পলিটিক্স বুঝি না, ধর্ম মানি না, সমাজ জানি না—মানুষের মনগুলি যদি সাদা থাকে—ব্যস্, তা হলেই পরমার্থ।' ২০ অন্যত্র বলেছেন—"মিথ্যার পাশ কাটিয়ে নয়, মিথ্যার মূলোচ্ছেদ করে সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়াও। শাখায় না গিয়ে শিকড়ে যাও, কৃত্রিম ছেড়ে আদিমে; সমাজের গায়ে যেখানে-যেখানে সিল্কের ব্যাণ্ডেজ আছে তার পরিহাসটা প্রকট করো।"২১ এই কর্তব্য-সম্পাদন করতে গেছেন তাঁরা কখনো প্রবল বিরুদ্ধতায় বা বিহ্বল ভাববিলাসে, আবার কখনো বা জিজ্ঞাসা বা নৈরাশ্যে। এখন এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো কতদূর সম্ভব হয়েছিল তা দেখা যাক।

প্রথমত: ধর্মপ্রসঙ্গ। বিভিন্ন উক্তি থেকে আমরা দেখেছি যে ধর্মপ্রসঙ্গে কল্লোলের লেখকেরা নাকি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সামন্ত সমাজে নানান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্মচেতনাতেও যে পরিবর্তন চলতে থাকবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয়তাবাদী দলগুলিতে রাজনীতি ও ধর্মনীতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভারতীয় জনজীবনে—যার মূলভিত্তি কৃষিতে, পরিবেশ যার প্রধানতঃ গ্রাম—ধর্মের প্রভাব ছিল পর্যাপ্ত। কল্লোলের এই ধর্মবিদ্রোহ সুতরাং সেকালের পরিপেক্ষিতে দৃঢ়মূল হওয়া সম্ভব ছিল না, এটা উদাহরণ ছাড়াই বোঝা যাবে। কল্লোল, ১ম বর্ষ ভাদ্র সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে স্বামীজী সন্ন্যাসীদের প্রতি আক্রমণাত্মক কথা ছিল। তরুণ প্রেমেন্দ্র অচিন্ত্যকে লিখেছিলেন—"যদি এই নির্বোধ মানুষ জাতটাকে শেখাও শুধু নিছক স্ফূর্তির উপাসনা—এই দেবতা-ঠাকুরকে দূর করে দিয়ে, ঝেঁটিয়ে ফেলে সব সমাজ শাসন সব নীতির অনুশাসন—শুধু জীবনটাকে আনন্দের সরাবখানায় অপব্যয় করতে—তবে রাজী আমি।"২২ কিন্তু তবু মনে হয় ধর্ম সম্পর্কে 'কল্লোল' পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ উদার। যেমন ১ম বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে বলা হয়েছে—"মানুষের দুঃখকষ্ট অশান্তির মধ্যে একমাত্র ধর্মকেই অবলম্বন করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকে। সে ধর্ম যদি কতকগুলি

মানুষের হাতে পড়িয়া জজের মত বিচার করিতে বসে তাহা হইলে মানুষকে ধর্মান্তরে শান্তির আশায় ছুটিয়া যাইতে হয়। ধর্ম মানুষকে আশ্রয় দেয় সে কখনও জীবনে প্রত্যাখ্যান করে না।" এরপর বেলুড়মঠের জমির কিছুটা রেল কোম্পানী নিয়ে নেবার সংকল্প করায় বলা হয়েছে "তবে মঠের বিশেষ অপকার হইবে, তপোবনেরও শান্তি-নাশের বিশেষ আশঙ্কা।" অতএব অভিমত, এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করা দরকার, সমবেত চেষ্টায় বাঙালী মাত্রেরই প্রতিরোধ প্রয়োজন। যদিও সেকালে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন —"অন্ধভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই, আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে"২৩ তথাপি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তপোবনের শান্তিনাশের আশঙ্কায় আশঙ্কিত কল্লোলিয়দের ধর্মবিদ্রোহী বললে অবিচারই করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, এইসব তরুণ বিদ্রোহীদের আজীবন রচনায় সামন্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে তেমন সচেতন জেহাদ নেই, ধর্ম ও ধর্মব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিরোধিতা নেই, বিজ্ঞান চেতনায় প্রভাবিত হওয়ার প্রমাণ নেই। অচিন্ত্যবাবু তো প্রৌঢ়ত্বে ধার্মিকজীবনীরচনা ও ধর্মসভায় কথকতা করায় যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। অগ্রহায়ণ, ১ম বর্ষের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল—"যিনি নিরন্তর জেগে বসে থেকে অনাদিকালের এই কল্লোল-রোল অক্লান্ত হয়ে শুনছেন, তিনিই আশ্চর্যরকমে সমস্ত অনুকূল অবস্থার মধ্যে বাংলার মানুষের মনে এর সুন্দর একটুখানি ঠাঁই করে দিয়েছেন।' এই 'তিনি'টি কে? রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা'র মতোই কিছু নন কি?

এবার পারিবারিক সংস্কারের বর্জন প্রসঙ্গ। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, একালে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা লোপ পেতে শুরু করে, জীবন শহরমুখী হয়, মেয়েদের বাল্যবিবাহ কমে, স্কুল কলেজে মেয়েদের আসা-যাওয়া আগের তুলনায় বাড়ে, চাকুরে মেয়েও দেখা যেতে থাকে। জীবন পটের এই পরিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন—"ফিরে চল উদ্বেলিত যৌবনের সিন্ধুতীরে /স্বপ্ন সত্য যেথা সত্যপ্রিয়া, যেথা প্রণয়ের জয় নিত্য ওঠে গানে গানে।" (উদ্বেলিত যৌবনের সিন্ধুতীরে, কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩২) কল্লোলের লেখকেরা এই প্রণয়ের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন। সেকালে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—"একথা অবশ্য ঠিক যে অন্য সব জিনিসের চাইতে 'নরনারীর সম্বন্ধের নানা জটিল সমস্যার দিকটাই এদের কল্পনাকে উত্তেজিত করেছে বেশী; দেহের সম্ভোগ লিপ্সাকে এরা অস্বীকার করে নি, হৃদয়বৃত্তির সৌন্দর্য ও মহিমাকেও যথেষ্ট সম্মান সহকারে স্থান দিয়েছেন।"২৪ মুক্ত, উদ্দাম, সমাজচেতনাহীন শরীরী প্রেম বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম নয়। এর আগে ভারতী গোষ্ঠীর লেখকদের বিশেষতঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের লেখায় এর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। তবে,

কল্লোল-পর্বের সাহিত্যে এই শরীরী প্রেম নিয়ে আলোড়নটা যত তীব্র হয়েছিল, ততটা আগে হয় নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের পারিবারিক কাঠামো, সেই সঙ্গে মূল্যবোধগুলি বদলাচ্ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গভঙ্গের ধাক্কায়। এরই সঙ্গে ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার, হ্যাভলক এলিস প্রভৃতির চিন্তাধারা যা সমসাময়িককালে ইউরোপে আলোড়ন তুলেছিল, আমাদের শিক্ষিত মহলেও কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফ্রয়েডের মতে মনের তিনটি স্তর—সচেতন (Conscious), মগ্নচেতন (Pre-conscious বা Sub conscious) ও অবচেতন (Unconscious)। মানুষের সচেতন মনের ইচ্ছা ও কর্ম বহুলাংশেই অবচেতন স্তরের সঞ্চয় দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মন নিয়ে এত গভীরভাবে আলোচনা ও নূতনভাবে চিন্তার সূত্রপাত ঘটে ফ্রয়েডের হাতেই। ১৮৯৮ সালে তিনি ঘোষণা করেন, যৌনানুভূতি কেবল যে মৌলিক অনুভূতি তাই নয়, ব্যাক্তি মানুষ জন্ম থেকেই যৌনানুভূতির শরিক। কিন্তু সমাজে এর স্বতঃস্ফূর্ত পূরণ সম্ভব নয় বলে, বিভিন্নভাবে যৌনাবেগ অবদমন করা হয়। এই অবদমিত ইচ্ছা মনের বৃহত্তর এবং অবচেতন ভাগের সংগঠন। অতৃপ্ত ও অবদমিত কামনার সঙ্গে শুধু পরিবেশের উপর নয়, ব্যক্তি চেতনারও বিরোধ ঘটে। এর ফলে যেমন মানসিক বিকার দেখা দিতে পারে, তেমনি নানান সৃজনমূলক কাজের জন্মও হতে পারে। এ তত্ত্বের সঙ্গে ইডিপাস কমপ্লেক্স ও ইলেকট্রা কমপ্লেক্স তত্ত্বও প্রচারিত হয়। কিন্তু শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রে নয়, ফ্রয়েডের তত্ত্ব অন্যান্য মানব বিদ্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

"Freud subjects all mental conditions, all actions of man, and also all historical events and social phenomena to psychoanalysis, i e , interprets them as manifestations of unconscious, above all sexual impulses Thus the ideal—the psychic (above all the unknowable 'Id'—the unconscious) is considered the cause of the history of mankind, morality, art, science, religion, state, law, wars and so on."২৫ *

---

* প্রথম প্রচারকালে সামন্ততন্ত্রী চিন্তার বিরুদ্ধবাদী হিসাবে অনেকের কাছে ফ্রয়েড-বাদ প্রগতিশীল জীবনদর্শন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েড সত্যা-কারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু করলেও শীঘ্রই বিজ্ঞানের পথ ত্যাগ করেন ও জীবনসায়াহ্নে যে দর্শন—Metapsychology গড়ে তুলেছেন, তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাছাড়া, ফ্রয়েডের মতে, মানুষের সামাজিক ও নীতিবোধ

বলাবাহুল্য, সভ্যসমাজের যাবতীয় প্রকর্ষের মূলে অবরুদ্ধ সক্রিয় যৌনতার কথা স্বভাবতঃই বিদেশের মত বাংলাদেশেও আলোড়ন তুলল। ইয়ুং অবচেতন তত্ত্বকে আরো বিস্তৃত করে তোলেন।** তাতে হাত লাগান আরো অনেকের সঙ্গে অ্যাডলার।† আর, হ্যাভলক এলিসই সর্বপ্রথম প্রেম ও কামের সম্পর্কের ব্যাপারটা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন, এবং সাত খণ্ডে বিস্তৃত ও একত্রিশ বছর ধরে রচিত Studies in the Psychology of Sex নামক গ্রন্থে যৌনত্ব নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন।

আমাদের দেশের তৃতীয় দশকের তরুণ রোমান্টিক মনে এইসব মতবাদ যেন বয়সোচিত প্রেম ও যৌনতৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দিল। অবশ্য এই প্রেমচেতনার পরিপুষ্টিতে ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শন-ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'কল্লোল' পত্রিকায় এ বিষয়ে

তার পরিবেশের ওপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। তাঁর মত, ইতিহাস শক্তিশালী পুরুষের সৃষ্টি, জনসাধারণের উচিত তাদের আজ্ঞানত দাস হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া। আর, মানুষের মধ্যেই যেহেতু ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি আছে, তাই যুদ্ধ জাতির জীবনে অনিবার্য। ফ্রয়েডের কাছে, নারীর ভবিতব্য—হীনতাবোধ ও নিষ্ক্রিয়তায়। ফ্রয়েড বলেন, মানব-সমাজে যে শ্রেণীবিরোধ তা ঐতিহাসিক নয়, চিরন্তন ব্যাপার। এ থেকেই আসে উন্নত জাতির প্রভুত্ব সমর্থনের তত্ত্ব। বলাবাহুল্য, ফ্রয়েডের এসব চিন্তা যুগ বিশ্লেষণে ব্যর্থ, জনস্বার্থবিরোধী ও অনৈতিহাসিক। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু ফ্রয়েডকে নিছক একজন মনস্তাত্ত্বিকরূপেই চিহ্নিত করেন।

** সি, জে, ইয়ুং ফ্রয়েডগঠিত সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে গড়ে তোলেন Analytical Psychology, তিনি বলেন, ব্যক্তির অবচেতন মনের (Individual unconscious) নীচে থাকে বংশগত ও জাতিগত অভিজ্ঞতার রেশ। এগুলো তার জীবনে নানাভাবে সক্রিয় হয়। তার অভিব্যক্তি ঘটে প্রতীক রূপে, ইয়ুং-এর ভাষায় যার নাম Archetype.

† অ্যালফ্রেড অ্যাডলারও ছিলেন এককালে ফ্রয়েডপন্থী। কিন্তু যৌনতত্ত্বের ওপর ফ্রয়েডের অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ পছন্দ না হওয়ায় তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতে থাকেন, বলেন—হীনতাবোধই (Inferiority Complex) সকল মানসিক সমস্যার মূলে। এই হীনতাবোধ থেকে মানুষ মুক্তি চায়, শক্তি চায়, প্রতিষ্ঠা চায়, নিজেকে শ্রেষ্ঠ করে তুলতে চায়। তিনি বলেন, যৌনতা সব কিছুর নিয়ামক হতে পারে না। সামাজিক জীবন যাত্রার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কেমন, তার ওপরই পরবর্তীকালে তার বৃত্তিগত বা যৌনজীবন সমস্যাগুলি কেমন হবে, সমাধান কোনপথে তা নির্ভর করবে।

একাধিক আলোচনা তার প্রমাণ দেয়। যা ছিল নিষিদ্ধ, অস্পষ্টভাবিত, সেই চিন্তাকে তাঁরা স্পষ্টবাক্ করে তুলতে চাইলেন। সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ যুবমন নানাভাবে প্রকাশ করছিল, সাহিত্যে তা সর্বাপেক্ষা হৈ-চৈ তুলল এই প্রেম ও কামের প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে। তারুণ্যের বিস্মিত স্বীকৃতির এই পরিচয়টা পাওয়া যাচ্ছে কল্লোল, কার্তিক, ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'অভিনয় নয়' গল্পে, যেখানে নায়ক বলে—"ফ্রয়েড পড়ে অবধি আমার মনে হয়েছিলো যে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস নেই—থাকতে পারে না—যা আমি না বুঝতে পারি।" ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "আমরা ও তাহারা" নামের প্রবন্ধে ফ্রয়েড, ইয়ুং-এর রচনা এবং প্রেম ও যৌনতাপ্রধান বিদেশী সাহিত্যের পঠন কিভাবে তরুণ মনে প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে লিখেছিলেন। (কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সংখ্যা) তরুণরা আধুনিক হবার লোভে প্রেমের পুরাতন ঐতিহ্যকে রাতারাতি বর্জন করে (নিজ মন পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বেই) এ ব্যাপারে কালাপাহাড়ী ভূমিকায় নেমেছিলেন। এই সূত্রেই পুরাতন প্রেমতন্ময়তা—যাতে নায়ক নায়িকার মানসিক উদ্বেলতাই মাত্র আলোচ্য—বর্জন করে এবং বাংলা সমাজে উপেক্ষিত যৌনজীবনকে অধিক প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেন—"ভগবান, ভূত ও ভালবাসা—এই তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।" তার পরিবর্তে "আইডিয়েলের মূর্ত জীবন্ত প্রকাশ" দেখবার জন্যই জীবন-জোড়া অন্বেষণের কথা বললেন। "মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য—প্রেম" এই বলে তরুণদের মনে হল। কল্লোলের লেখিকা সুনীতি দেবী আক্ষেপ করে লিখেছিলেন—"কোথায় শাশ্বত প্রেম হায় ?" প্রেম তা সে শাশ্বত হোক, আর ক্ষণকালীন হোক, তাতে চাই শরীরী স্পর্শ, আর সেই প্রেমের জন্য তরুণদের ছিল যেন মরুতৃষ্ণা। প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন—"জীবনের চরম সার্থকতা এই প্রেমের জাগরণে। যতদিন না এই প্রেম জাগে ততদিন মানুষ খণ্ডিত থাকে, সে নিজেকে পায় না সম্পূর্ণ করে।" কল্লোল-এর বিজয় সেনগুপ্তের রচনা সম্পর্কে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বলেছেন—"বিজয়ের গল্প বিশুদ্ধ প্রেম নিয়ে। ···· এককথায় অপ্রকট অথচ অকপট প্রেম।" কল্লোল ২ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় দীনেশরঞ্জনের "ফুলের আকাশ" রচনায় আছে প্রেমের চপল আবেগের কথা। কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৪-এ প্রকাশিত "শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রেম" প্রবন্ধে জগৎবন্ধু মিত্র বলেছেন—"প্রেম যে শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্ তা যে দেহ বা ইন্দ্রিয়ের অতীত, তার যে কোন কামনা নেই, বাসনা নেই, এ সত্যটাই যেন তার সাহিত্যের মধ্যে উপলব্ধি করি।" অর্থাৎ কামগন্ধহীন নিকষিত হেম প্রেমের কথা। এই উদাহরণগুলি থেকে একটা জিনিস কিন্তু বেরিয়ে আসে। তাহলো, বুদ্ধদেবের পূর্বোক্ত ঘোষণা সকলের প্রতি প্রযোজ্য নয়। সুনীতি দেবী, দীনেশরঞ্জন, বিজয় সেনগুপ্ত, জগৎবন্ধু মিত্র এবং প্রেমেন্দ্রের উক্তি

থেকে দেখা যায়, তাঁরা এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী। অপরপক্ষে, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য প্রভৃতিরাই ছিলেন শরীরী প্রেমের প্রধান প্রবক্তা। বুদ্ধদেবের 'রজনী হল উতলা', অচিন্ত্যের 'বেদে', শৈলজানন্দের 'মা', 'নারীমেধ', যুবনাশ্বের 'ভুখা ভগবান' ইত্যাদি গল্পে কামাতুরতার, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'কপালের লিখন' গল্পে অবদমনজনিত অসুস্থতার, 'বেদে' ও 'মা'তে কুমারী অবস্থায় জননী হওয়ার বিবরণ আছে। তবে, তারুণ্যের উচ্ছলতা ও আত্মঘোষণার মনোভাব এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছিল। 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'ঝুট', 'টান', 'ছায়াচিত্র'—এই তিন গল্পের নায়কই জীবনে নারীসান্নিধ্য চায়, কিন্তু পাছে প্রেমধারণা গতানুগতিক হয়ে যায়, তাই আপন স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রেমে বিদ্রোহ করে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তোলে। অচিন্ত্যের 'বেদে', প্রেমেন্দ্রের 'কালোমেয়ে' বা 'পঞ্চশর' গল্পে এই সুপ্রকট দ্বিধা আসলে লেখক মানসেরই দ্বিধার প্রকাশ। সেকারণেই "মিথুন প্রবৃত্তি"র এই "পৌনঃপুন্য" রবীন্দ্রনাথের কাছে অসংযমের প্রকাশ বলে মনে হয়েছিল। তিনি সঙ্গতভাবেই এতে কোনো "দুর্দাম বলিষ্ঠতার পরিচয়" পান নি।২৬ তাছাড়া আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হতে পারে। ফ্রয়েড, ইয়ুং, এলিস এরা সকলেই অবচেতনার বা যৌনতার তত্ত্ব ও তথ্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তরুণ লেখকরা ফ্রয়েড, ইয়ুং সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী হয়ে তার প্রয়োগে নামলেন না। পরবর্তীকালে জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক রচনায় যৌনতা, মানসিক জটিলতা, বিকৃতি ইত্যাদি সুস্থিরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তারাও যে এসব মনস্তাত্ত্বিক ধারণার কতদূর অধিকারী ছিলেন, তাতে সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, বরং বাংলাদেশের নারীপুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে ধারণাটা যে পালটাচ্ছিল, সেটা যেমন যেমন লেখকদের আকৃষ্ট করেছে, ঠিক তেমনি বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য পাঠ—যাতে যৌনতার প্রাধান্য—তেমনি অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে। অন্যদিকে তরুণ মনের এক বিদ্রোহাত্মক ও নূতনত্ব প্রদর্শনের ভঙ্গি এর চালিকাশক্তি হয়েছে। নইলে এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার, এলিস-এর উল্লেখ—যৌনদর্শনপ্রসঙ্গে নামাবলী মাত্র। ফলে যৌনতার উপস্থাপনা সুস্থিরতার পথ ধরল না, যৌন মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এল না (চতুর্থ দশক পর্যন্ত তো বটেই)। এ প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য একেবারে অসঙ্গত মনে হয় না—"কাম প্রবৃত্তির আলোচনায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনকার আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবু সেটা সমাজচেতনা নয়, romantic revolt মাত্র।"২৭

'কল্লোল' ১ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠের একটা বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—"নারীর মন চিরদিনই একটা সমস্যার কথা, ঐ ভেবে এবং আলোচনা করে পুরুষেরা তো দিনে দিনে প্রায় ক্ষেপে

যাবার জোগাড় হয়েছে।" এই ধরণের আরো দু-চারটি প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় নারীত্বের উদ্বোধন, তার মর্যাদার প্রকাশে এই সব তরুণ লেখকদের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। য়ুরোপের নারীমুক্তি আন্দোলন, ইবসেন, শ' প্রভৃতির রচনা, সবুজপত্রে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা কল্লোলীয়দের এ ব্যাপারে মন গঠনে সাহায্য করে থাকতে পারে। 'কল্লোল-এর একটা নিয়মিত বৈশিষ্ট্য ছিল, এ বিষয়ে বক্তব্য ও সংবাদ পরিবেশন করা। যেমন—১ম বর্ষ, ভাদ্রের আলোচনায় নারীর স্বাধীনভাবে কাজ সম্পর্কে গঠনমূলক কথাবার্তা এসেছে, কার্তিক সংখ্যায় নারীনিগ্রহের প্রতিবাদে শারীরিক ও মানসিক শক্তির যোগ্যতায় পরিচয় দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীর দাঁড়ানোর প্রত্যাশা করা হয়েছে, ১৩৩০ আষাঢ়ে মিশরের মেয়েদের নবজাগরণের কথা তুলে মন্তব্য করা হয়েছে—'মিশরের নারীও জাগিল।' উড়িষ্যাবাসী কুমারী নির্মলাবালার বিলাত যাওয়া, অক্সফোর্ডের ডিপ্লোমা পাওয়া ইত্যাদিতে প্রীত হয়ে শুভকামনা জানানো হয়েছে, শ্রাবণ ১৩৩০ সমাচারে, ইটালী অভিমুখে মিশর থেকে মহিলা ডেলিগেশন যাত্রার সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

'কল্লোল' যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মানবোধ প্রদর্শন। প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন—"মানুষের মানে চাই—গোটা মানুষের মানে/রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত—" (মানুষের মানে চাই, কালিকলম, বৈশাখ ১৩৩৩) বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—"We praised, unlike Wordsworth, what man has made of man, that is, himself, claiming that man is noble in his unremitting struggle with the brute nature within him, not because he wins, for he may not, but simply because he struggles".২৮

শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে এই 'গোটা মানুষের' কথা রাখার কিছু চেষ্টা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে রাজা, জমিদার বা উচ্চবিত্ত মানুষের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রধানতঃ মধ্যবিত্তের কিছু সমস্যা প্রতিফলিত। শাস্তি, দুর্বুদ্ধি প্রভৃতি গল্পে কৃষক মজুরের প্রবেশাধিকার ঘটলেও এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হলেও তাদের জীবনসমস্যা আসে নি। কল্লোল-পূর্ব লেখকরা মজুর, কৃষক নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখলেও (যেমন—শৈলবালা ঘোষজায়ার 'শেখ আন্দু', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'চাষার মেয়ে' ইত্যাদি) এবং গোর্কী ও হ্যামসুনের রচনা অনুবাদ ও অবলম্বনে গল্প উপন্যাস লিখলেও তাঁদের লেখায় ছিল "দরিদ্র নারায়ণী, সমাজ-সংস্কারী বা ভলান্টিয়ারী দৃষ্টি" ও "কিছু সমবেদনা, কিছু জিজ্ঞাসা।"২৯ কল্লোলের তরুণ লেখকরা স্পষ্ট ঘোষণা করেই দরিদ্র, অবজ্ঞাত শ্রেণীগুলির প্রতি সহানুভূতি

প্রদর্শনের সূত্রপাত করেছিলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর কালের মনোভাব সম্পর্কে লিখেছিলেন—"যাঁরা পতিত, পীড়িত, দরিদ্রিত, তাদেরকে বাঙময় করে তোলো, নতুনের নাম জারি কর চারিদিকে।"৩০ প্রেমেন্দ্রের গল্পে, শৈলজানন্দের গল্পে এই নতুনের নাম জারির চেষ্টা আছে। যুবনাশ্ব বিষয়সীমাকে আরো এক ধাপ অন্ধকারের দিকে প্রসারিত করেন, বুদ্ধদেবের ভাষায় বলতে গেলে "পাঁকের পোকাদের নিয়ে রসসৃষ্টির চেষ্টা বাংলা-ভাষায় এই প্রথম।"৩১ জীবনের যে দিকটা অসুন্দর, অপ্রিয় সেই দিকটার সঙ্গে পরিচয়ের এক নব আগ্রহ সূচিত হল। তাঁদের চোখে পড়লো দারিদ্র্যের নগ্ন বীভৎসতা মনের হীনতা আর উপবাসী লালসার লোলুপতা। মনে হল পতিতা-ও আর সাহিত্যের অঙ্গনে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকবে না, সে-ও মানুষের মর্যাদা পাবে। এই সূত্রে তথ্য হিসাবে একটি প্রসঙ্গ স্মরণীয়। তরুণগোষ্ঠীর একাংশ যে রুশবিপ্লব ও সাম্যবাদের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছিলেন তার কিছু প্রমাণ আছে। 'কল্লোল' পত্রিকায় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থ অনুবাদের ও গোপাললাল সান্যাল রচিত 'সমাজ-তন্ত্রবাদ' নামক পুস্তকের সমালোচনা করা হয়েছিল ও বার্ট্রান্ড রাসেলের 'বলশেভিকবাদ'-এর অনুবাদের উল্লেখ ও প্রয়াসকে প্রশংসা করা হয়েছিল। 'বাংলাদেশে শ্রমজীবীদের প্রথমতম মুখপত্র' হিসেবে 'সংহতি' পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে, তা কতখানি শ্রমজীবীদের সে কথা আপাততঃ উহ্য রাখা যেতে পারে।

এইসব বোধ ও প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে প্রশংসার যোগ্য। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের অস্বচ্ছলতা এবং বিদেশী সাহিত্য পাঠ এইসব প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করেছে বলা চলে। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে প্রথমাবধি মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আসা লেখককুলের দারিদ্র্য ও বেকারী-পীড়নের একাধিক উদাহরণ মেলে।* তবে জীবনে দারিদ্র্যভোগ করলেই দারিদ্র্য নিয়ে গল্প লেখা সম্ভব হবে এমন কোন কথা নেই। তার জন্য দরকার বাস্তবদৃষ্টিকোণ, দরিদ্রজীবনের প্রতি সহানুভূতি, সেই জীবনকে বিশ্লেষণের আলোয় দেখা, দারিদ্র্যের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করার চেষ্টা।

---

* "এমনি অর্থাভাব প্রত্যেকের পায়ে পায়ে ফিরেছে। সাপেরা নিশ্বাস ফেলেছে স্তব্ধতায়। হাঁড়ি চাপিয়ে চালের সন্ধানে বেরিয়েছে...। শৈলজা খেলার বস্তিতে থেকেছে, পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের প্রুফ দেখেছে। নৃপেন টিউশানি করেছে, বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে। আর আররা কেউ নির্বাক যুগের বায়স্কোপে টাইটেল তর্জমা করেছে, রাজা মহারাজার নামে গল্প লিখে দিয়েছে, কখনো বা হোমরা চোমরা কারুর সভাপতির অভিভাষণ।" কঃ যুঃ পৃঃ ২৫৫

কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করতে তাঁরা পারেন নি। তরুণদের মধ্যে কুলির জীবন নিয়ে অনেকে গল্প লিখেছেন (যেমন, শৈলজানন্দ, সরলকুমার অধিকারী, সুরুচিবালা চৌধুরানী, সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের কয়েকটি গল্প) শ্রমিক জীবন নিয়েও কেউ কেউ লিখেছেন (যেমন, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, তারানাথ রায়) বুদ্ধদেব এ ব্যাপারে চূড়ান্তে ব্যর্থ। (যেমন 'প্রগতি'তে প্রকাশিত 'পদ্মার ঢেউ') তরুণ অচিন্ত্যের প্রথম পর্বের রচনায় ব্যর্থতার পরিচয় থাকলেও পরবর্তীকালে দরিদ্র মুসলমান জীবনকেন্দ্রিক গল্পে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশ্বস্ত চিত্রায়ণ মেলে। কিন্তু তবুও অচিন্ত্য শেষপর্যন্ত এ জীবনের প্রতি সত্যকার দরদী ছিলেন বলা চলে না। একমাত্র শৈলজানন্দ ও যুবনাশ্বের প্রথম পর্বের লেখায় এ বিষয়ে সার্থক প্রচেষ্টার উদাহরণ মেলে। প্রেমেন্দ্রের কিছু রচনার কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত হবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁদের লেখায় 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' বিষয়ে সমালোচনা করেন তখন সাধারণভাবে কথাটা অসঙ্গত মনে হয় না। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এঁদের সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন—"আমাদের দেশে যাঁহারা কথা সাহিত্য লেখেন, তাঁহাদের দরিদ্রজীবনের অভিজ্ঞতা নাই। তাই সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁহারা দরিদ্রজীবনের করুণ, মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকিতে পারেন না।"৩২ তাছাড়া, ভদ্রসমাজের বিকৃত মূল্যবোধ আরোপিত হওয়ায় অন্ত্যজশ্রেণীর জীবনের কথা অনেক লেখা হলেও সাহিত্যে যথার্থ নবযুগের সূচনা সম্ভব হলো না। সেকারণেই নবজাগ্রত মানবতাবোধ প্রকৃত সাহিত্যরূপ পাবার পূর্বেই সমকালীন সাহিত্যিকদের অসংযমপ্রিয় কলমে তা কেবল ব্যর্থ অনুকরণের প্রেরণাই যোগান দিয়ে গেছে। ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ মাসের 'কল্লোল'-এ তাই লেখা হয়—"আজকাল সব গল্পগুলিই প্রায় একধরনের আসে। কারখানা ও খনির কুলিদের ঘটনা লইয়া গল্পলেখা এখন সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। ব্যক্তিমানুষের ব্যথা ব্যর্থতা দারিদ্র্য ও অধঃপতনকে কল্লোলীয়রা বর্ণনা করেছেন। এই দুরবস্থার জন্য পূর্ববর্তীকালের সাহিত্যিকদের অনেকের মতো ব্যক্তিকেই তার জীবনের দুরবস্থা, দারিদ্র্য ও বিপর্যয়ের জন্য দায়ী না করে, কিংবা ভাগ্যের দোহাই না পেড়ে, সরাসরি সামাজিক পরিবেশই যে এসবের নিয়ন্তা, এসব কথা তাঁরা সাহিত্যে বলার চেষ্টা করেছেন। এই সূত্রে তাঁদের কথাসাহিত্যে উল্লিখিত 'কিছু সামাজিক নিগ্রহের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—জমিদারের অত্যাচার (চোর—দীনেশচন্দ্র লোধ), শিল্পাঞ্চলে ডাক্তারের ষড়যন্ত্র (জ্বালা—সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ), চাষী বউয়ের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন (নীচের সমাজ—পঞ্চানন ঘোষাল), ভিখারী ব্যবসা (পাঁকের পোকা—সুকুমার ভাদুড়ী, পটলডাঙার পাঁচালী—যুবনাশ্ব), অপরাধী চরিত্রের ব্যক্তিকর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন (হিসাবের বাইরে—ভূপতি চৌধুরী, আর একটা পথ—

নরেন্দ্র দেব), মুসলমান কর্তৃক হিন্দু বিধবা হরণ (ব্যতিক্রম—শৈলজানন্দ), পল্লীসমাজের অত্যাচারে ঘর ভাঙা গড়া (আশ্রয়—প্রভাবতী দেবী) ইত্যাদি। এ সব প্রসঙ্গ হয়ত যথাযথ গুরুত্বসহকারে রূপায়িত হয়নি, কিন্তু সমাজমনস্কতার ব্যাপ্তির কিছুটা পরিচয় মেলে, পরবর্তী চল্লিশের দশকে যে প্রবণতার স্পষ্টতর, ব্যাপকতর ও সার্থকতর প্রকাশের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।

দরিদ্র জীবনচিন্তা ও সমাজভাবনার আলোচনা প্রসঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কে কল্লোলীয়দের মনোভাব কি ছিল তার পরিচয় বিরল। ব্যতিক্রম হিসেবে পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'ছায়াছবি', গোকুল নাগের 'পথিক', রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ঘাসফুল', প্রেমেন্দ্রের 'মিছিল'-এর উল্লেখ করা চলে মাত্র। শিবরাম চক্রবর্তী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—"সেই স্তব্ধতার দেশে (গণ সাহিত্যের) বেশীদিন না থেকে শিবরাম চলে এল, উজ্জ্বল, উচ্ছল মুখরতার দেশে।"৩৩ এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, তরুণদের কথাবার্তায় নূতনের নাম জারি করে দরিদ্র জনসাধারণের কাছে যাবার কথা থাকলেও গণ সাহিত্যকে গণ্য করা হয় স্তব্ধতার দেশ বলে, সাহিত্যকে 'জনতোষিণী' না করতে পারার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যবোধ থেকে যায়। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং দেশব্যাপী নৈরাশ্যের মধ্যে কল্লোলীয়রা সঙ্গ বা পরিপার্শ্ব অনুসারে রাজনীতি না নিয়ে নিজেদের ভাগে সাহিত্যকেই রেখেছিলেন।৩৪ এই মনোবৃত্তি থেকেই অমলেন্দু বসুকে সেকালে বলতে হয়—"সাহিত্য পলিটিকস্ এক জিনিস নয়।"৩৫ নজরুলের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ—শুধু তারুণ্যের উদ্দামতার দিক দিয়ে—সৃষ্টিসুখের উল্লাসের আবর্তে। নজরুলের রাজনৈতিক কবিতা নয়, তাঁর প্রেমমদির গীতিকবিতাই তাঁদের উল্লসিত করেছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, কল্লোলে প্রকাশিত নজরুলের অধিকাংশ

---

* দরিদ্র জীবনের পক্ষের রাজনীতির কথা কল্লোলে প্রায় প্রকাশিত না হলেও কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিনিধি বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে গেলে করদাতাদের টাকার যে সদ্ব্যয় হবে তা কল্লোল মনে করে। গোকুল নাগ একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—'খৃষ্ট দুঃখী ছিলেন না, তিনি চিরজীবন চোখের জল ফেলেছেন, নালিশ করেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, অভিমান করেছেন। গান্ধী যথার্থ দুঃখী।' (কল্লোল যুগ, পৃঃ ৭৯) কল্লোলের একটি সমাচারে বলা হয়েছে : গুজব মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর শান্তি প্রয়াসের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। 'জনরব যদি সত্যই কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে এই সম্মান পৃথিবীর আদর্শ পুরুষকেই দেওয়া হইবে।' ফাল্গুন, ১৩৩০) এই 'যথার্থ দুঃখী' ও 'পৃথিবীর আদর্শ পুরুষ' গান্ধী ছাড়াও কল্লোল-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে কয়েকটি রচনা আছে।

কবিতাতেই রাজনৈতিক বিদ্রোহের কোনো ছাপ ছিল না। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, 'সমাজতন্ত্রবাদ' গ্রন্থের সমালোচনা এবং বার্ট্রান্ড রাসেল রচিত বলশেভিকবাদের উল্লেখ বাদে 'কল্লোল' পত্রিকায় রাজনীতিপ্রসঙ্গ তেমন না থাকলেও* কালিকলমে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়মিত আলোচিত হত, লিখতেন অন্যান্যদের সঙ্গে বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ। 'সংহতি'তে—অচিন্ত্যের ভাষায় 'বাংলাদেশে শ্রমজীবীদের প্রথমতম মুখপত্র'-তে বলাবাহুল্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকত। সে রাজনৈতিক চেতনা অবশ্য শ্রমজীবীর স্বার্থ রক্ষা করেনি, রাজনৈতিক প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই যে কেউ তা বুঝতে পারবেন। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে, বড়ো অদ্ভুত কথা লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু কল্লোলের পাতায়ঃ "বলতে গেলে আমাদের দেশের প্রলেটারিয়েটের কোন সমস্যা নেই—অন্তত কোন সমস্যা তত নিদারুণ হয়ে ওঠেনি, কারণ প্রলেটারিয়েট তার পঙ্কশয্যায় বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, তার মনে নিজের অবস্থার জন্য কোন বিক্ষোভ বা ভাগ্যবিধাতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণী তার দুরবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই তার জীবন অবিচ্ছিন্ন বেদনা ও নিরাশায় মলিন।"৩৬

কল্লোলের লেখকদের বয়সোচিত চাপল্যের সঙ্গে মিলে মিশে আছে নানা খেয়ালীপনা ও নৈরাজ্যচিন্তা। চিন্তার শৃঙ্খলাহীনতা যে যথেষ্ট ছিল, 'কল্লোল'-এর নিয়মিত বিভাগ 'সমাচার' অংশটুকু দেখলেই অতি সহজে তা চোখে পড়ে। একসঙ্গে ভিক্টোরিয়ায় বা উডবার্ণ পার্কে বেড়াতে যাওয়া, মিন্টো স্কোয়ারে মালিকে চার আনা পয়সা দিয়ে নৌকা বাওয়া, স্টিমারে রাজগঞ্জে গিয়ে সেখান থেকে আন্দুল পর্যন্ত পায়ে হাঁটা প্রতিযোগিতা ইত্যাদিকে বয়সোচিত তারুণ্যের অভিব্যক্তিরূপে দেখতে অসুবিধে হয় না।৩৭ সেই সঙ্গে পরণে ঢিলেঢালা অঢেল পাঞ্জাবী, লম্বা লোটানো কোঁচা, অতৈললাঞ্ছিত চুল ফাঁপিয়ে ফাঁপিয়ে ব্যাকব্রাশ, কিংবা গায়ে হলদে পাঞ্জাবী, কাঁধে গেরুয়া উড়ুনি নিয়ে ভিড়ের মধ্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সচেতন চেষ্টাকেও মেনে নেওয়া যায়।৩৮ এর সঙ্গে সবকালের তরুণমনের একটু লোক দেখানো চাপল্যও খাপ খেয়ে যায়।† কিন্তু এরই সঙ্গে যখন জেলের প্রাচীরে উঠে নজরুলকে উপবাসবিমুখ করার পাগলামির বর্ণনা

---

*পাদটীকা পৃঃ ৪৯-এ দ্রষ্টব্য

† যেমন—কল্লোল-এ এক সংখ্যায় নজরুলের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে—"বিদ্রোহীর মতোই উৎসাহে উজ্জ্বল চোখ" কিংবা "কবি নজরুল ইসলাম তাঁর চিঠিপত্র, গল্প, কবিতা, সব লাল কালিতে লেখেন। এখন বুকের রক্ত দিয়ে আলতা-স্মৃতি লিখছেন।" শৈলজানন্দ সম্পর্কে—"লেখকদের মত হাবভাব নয়, হাসতে ইচ্ছা করলে হাসেন, না ইচ্ছে করলে হাসেন না।···মুখ দেখলে বোঝা যায় না ভিতরে এত আগুন।" ইত্যাদি।

সাড়ম্বরে মেলে, মোহনবাগানকে ঘিরে খেলার মাঠে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীকত্ব উপলব্ধি ও উচ্ছ্বাসের পাতার পর পাতা বর্ণনা মেলে, তখন সেগুলো অপরিণতি ও বিভ্রান্তির স্থায়ী প্রমাণ হয়ে দেখা দেয়। দেশের আবেগ যখন উচ্ছ্বসিত বন্দেমাতরমে তখন কল্লোল গায় 'দে গরুর গা ধুইয়ে' অথবা 'কালি কুল দাও মা নুন দিয়ে খাই।''৩৯ এই খামখেয়ালির 'এলোমেলোমি'র বশবর্তী হয়েই অন্নদাশঙ্কর কল্লোলের দু-একজন লেখককে প্যারিসে বছর দুই-এক পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এবং কল্লোলের অফিস কলকাতা থেকে প্যারিসে তুলে আনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এতে সন্দেহ থাকে না।৪০

সাহিত্যনীতি

প্রবাস থেকে অন্নদাশংকর অচিন্ত্যের কাছে একটি মূল্যবান প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন—''আমাদের সাহিত্যিকদের ম্যানিফেস্টো কই?'৪১ কথাটা ভাববার মতো। আমাদের দেশে সাহিত্যজগতে গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন, ম্যানিফেস্টো প্রকাশ, সুকুমার শিল্পের অন্যান্য শাখায় তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, পারস্পরিক প্রভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এসব নিয়ে চিন্তা, আলোচনা ও সক্রিয়তার কোনো ঐতিহ্য নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেও কোন ভূমিকা বা সম্পাদকীয় নেই। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে 'আভ্যুদয়িক সংঘ' নামে একটি সাহিত্য-গোষ্ঠী স্থাপনের কথা আছে।৪২ 'সেই গল্প কবিতা পড়া, সেই পরস্পরের পিঠ চুলকানো।' তারপর কল্লোল, কালিকলম, বারবেলা ক্লাব, বন্ধু চতুষ্টয়ের আড্ডার বর্ণনাতেও কোনো সাহিত্যিক ম্যানিফেস্টোর কথা নেই, ৪৩ সাহিত্য-আদর্শের জন্য লড়াইয়ের কথা অজস্রবার উচ্চারিত কিন্তু সেই আদর্শগত বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনায় নিস্পৃহতা খুব বেশী চোখে পড়ে যায়। 'কল্লোল অফিসে একবার একটি বলবান সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরীর 'গম্ভীর সভার' উল্লেখ অচিন্ত্যবাবু দিয়েছেন, কিন্তু এই গোষ্ঠী স্থাপন কোন উদ্দেশ্যে, কি তার আদর্শ, তা আদৌ স্থাপন হয়েছিল কিনা, এসব কৌতূহল তিনি ঐতিহাসিকের দায়িত্ব নিয়ে মেটানোর কথা আদৌ ভাবেন নি।৪৪ ঢাকা ও অন্যান্য সহরে নাকি 'কল্লোল ক্লাব' গঠিত হয়। কিন্তু 'কল্লোল' ও তরুণদের অন্যান্য পত্রিকার পাতায় এ নিয়ে আলোচনা বিরল। একটি সংখ্যায় নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল—''প্রত্যেক পত্রিকারই একটা করে বিশেষত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। কল্লোলের একটা বিশিষ্টতা আছে, তা অনেককে আনন্দ দিয়েছে এবং সেই আনন্দ হতেই আরও দুই একখানা মাসিক পত্রিকা কল্লোলেরই ধারাকে লক্ষ্য করে বের হয়েছে। .. কল্লোল যে তার আদর্শ দিয়ে বাংলার বক্ষে সৃষ্টির উল্লাস জাগ্রত করতে পেরেছে, এ তার সৌভাগ্যেরই কথা, তার সার্থকতার চিহ্ন।৪৫ কিন্তু শুধু অনেককে 'আনন্দ'

বিতরণের ঘোষণা সাহিত্যআদর্শের অস্বচ্ছতার দিকটাই পরিষ্কার করে দেয়।

রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি জীবনকে মালিন্যমুক্ত করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সুরুচি ও সৌন্দর্যে জীবন শ্রীময় হয়ে উঠুক। রবীন্দ্রবিরোধিতার কথা যতই বলা হোক, কল্লোলকালীন লেখকদের মধ্যেও এই সৌন্দর্যের জন্য এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, জীবনের অসুন্দর ও অপ্রিয় দিকটার রূপায়ণের প্রসঙ্গে তাদের নামটা তা সে যতই জড়িয়ে যাক। বুদ্ধদেবের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি এখানে আমরা আবার স্মরণ করছি—অতি আধুনিক লেখকরা "হৃদয়বৃত্তির সৌন্দর্য ও মহিমাকেও যথেষ্ট সম্মান সহকারে স্থান দিয়েছেন।"৪৬ অচিন্ত্য গোকুল নাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রসঙ্গত বলেছেন—"এমন কিছু নেই যার সৌরভ অল্পযায়ী বা অল্পজীবী নয়? যা শুকায় না, বাসি হয় না? আছে নিশ্চয়ই আছে। তার নাম শিল্প, তার নাম সাহিত্য। চলো আমরা সেই সৌরভের সওদা করি।"৪৭ কল্লোলের দীনেশরঞ্জন 'নিজে আর্টিস্ট ছিলেন, তাই একটি পরিচ্ছন্ন শালীনতা তাঁর চরিত্রে ও ব্যবহারে মিশে ছিল।' তিনি বলতেন—"মৃত্যুর পরে কোনো সহজসুন্দর পরলোক চাই না, এই জীবনকে নব নব সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় অর্থ দেব, মূল্য দেব নব নব পরীক্ষায়।"৪৮ জীবনে সৌন্দর্যের প্রতি এই তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এসেছিল সঙ্গ বা পরিপার্শ্ব অনুসারে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই মতবাদের প্রতি আগ্রহ। এর মূল কথা, সাহিত্যের আনন্দ জীবনসমস্যার দিকে উদাসীন থেকে হবে আলাদা একটা কিছু। এই মতবাদের সঙ্গে আর একটি তত্ত্ব সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়। সেটা হোল, অভিনব গুপ্তের রসতত্ত্ব, অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' নামক গ্রন্থের মাধ্যমে যাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করেন। এর ব্যাপক প্রেরণা অবশ্য আসে 'সবুজপত্র' মারফৎ প্রমথ চৌধুরীর রচনা মাধ্যমে। এই দুই তত্ত্বের মূল কথাটা হোল, শিল্প বা সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আনন্দ দান। নীতি, উপদেশ, আদর্শ বা বক্তব্যের কথা প্রাধান্য পেলে শিল্পের শিল্পত্ব যায় নষ্ট হয়ে। এতে তাই সমাজের বাস্তবস্বরূপকে চিনিয়ে দেওয়া, তাকে ব্যাপক জনসাধারণের কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকাটা অনভিপ্রেত; তাতে শিল্প যায় মলিন হয়ে। ভারতী, সবুজপত্র থেকে কল্লোলের কালে যে সব সাহিত্য-রচনা হয় তার মধ্যে লেখার বক্তব্য অপেক্ষা কিভাবে লেখা হবে সেটার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। এ থেকেও শিল্পের জন্য শিল্প মতের প্রভাবটা বোঝা যায়। কল্লোলের লেখকরা যে এই মতের পরিপোষক ছিলেন তার কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করা যাক। আমরা পূর্বেই একটি উদ্ধৃতি মারফৎ দেখেছি, 'কল্লোল' যে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পেরেছে, সৃষ্টির উল্লাস জাগাতে পেরেছে, এই পরিতৃপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। কল্লোল, শ্রাবণ ১৩৩০-এ বলা

হয়েছিল—"আর জীবনের সেই অবস্থায় আমাদের এই অত্যন্ত স্পষ্ট জীবনকে একপাশে সরিয়ে রেখে তারই ওপারে কি আছে তাই দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়ি। আমাদের চেষ্টাই হচ্ছে এই স্পষ্টকে ছাড়িয়ে অস্পষ্টকে দেখা।" এই রোমান্টিক প্রচেষ্টা উক্ত মতেরই পৃষ্ঠপোষক। এই প্রেরণা থেকেই সম্ভবতঃ অচিন্ত্য হ্যামসুনের 'প্যান' অনুবাদ করতে উৎসাহিত হন। কল্লোল ৫ম বর্ষ বৈশাখে 'মীনকেতন' নামে এই উপন্যাস যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয় তখন অচিন্ত্য ভূমিকায় লিখেছিলেন—'হ্যামসুন-এর মধ্যে যে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতা রয়েছে, যে উচ্ছ্বসিত কল্পনা ও কবিতার প্রাচুর্য হয়েছে ও সমস্ত বস্তু জগতের উর্ধ্বে ধ্যানলোকের পানে যে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—তা Pan এর প্রতি পাতায় জাজ্জ্বল্যমান হয়ে আছে দেখতে পাই।' অর্থাৎ, 'উচ্ছ্বসিত কল্পনা'র তৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে চান সমস্ত বস্তুজগতের উর্ধ্বে ধ্যানলোকের দিকে যাত্রায়। 'কালি-কলম'এর মুরলীধর বসু অবশ্য বলতেন—'জীবন নিয়েই সাহিত্য—সমগ্র, অখণ্ড জীবন। তাকে বাদ দিয়ে জীবনবাদী হই কি করে ?৪৯ কিন্তু কল্লোলের পুরোধা পুরুষ অচিন্ত্য বলতেন—'সাহিত্যই মুখ্য আর সব গৌণ। সাহিত্যই জীবনের নিশ্বাসবায়ু।৫০ তিনি চেয়েছেন 'অনন্যচেতা হয়ে বদ্ধ পদ্মাসনে শুধু সাহিত্যেরই ধ্যান করব।' এই ছিল এককালে 'দারিদ্র্যপীড়িত' লেখকের প্রার্থনা।৫১ অচিন্ত্য বলেছেন—'মহৎ শিল্পীর কাছে সমাজের চেয়েও জীবনই বেশী অর্থান্বিত—অর্থাৎ সমাজ-ব্যতিরিক্ত জীবন পিপাসার কথা। এ কারণেই হয়ত, 'কি লিখেছে তার চেয়ে কে লিখেছে সেইটেই গণনীয়' হয়ে দেখা দেয়।৫২

স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী কল্লোল, চৈত্র ১৩৩৪ সংখ্যায় 'আমি কেন নীরব' প্রবন্ধে এই মতের উৎসাহী সমর্থন জানিয়েছেন এই বলে ঃ "কবির সামাজিক মতামতের সঙ্গে তাঁর কবিত্ব-শক্তির কোনই সম্বন্ধ নেই কাব্যে মতামতের মূল্য অতি সামান্য...কাব্য হচ্ছে সকল ism এর অতিরিক্ত art হচ্ছে beyond good and evil"। 'প্রগতি' পত্রিকাতে এই মতের প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে ঃ "যাকে আমরা খাঁটি সাহিত্য বলি, তার কোনো মার্কা নেই।... সাহিত্যিক ও রসসন্ধানীদের কাছে এসব প্রভেদের কোন মূল্য নেই।" প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, 'প্রগতি' পত্রিকা লিখেছিলেন—'সাধারণ সমাজ এখনও যেরূপ অশিক্ষিত ও বর্বর, তাই প্রকৃত রসসাহিত্যের সমাদর না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) অতি আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আছে তার উত্তরে যে সব কথা বলার আছে তা 'অবিশ্যি জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া সহজ নয়।' (আষাঢ়, ১৩৩৫) এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে শিল্পীর মুক্তিকামনা করে বলা হয়েছে—"সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা' যত প্রয়োজন, তেমন বুঝি আর

কোথাও নয়। এই স্বাধীনতার জন্যই এই বিদ্রোহ" দাবী করে বলা হয়েছে—"সাহিত্য-স্রষ্টা নিরঙ্কুশ বলে তাঁকে হুকুম দেবার লোক কেউ নেই। তাকে যেমনভাবে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে দিতে হবে।" অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাপারটা নির্ভর করবে পুরোপুরি লেখকের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর। এই চিন্তার ওপর ডি, এইচ, লরেন্স-এর 'আর্ট ফর মাই সেক' তত্ত্বের প্রভাব আছে বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন।৫৩ আমাদের দেশে এই চিন্তা অবশ্য এসেছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার প্রাথমিক স্ফুরণ হিসাবে। 'প্রগতি' পত্রিকায় ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় বলা হয়েছিল—"এই সাহিত্য বিদ্রোহের সাহিত্য। এর পরিপোষকরা সমাজের চেয়ে ব্যক্তিকে বড় বলে বিশ্বাস করেন⋯ব্যক্তির মুক্তির এই প্রচেষ্টাকে আমরা গ্রহণ করেছি তাই আমাদের মুখপত্রের নাম 'প্রগতি'।" এই পত্রিকায় আর এক জায়গায় বলা হচ্ছে—"মানুষের নর্ম্মভূমি এই পৃথিবীটা বড় হলেও আমাদের মনটা আরও বড়' এবং এই জন্যেই আজকের কবি নিজেকে সব কিছুর মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে ফেলতে চায় না—সব কিছুকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে সংহত করতে চায়।" কবিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি থেকেও একথা সুপ্রমাণিত হয়—"কল্লোল যুগের যে সব কবিতায় বাংলা সাহিত্যের হাওয়া বদলের খবর পাই, তাদের যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষ্য ছিল যে মুক্তি, তা ব্যক্তির, সমষ্টির নয়।"৫৪ আমাদের দেশে মিশ্র সমাজব্যবস্থার ও অন্যান্য কারণে এইভাবে কল্লোলীয়দের মধ্যে শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্ব, 'আর্ট ফর মাই সেক' এর আদর্শ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রসার-ইচ্ছার সঙ্গে জীবন থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি মিলেমিশে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের এ দেশে এসব মতবাদ গ্রাহকদের মধ্যেও সুশৃঙ্খল আলোচনার, বোঝাপড়ার বিশেষ অভাব চোখে পড়ে। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির দাবীর পরিবেশে সাহিত্যে-ও মুক্তির এলোমেলো দাবী হাস্যকর কিনা বিবেচ্য

এই প্রসঙ্গেই কল্লোল যুগের লেখকদের মানসিকতার ও তাঁদের রচনার বাস্তববোধ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করলাম, কল্লোল যুগের অন্যতম মনোভঙ্গি—শিল্পের জন্য শিল্প এই মতাদর্শকে কেন্দ্র করে গঠিত। এই আদর্শ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনকে বেশী মাত্রায় রোমান্টিক (গোর্কীকথিত সক্রিয় রোমান্টি-সিজম নয়) করে তোলে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত-ও এ কথা স্বীকার করে লিখেছেন—"কল্লোলের সে যুগটাই সাহসের যুগ, যে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।"৫৫ এ কারণেই কল্লোলের যেসব লেখক জীবনের বাস্তবতাকে সাহিত্যের বিষয় করতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁরা বাস্তব জগৎকে পরিপূর্ণ স্বীকারও করেন নি, অস্বীকারও করেন নি, বাস্তবকে অনুসন্ধানের, উপলব্ধির পথে আন্তরিক ও পরিশ্রমী হতে পারেন নি। অন্যদিকে

রোমান্টিক মনোবৃত্তির প্রভাবে সেকালের সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল—যাযাবর কল্পনা। এর মূল কথাটা এই—জীবনের প্রচল পথে টাকা পয়সা সংসারের মধ্যে জীবনের অর্থ-অন্বেষণ করাটা অর্থহীন। বরং দেশে দেশে বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা অর্জনই কাঙ্ক্ষণীয়। অচিন্ত্যের 'বেদে', 'বিবাহের চেয়ে বড়', প্রবোধ সান্যালের 'যাযাবর', 'প্রিয় বান্ধবী' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং সেকালের অনেক গল্পে এই মনোবৃত্তিসম্পন্ন চরিত্রের উদাহরণ মিলবে। হ্যামসুনের প্রতি কল্লোলের কারও কারও আগ্রহের পিছনেও এই মনোভঙ্গির প্রেরণা আছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অপরপক্ষে, একালের বাস্তববাদীরা সবাই বাস্তবকে অসহিষ্ণুতা, বিতৃষ্ণা ও অসহায়তার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। বিশুদ্ধ রোমান্টিকবাদীরা বাস্তবকে অস্বীকার করে এক আপাতসুন্দর জীবনচিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তার মধ্যে নিজেদের মানসিক যন্ত্রণা ও অপরিতৃপ্তিকে প্রকাশ না করে পারেন নি। অন্যদিকে, বাস্তববাদীরা সমকালীন বাস্তবজীবনের কদর্যতার অংশটুকু বেছে বেছে রূপায়িত করে মনের ক্ষোভ মেটাতে চেয়েছেন। আগের যুগের বাস্তববাদের সঙ্গে এই বাস্তববাদের পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, তবে মিলও আছে। যৌন আবেগমূলক রচনার দিক থেকে 'ভারতী'গোষ্ঠীর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতির, তেমনি অন্ত্যজ জীবন রূপায়ণেও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা একালে প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। আর, কল্লোল ও ভারতী দুই গোষ্ঠীতেই ছিল "কাহিনী, চরিত্র পরিকল্পনা ও পরিবেশ রচনায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও লঘু রোমান্টিকতার মিশ্রণ।"৫৬ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তফাৎটা কিন্তু যতটা পরিমাণগত, ততটা গুণগত নয়। তবু বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আর নৈতিক শোভনতা বা সাহিত্যের পূর্ব সংস্কারের খাতিরে বাস্তবের প্রচ্ছন্ন চিত্র উপস্থিত করতে রাজী নয়। লেখকদের একাংশ বাস্তব জীবনের অনেক নির্মোককে বিসর্জন দিতে চাইলেন। কিন্তু রোমান্টিক মন এ কাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার অন্তরায়। ফলে, ত্রুটি থেকে গেল। কোনো গোষ্ঠীই শিল্পকে আদর্শবাদ ও ঔচিত্যবাদের সঙ্গে মেলাতে পারলেন না এবং পাঠককে সমাজসচেতন করে তুলে সমস্যার গ্রন্থিমোচনে তাকে সমাজ সংস্কার কিংবা সমাজ বিপ্লবে-উদ্যোগী করতে পারলেন না।

বুদ্ধদেব বসু দাবী করেছেন—"সব ফেনিলতা নিয়ে কল্লোল পত্রিকারও মূলমন্ত্র ছিলো 'বাস্তবতা' তার তরুণ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে আপত্তি করেছিলো—তাঁরা বাস্তববাদী বলে নন, যথেষ্ট বাস্তববাদী নন বলে। তত্রাচ, সেই উত্তেজনার অধ্যায়েও কল্লোল গোষ্ঠীর প্রত্যেক রচনাই বাস্তব শিল্পের অবিকল উদাহরণ হয় নি—কেননা কোনো লেখক বা গোষ্ঠীর ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কখনই সম্পূর্ণ মেলে না—আর

মেলে না বলেই বাঁচোয়া ।"৫৭ কিন্তু বাস্তববাদ—তার স্বরূপ কল্লোল অনুধাবন করতে পারে নি, বাস্তব জীবনকে মহৎ বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের মতো ব্যবহার করতে পারে নি। বিখ্যাত সমালোচক জি, লুকাচ করেছেন—"In the works of a great realist everything is linked up with everything else. Each phenomenon shows the polyphony of many components, the interwinement of the individual and social, of the physical and the psychical, of private interest and public affairs "৫৮

কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কল্লোলের সমাজচিত্রণে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের এই সার্থক অন্বয় সূচিত হয় নি। কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সমাজ কাঠামোর বাস্তব-সম্মত বিশ্লেষণ ও তার থেকে শিক্ষালাভের দুরূহ সাধনার পথ তাঁরা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা যতটা অনুভূতিপ্রবণ, ততটা বিচারশীল নন। ফলে অচিরেই বাস্তবতাসৃজনের ঘোষণা থেমে গেল। আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি যে পরবর্তীকালে এই সব তরুণ সাহিত্যিক আর জনজীবনের ব্যাপক আশাআকাঙ্ক্ষার শরিক হতে পারছেন না, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবার মানসিক সামর্থ্য তাঁরা নানা প্রলোভনে হারিয়ে ফেলছেন। এটা দুঃখজনক ঘটনা সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন বোধকরি অভ্রান্ত—"বাংলা, সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয় নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না—সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্যসৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালিকলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না। সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়, বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ। প্রেমেনবাবুর ছোট একখানি চিঠিতে (যাতে বলা হয়েছিল—জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কীর পাঠশালায় গিয়ে থাকি···ইত্যাদি।—বর্তমান লেখক) সাহিত্যে নতুন বিদ্রোহের স্বরূপ যেন ধরা দিয়েছে, বেশী দূর হাতড়াতে হয় না।···মনে আছে, 'মাদার' পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে ?"৫৯ সত্যিই ভাবলে অবাক লাগে, কল্লোল কালিকলম প্রগতি ধূপছায়া উত্তরা এমন কি শনিবারের চিঠি পর্যন্ত কারুরই চিন্তায় আসে নি—হ্যামসুন আর গোর্কিকে মেলানো যায় না।

।। খ ।।

কল্লোলের প্রাণোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছিল শুধু ভাবের জগতে নয়, ভাষার ব্যবহারেও। পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের প্রচলিত ভঙ্গি ও আঙ্গিককে তাঁরা সচেতনভাবেই বদলাতে চাইলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কন্ঠে তার প্রতিধ্বনি মেলে—"কি লিখবে শুধু নয়, কেমন করে লিখবে, গঠনে কি সৌষ্ঠব দেবে সে সম্বন্ধেও সচেতন হও।"৬০ দেখা যায় বারংবার তাঁরা ভাষাকে পরিশীলিত, শাণিত করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষাচর্চার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ তাঁদের সামনে যে বিরাট প্রেরণাস্থল হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁদের লেখনভঙ্গির মধ্যেও এমন কিছু সাড়া জাগানো, স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপার ছিল, যার ফলে কল্লোলীয় লেখকদের রচনা সম্পর্কে নবীন ও প্রবীণ অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন—কেউ প্রশংসার মারফৎ স্বীকৃতিতে, কেউ নিন্দার মারফৎ বিরুদ্ধতায়। বুদ্ধদেব বসু সেকালে নিজেদের ভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষে যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য—"এঁদের লেখনভঙ্গী আর যাই হোক খুব জোরালো। অল্প কথায় মনের মধ্যে একটা গাঢ় impression করবার ক্ষমতা এঁদের আছে। প্রত্যেকটি কথা সোজা তীরের মত মনের মধ্যে বসে যায়। প্রাদেশিকতা ও বাঙালীরা কেবল মুখেই বলে থাকে এমন সব কথা ও idiom সাহিত্যে টেনে না তুললে তাঁদের style এত সহজ ও শক্তিমান হয়ে উঠতে পারত না নিশ্চয়ই।"৬১ 'প্রগতি'তে বলা হয়েছিল—"আধুনিকরাও সাধারণতঃ সেই ভাষাতেই লিখে থাকেন—তবে তাদের রচনায় কতকগুলো বিশেষত্ব চোখে পড়ে, (ক) কাটা ছাঁটা ছোট ছোট বাক্য* (খ) নানারূপ প্রাদেশিকতার প্রচলন* (গ) কর্তা কখনো বাক্যের শেষে চলে আসে ও ক্রিয়া আগে ইত্যাদি* (উদাহরণগুলি প্রবন্ধকার কর্তৃক সংযোজিত)।" প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পের প্রশংসা করার কালে এই রচনাতেই বলা হয়েছিল—'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে redundance বা অতিশয়োক্তি দোষ অত্যন্ত বেশী প্রেমেন্দ্রবাবু ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল—ইংরেজীতে যাকে বলে compact style বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস।' তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে ভিন্ন স্বাদের বলা হলেও অতিশয়োক্তি দুষ্ট বলাটা সঙ্গত মনে হয় না।

---

* (ক) 'এমনি, মাছ এসেছে বেচতে। বাঁশপাতা আর গাং খয়রা। নাও কিছু ছল চাতুরী করে। (সারেঙ : অচিন্ত্য সেনগুপ্ত)

* (খ) 'নইলে চঞ্চুর মত স্যায়না ঘাগী।' (মৃত্যুঞ্জয় : যুবনাশ্ব) ও কারিন্ তুহিন্ কানা? (অর্থ :—তুই কোথায় থাকিস রে?) (বনবিহগী : শৈলজানন্দ)

* (গ) 'তারপরেও কাঁপলো অনেকক্ষণ সেই প্রিয়তম শরীর।' (এমিলিয়ার প্রেম : বুদ্ধদেব বসু)

তরুণ লেখকদের শব্দচয়নে ও রচনারীতিতে সচেতনভাবে বিদেশী ভঙ্গি ব্যবহারের (চেতনাপ্রবাহ ইত্যাদি) প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে, তির্যক ভাষা, বৈদেশিক উল্লেখ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ, শ্লেষের প্রাচুর্যও দেখা যায়।* (ঘ) নূতন শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহার আসে অজস্র * (ঙ) বানানেও নূতনত্বের স্পর্শ পড়ে। গল্প উপন্যাসে ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের ব্যবহার ব্যাপক হয়—যেমন—রাম বললে>রাম বলে। ই, ঈ এবং ণত্ব ষত্বের কড়াকড়ি শিথিল হয়। বিদেশী বানানে বৈচিত্র্যের চেষ্টা আসে। যেমন—স্টাইল, স্টোভ, চেহ্‌হব। আসে ফুটকী কন্টকিত লেখা। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যতই বিরোধিতা ঘোষণা করা হোক না কেন অনেকক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ে প্রকরণে। যেমন, তরুণদের একশ্রেণীর গদ্যে 'লিপিকা'র প্রভাব—কল্লোল-এ প্রকাশিত 'ফুলের আকাশ' (দীনেশ-রঞ্জন), 'মন্দিরে' (সুনীতি দেবী), ইত্যাদিতে। গল্পের প্যাটার্নের দিক থেকে গতানুগতিক আঙ্গিকের সঙ্গে সঙ্গে নানা বৈচিত্র্যও এসেছে অস্বীকার করা চলে না। যেমন—ঘটনা-বিহীন গল্প : বন্ধন (শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), রোদ (বুদ্ধদেব বসু), ডায়েরী ধর্মী : প্রথম ও শেষ (বুদ্ধদেব), প্রতিবিম্ব (শৈলজানন্দ), নাট্যধর্মী : সত্য (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়), কেয়ার কাঁটা (অচিন্ত্য), পটলডাঙার পাঁচালী (যুবনাশ্ব), পত্রধর্মী : একখানি চিঠি (প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী) ইত্যাদি।

কল্লোল ও বিদেশী সাহিত্য

কল্লোলীয় লেখকদের সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের কথাটা প্রায়শঃ উঠে পড়ে। ব্যাপক বিদেশী সাহিত্য পাঠ অবশ্য বাংলা দেশে নূতন কোনো ঘটনা নয়। সাধনা, বঙ্গদর্শন, গৃহস্থ, ভারতী, সবুজপত্রের পথ বেয়েই নিয়মিত বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়ন, বুদ্ধির চর্চা, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছেন তরুণ লেখকরা, যাদের অনেকেই ছিলেন কৃতি ছাত্র-ও। তৃতীয় দশকের বাংলা সাহিত্যে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হল, তাতে পক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় সকল সমালোচকই বিদেশী সাহিত্যের প্রেরণা অনুভব করেছেন। 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বলা হয়েছিল—"পাশ্চাত্ত্য আর্ট ও সাহিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা না জন্মাতে

* (ঘ) "Honesty আমার মনে হলো best policy হলোই বা—তার চেয়েও বড়ো কার্যসিদ্ধি। The end will justify the means. ফাঁকি দিয়ে রমাকে বিয়ে করা যায় না—ঠকিয়ে।' (অভিনয় নয় : বুদ্ধদেব বসু)

* (ঙ) নূতন শব্দ—বাঁশবুকো, গেঁজে, ঝুপড়িপানা, শাঙা, বোঙা, চাণক। বাক্য, বাক্যাংশের নূতনত্ব—অশ্রু এবার মৌটুসকি, করুণা ও কুশল জিজ্ঞাসায় টইটুম্বুর, শাসন-ত্রাসন, পথিকপ্রশ্ন।

পারলে আমাদের সাহিত্যের কখনও পূর্ণ বিকাশ হতে পারবে না।"৬২ অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণা যে একটা জরুরী ব্যাপার এটা তাঁরা বুঝেছিলেন। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যবাবু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বিদেশী সাহিত্য তৃষ্ণার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। দারিদ্র্যতাড়িত অথচ আদর্শবাদী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'রুশ সাহিত্য মশগুল, প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে।...কে যেন ডস্টয়ভস্কির কোন উপন্যাসের চরিত্রের নাম ভুল করেছে, নৃপেন তা সবিনয়ে সংশোধন করলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করলে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিস্তৃতি।"৬৩ ওই গ্রন্থে এরকম আরো দু-চারটি প্রসঙ্গ আছে। যেমন, সুদূর বাঙলার এই সব নবীন লেখকরা বিশ্বের দরবারে কীর্তিমান সাহিত্যিকদের 'মিত্রতা' দাবী করে বসলেন। ঠিক কি প্রত্যাশা ছিল স্পষ্ট বলা না থাকলেও পাশ্চাত্য লেখকদের তরফের মুদ্রিত চিঠিগুলি থেকে অনুমান করা চলে ছবি বা লেখা শুভেচ্ছা চাওয়া হয়েছিল বা তাঁদের তরফে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল।৬৪ একমাত্র রোমা রোলাঁর সঙ্গে যোগা-যোগটাই কাজের হয়েছিল বোঝা যায়। কালিদাস নাগ রোলাঁর জাঁ-ক্রিস্তফ্ অনুবাদ করেন ও 'কল্লোল' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। অচিন্ত্যের ভাষায়, "কালিদাসবাবুই রলাঁর আত্মিক দীপ্তির প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় নিয়ে এলেন কল্লোলে।" দীনেশরঞ্জনের গল্পের বই 'মাটির নেশা' রোলাঁর বোন তাঁর সীমিত বাংলা জ্ঞানের সাহায্যে পড়েছিলেন একথা জানা যাচ্ছে তাঁর চিঠি থেকে। রোলাঁ তরুণ সাহিত্যিকদের কাছে দুটি প্রস্তাব করেছিলেন—(ক) সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিদেশে প্রচারের চেষ্টা, (খ) ভারতবর্ষের মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের জীবনী রচনার দায়িত্ব নেওয়া। (প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রোলাঁ নিজেও এই কার্যে ব্রতী হন—বীটোভেন, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, টলস্টয় প্রভৃতির জীবনীগ্রন্থ এ প্রেরণা থেকেই রচিত।) এই দুই প্রস্তাব তরুণ লেখকদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাঁরা আদৌ এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কি না জানা যায় না। আর যাঁরা মামুলি চিঠি বা আত্মপ্রতিকৃতি পাঠালেন তাঁরা হলেন—জাসিন্তো বেনাভাঁতে, এম, এম, ব্রিজেস, এইচ, জি, ওয়েলস, যোয়ান বোয়ার আর ন্যুট হ্যামসুনের স্ত্রী। ইয়োন নোগুচি পাঠিয়েছিলেন I followed the twilight নামে একটি কবিতা। তরুণ লেখকরা দেশীয় সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধির তাগিদে এবং উজ্জ্বলতর প্রেরণার সন্ধানে (ক) নানা লেখকের গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা, রচনা প্রভৃতি অনুবাদে প্রবৃত্ত হন; (খ) পাশ্চাত্য লেখকদের রচনা অবলম্বনে বাংলা রচমা শুরু করেন; (গ) পাশ্চাত্য লেখক-দের ওপর আলোচনা শুরু করেন। তরুণদের পত্রিকায় জোলা, তুর্গেনিভ, বেনাভাঁতে, রোলাঁ, কোলোমান মিক্সজাথ, মাসুচ্চিয়ো অফ সালের্নো, প্রেভো, হ্যামসুন, হুইটম্যান, গোর্কি, মোপাসাঁ, জিদ, লুই কুপেরাস, প্রভৃতি ফরাসী, হাঙ্গেরীয়, ইতালীয়, রুশ,

আমেরিকান লেখকদের গল্প উপন্যাস অনুবাদ করা হয় কিংবা সেই গল্প অবলম্বনে বাংলায় গল্প লেখা হয়। প্রবন্ধ যা পাওয়া যায় তাঁর কয়েকটি হল—দান্তে, আর্নল্ড বেনেট গেটে, রোলাঁ, বেনেভাঁতে, আনুনৎসিয়া, ল্যাগারলফ, হ্যামসুন, নোগুচি, আনদ্রিভ, ডস্টয়ভস্কি, গোর্কি, এইচ. জি. ওয়েলস প্রভৃতি লেখকদের রচনার সাধারণ আলোচনা। বলশেভিক সাহিত্যের ওপর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রগতি'র পাতায়। এই সূত্রে 'কল্লোল' বৈশাখ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী' এবং 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৩২-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'বর্তমান রুশ সাহিত্য' প্রবন্ধ দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কল্লোলের ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় বিদেশী রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হওয়াতে গল্প চুরি বন্ধ হবে বলে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। অনুমান হয়, বিদেশী গল্পের ভাব চুরি করে গল্প লেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

তরুণ লেখকদের এই বিদেশী সাহিত্যের প্রতি মনোযোগ তাৎপর্য পূর্ণ। অনুবাদ বা পরিচিতি রচনার ক্ষেত্রে তরুণরা কোনো নির্দিষ্ট নীতির দ্বারা চালিত হতেন কিনা, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেখক-পরিচিতি ধরনের প্রবন্ধগুলিতে আলোচ্য লেখকদের রচনায় কেন বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙালী পাঠকের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, এমন কোনো প্রসঙ্গ দেখা যায় না। এইসব থেকে মনে হয় নির্বিশেষ 'মহৎ' সাহিত্যের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করা এবং বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করাই ছিল তরুণদের একমাত্র লক্ষ্য। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—"আধুনিকদের রচনাভঙ্গির জন্য continental লেখকদের প্রভাব, বিশেষ করে হ্যামসুন ও গোর্কির প্রভাব দায়ী।"৬৫ তরুণ প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অমলেন্দু বসুর রচনা থেকেও জানা যায় তাঁরা গোর্কি ও হ্যামসুনের রচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। হ্যামসুন প্রসঙ্গে বলা হয়—"শিল্পী জীবনের দারিদ্র্য, নেতিমূলক রোমান্টিক যৌনবিদ্রোহ ও বোহেমিয়ানি খামখেয়ালে—তিনি ইবসেন-বিয়র্নসনের সমাজমুখী ধারা থেকে সরে এসেছেন বরং সেখানে তিনি নীট্‌শে পন্থী।"৬৬ এই পরিচয় থেকে তরুণ লেখকদের একাংশ যাঁরা ভবঘুরে জীবনাদর্শের ভক্ত, তাঁদের হ্যামসুনপ্রীতির কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। এইজ. জি. ওয়েলস-এর সাহিত্যের প্রতি আগ্রহটাও সহজবোধ্য। ভিক্টোরীয় রুচির প্রতিবাদ, বিশেষতঃ নরনারীর যৌনজীবনের খোলাখুলি প্রকাশ ওয়েলস-এর সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু গোর্কি প্রীতি অনেকটাই দারিদ্র্যপ্রীতির থেকেই এসেছে। গোর্কির সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যাদর্শ যদি তাঁদের যথার্থই আকৃষ্ট করতো তাহলে, তাঁর ন্যুট হ্যামসনের ওপর একটি অখ্যাত প্রবন্ধের অনুবাদ ও দু-একটি পরিচিত না লিখে তরুণরা তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে গুরুত্ব সহকারে

বিবেচনা করতেন। তবে, বোয়ার, হুইটম্যান, গোর্কী প্রভৃতির রচনাপাঠে তরুণদের কারো কারো রচনায় (যেমন—প্রেমেন্দ্র মিত্র) সাধারণভাবে কিছুটা মানবতাবোধ জাগ্রত হচ্ছিল একথা অস্বীকার চলে না।

যাই হোক, এই ব্যাপক বিদেশী সাহিত্য চর্চা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কল্লোল, শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় বলা হয়েছিল—"আজকাল বিদেশীয় সাহিত্য হইতে যে অবাধ-অনুবাদপ্রথা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে অনেক বাঙালী চিন্তান্বিত হইয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের কাছে তরুণদের বিরুদ্ধে সজনীকান্তের অভিযোগমূলক পত্রে বিদেশী সাহিত্য পাঠই যে সাহিত্যে দুর্নীতি প্রবেশের তা বলা কারণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যধর্ম' 'সাহিত্যে নবত্ব' ও 'সাহিত্যরূপ' নামক প্রবন্ধে তরুণ সাহিত্যের বে-আব্রুতা, 'লালসার অসংযম', ও 'দারিদ্র্যের আস্ফালন'কে বিদেশী সাহিত্য পাঠেরই ফল বলে মনে করেছিলেন।

তরুণ সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া

এখন কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি কাগজের লেখকদের লেখা নিয়ে সেকালে বাংলা সাহিত্যে যে আলোড়ন উঠেছিল তার কিছুটা পরিচয় নেওয়া যাক। ১৯২৩-এ 'কল্লোল' কাগজের জন্ম, সুতরাং 'অতি আধুনিক সাহিত্য' আন্দোলনের সূচনা এ সময় থেকেই ধরা যেতে পারে। অচিন্ত্যকুমারের সাক্ষ্য অনুসারে আধুনিকতার প্রথম প্রকাশ্য অভিনন্দন 'উত্তরা' পত্রিকা মারফৎ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের রচনায়।৬৭ তিনি তরুণ লেখকদের ভাবের নবীনতাকেই শুধু নয়, ভাষার সজীবতাকেও প্রশংসা করেন। এতে এইসব তরুণ লেখকরা বিশেষভাবে উৎসাহিতবোধ করতে থাকেন। তরুণ সাহিত্যিকদের রচনায় আবিলতা যে ছিল, তা তাঁরা নিজেরাও অস্বীকার করেন না, তাঁদের কাগজগুলোতেই সে সবের সমালোচনা হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু তাঁরা তাঁদের দৃষ্টির আবিলতা কাটিয়ে আরো উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনা শুরু করতে পারলেন না। "কল্লোল তখনও উদগ্র হইয়া উঠে নাই, ১৩৩২ সালের শেষ পর্যন্ত তাহার কলধ্বনিই কানে বাজিতেছিল। ...নূতন বৎসরের গোড়া হইতে 'জলকল্লোল' হঠাৎ যৌন-কল্লোল হইবার সাধনায় মাতিল।"৬৮ ফলে শনিবার চিঠি (১ম প্রকাশ, ২৬শে জুলাই, ১৯২৪) বিরুদ্ধতায় নামল। "সজনীকান্ত লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, ধূপছায়া ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পকবিতা দাগাতে বসে গেলেন—উদ্দেশ্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা, নাটক, 'মনিমুক্তা' ও 'সংবাদ সাহিত্যে'র জন্য খোরাক সংগ্রহ করা। তিনিও শনিবারের চিঠিতে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন অশ্লীলতা ও যৌনতত্ত্ব, দুর্নীতি ও পারিবারিক সম্পর্কের অসম্মান, ফর্ম ও স্টাইলের বিশৃঙ্খলা নিয়ে।"৬৯ এর উল্টো ফল হল। রবীন্দ্রনাথ

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে সত্যি কথাই লিখেছিলেন—"আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপরপক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে।"৭০ অপরপক্ষে, অভিযুক্ত তরুণরা প্রবলভাবে ঘোষণা করতে শুরু করলেন, রবীন্দ্রযুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন নূতন যুগের সূত্রপাত। অন্যদিকে প্রতিপক্ষরা বললেন—অতি আধুনিক সাহিত্য অশ্লীল, অপাঠ্য। তাঁদের মতে, তরুণ লেখকদের মানসিক অসুস্থতা থেকে এই সাহিত্যের উৎপত্তি, প্রেরণা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, যৌনবিজ্ঞান ও পাশ্চাত্যের যৌনমূলক সাহিত্য। আর যাঁরা মধ্যপন্থী তাঁরা বললেন, অতি আধুনিকদের কেউ কেউ শক্তিমান ঠিকই, তবে তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু বিদেশের সাহিত্য থেকে গৃহীত। তাঁরা যে সমস্যার কথা বলতে চান সেসব সমস্যা আমাদের সমাজ ও পরিবার জীবনে এখনও সমস্যারূপে দেখা দেয় নি। রবীন্দ্রনাথ অতি আধুনিকদের সম্পর্কে মধ্যপন্থী ছিলেন। তরুণ সাহিত্যিকদের যাঁদের রচনায় কিছু ক্ষমতায় পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন। যেমন—বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নানাসময়ে প্রশংসিত হয়েছেন। ১৩৩৪ শ্রাবণ 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' এবং ভাদ্রে—'সাহিত্যে নবত্ব'। প্রথম প্রবন্ধে সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিদেশের আমদানী বে-আব্রুতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি।" 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে নবীন লেখকদের বলিষ্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহসিক অধ্যবসায়ের প্রশংসা করে বঙ্গ সাহিত্যের এই সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগকে নিষ্কুণ্ঠ অভিনন্দন জানান। কিন্তু বাস্তবতা রূপায়ণের নামে 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম' প্রকাশকে সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ নিয়ে সাহিত্যিক মহলে বিস্তর বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। রবীন্দ্র-বিরোধিতায় অগ্রণী হন অ-তরুণ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলে এই অতি ও অনতি আধুনিক সাহিত্যের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দেবার প্রস্তাব দিয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি বলেন—"সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাংলাদেশে যে এক ধরণের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানতঃ কল্লোল ও কালিকলম নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরনের লেখা সংক্রামিত হচ্ছে।...লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে।" প্রস্তাবটা হাস্যকর, কেননা সাহিত্যের দ্বন্দ্ব বোধহয় এভাবে মেটানো যায় না। তবে পারস্পরিক আলোচনায় সাহিত্যের মূল সত্য থেকে সরে যাওয়া হচ্ছে কি না সেটা

স্পষ্ট হওয়ার সুযোগ নিশ্চয়ই ছিল। যা হোক, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাজী না হলেও পরে মধ্যস্থতা করতে রাজী হলেন। তাঁর জোড়াসাঁকোয় বাড়ীতে বিচিত্রা ভবনে সভা ডাকা হোলো ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪। প্রথমদিন শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, দ্বিতীয়দিন আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল—(ক) "কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকম কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, একথা মানতে পারব না। ...খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন; সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালই।" (খ) "বিষয় প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হলে বলতেই হবে, এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।" "কিন্তু এই সভা আহ্বান দ্বারা যে কোনো পক্ষের কোনো উপকার সাধিত হইয়াছিল তাহা কেহ মনে করেন নাই।"৭১

এইসব তরুণ লেখকদের কিছু রচনা নিয়ে সোরগোল ছড়িয়ে গিয়েছিল সাহিত্যের অঙ্গন থেকে আদালতের প্রাঙ্গনে। কাশীর মহেন্দ্র রায় তরুণ সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে 'কালিকলমে' প্রবন্ধ লেখেন, যার জবাব দেন সত্যসন্ধ সিংহ অর্থাৎ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঘটনাচক্রে 'কালিকলমে'-এ প্রকাশিত সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিত্রবহা' এবং নিরুপম গুপ্ত অর্থাৎ অশ্লীলতা বিরোধী এই মহেন্দ্র রায়ের গল্প 'শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে' অশ্লীল বলে আদালতে অভিযুক্ত হয়। এই মামলা উপলক্ষে 'আত্মশক্তি' ও 'নবশক্তি' পত্রিকায় শচীন সেনগুপ্ত আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। কল্লোল-এ এ বিষয়ে লেখেন কৃত্তিবাস ভদ্র অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্র। এতে তরুণ সাহিত্যে অশ্লীলতা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে উত্থিত অভিযোগগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা হয়। শরৎচন্দ্র এই প্রসঙ্গে মুন্সিগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে যা বলেন তার মূল কথা ছিল, বিরুদ্ধ সমালোচনাই নবীন সাহিত্যিকের জীবনে অনিবার্য। দুর্নীতির অভিযোগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সাহিত্য নিয়ে। আধুনিক সাহিত্যে আছে একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা। তাঁরা দেখিয়েছেন—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়। দ্বিতীয়তঃ নবীন সাহিত্য রাজারাজড়ার জীবনে পরিতৃপ্ত না হয়ে আরো নীচের স্তরে গেছে। এটা আপশোষের নয়, গৌরবের। এই বাদপ্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ছাড়াও প্রমথ চৌধুরী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতিরাও যোগদান ক'রে এই নতুন যুগের সাহিত্য ও সাহিত্যিক দলকে যথোচিত গুরুত্ব দান করেছিলেন। 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৩৫ সালের কয়েক সংখ্যায় এর কিছু নমুনা পাওয়া যাবে।

কল্লোল যুগের পরিণতি

কল্লোল যুগের এই বিদ্রোহী লেখকদের সাহিত্যজীবন কোন্ পথে মোড় নিয়েছে, স্বভাবতঃই সে প্রশ্ন আগ্রহ থেকে যায়। অচিন্ত্য বলেছিলেন—"কল্লোল চিরযুবা। চিরযুবা বলেই চিরজীবী।"৭২ কিন্তু 'কল্লোল' চিরজীবী হয় নি, চলেছিল মাত্র সাত বৎসর। কালিকলম, প্রগতি-ও স্বল্পায়ু। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'কল্লোল' পত্রিকা উঠে যাওয়ার কারণ তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন নি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—"কল্লোল তো শেষের দিকে সুর বেশ খাদে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিল জনরঞ্জনের প্রলোভনে।"৭৩ 'প্রগতি' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৫ সংখ্যায় শ্রীঅমুকচন্দ্র তমুক 'বাজে কথা' শীর্ষক আলোচনা মারফৎ এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। লেখকের মতে, এই সময় দীনেশরঞ্জন, অচিন্ত্য, যুবনাশ্ব প্রভৃতির প্রভাব থেকে 'কল্লোল' কাগজকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। দীনেশরঞ্জন কল্লোলকে ঠাকুরবাড়ী, শনিবারের চিঠি ইত্যাদির সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধনে নিয়ে আসতে চান বলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। লেখকের মতে, দীনেশবাবু কল্লোলের আন্দোলনের অস্তিত্ব মানেন না এবং 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'র নাম একসঙ্গে উচ্চারণে বেদনাবোধ করেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার আছে। কল্লোল, শনিবারের চিঠিতে যতই বিরোধ থাক মূলতঃ তারা একই সাহিত্য আদর্শের উনিশ বিশ মাত্র। কল্লোল আর সাপ্তাহিক শনিবারের চিঠিতে মূলতঃ বিরোধ ছিল না। শনিবারের চিঠির হেডপীস কল্লোলের দীনেশরঞ্জনের কর্তৃক অঙ্কিত। পূর্বোক্ত 'ফোর আর্টস্ ক্লাব'—যার থেকে কল্লোলের আত্মপ্রকাশ—তার সদস্য উভয়পক্ষেই ছিলেন। প্রধানতঃ ১৩৩৩-৩৪ থেকেই বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। সে যাই হোক, এই কল্লোলের কলধ্বনির অন্তিম পর্যায় সম্পর্কে সজনীকান্ত অত্যন্ত সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন—"১৩৩৬ বঙ্গাব্দেই তথাকথিত 'অতি আধুনিক' সাহিত্যিকদের প্রধান প্রধান আশ্রয়গুলির অধিকাংশই কাহিল হইতে হইতে একে একে মরিয়া গেল। কলিকাতায় 'কল্লোল' স্তব্ধ হইল, 'কালিকলমে'র কালি ফুরাইল, সদ্যজাত 'ধূপছায়া' অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, ঢাকায় 'প্রগতি' গতিহীন হইল, 'বীণা'র তার ছিঁড়িয়া গেল। 'হসন্তিকা'র বুড়া তরুণদের দন্তবিকাশও মাত্র চার সংখ্যায় নিঃশেষ হইল, দৈনিক ফরোয়ার্ড আশ্রিত 'আত্মশক্তি' ভোল পাল্টাইল।" অর্থাৎ লিটল্ ম্যাগাজিনের জগতে দেখা দিয়েছিল এক বিষম নৈরাশ্যের অন্ধকার। তিনি আরও লিখেছেন—"১৩৩৫র শেষে অচিন্ত্যকুমার 'বিচিত্রা'য় চাকুরী লইলেন—আসলে প্রুফ দেখার কাজ, নামে সাব এডিটর। স্বয়ং দীনেশরঞ্জন দাশ চলচ্চিত্রের কারখানাতে দৃশ্যসজ্জার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। ...প্রেমেন্দ্র 'দৈনিক বাংলার কথা'র নিশিসম্পাদকের দলে ভর্তি হইয়াছিলেন...কিছুকাল

এদিক ওদিক ভ্রাম্যমান শৈলজানন্দ শেষপর্যন্ত বিপরীতের আকর্ষণে আমাদের সমীপবর্তী (প্রবাসীতে প্রুফরীডার) হইলেন। পরে আসিলেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।"৭৪

বুঝতে অসুবিধা হয় না, দেশে এক তরঙ্গবিক্ষুব্ধ পটভূমিকা বর্তমান থাকলেও বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে এইসব লেখকদের যোগ ছিল না বলেই তাঁদের পত্রিকাগুলির ও আন্দোলনের অকালমৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। সর্বোপরি অর্থাভাব ও আদর্শহীনতা। জীবনকে সমগ্রতায় দেখার দৃষ্টিকোণ তাঁদের কারুরই ছিল না। ফলে, বিদ্রোহের সঙ্গত কারণ এবং উপযুক্ত পটভূমি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কোনো সুস্থ প্রগতিধর্মী জীবনবোধকে গ্রহণ করতে পারেন নি, সেজন্য সাহিত্যে অনেক উপকরণ এলেও, নূতন নূতন অনেক গল্পের ছাঁচ এলেও আন্দোলনের প্রাণসত্তাকে টিঁকিয়ে রাখা যায় নি। কলাকৈবল্যবাদীর নেতি থেকে যে বিদ্রোহের জন্ম তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। ফলে, প্রথম যৌবনের ফেনিল রোমান্টিসিজমের তীক্ষ্ণতা ও সজীবতা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায়। গোকুল নাগের মৃত্যুতে রোমা রোলাঁ যে বেদনা প্রকাশ করেছিলেন তা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বোধে মনে পড়ে—"মনে হয় তোমাদের বঙ্গভূমি নিষ্করুণভাবে উদাসীন এবং অপব্যয়ে অপরিমিত। মুকুলেই সব ঝরিয়া যায়, ফলের পরিণতি ত দূরের কথা।"৭৫

'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকার 'যুগ'-সৃষ্টির দাবীতে অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন। সে আপত্তি যে যুক্তিবর্জিত একথা বলা শক্ত। আমাদের মনে হয় এইসব পত্রিকাকে একত্রে বলা যেতে পারে একটা প্ল্যাটফর্ম মাত্র যেখানে অনেক মত ও রুচির সমাবেশ হয়েছিল। কল্লোলের পাতাতেই তো বলা হয়েছে—"কল্লোল বাংলার সকল লেখকলেখিকা ও পাঠকপাঠিকার নিজস্ব পত্রিকা। এর রক্ষণ ও সমৃদ্ধি বর্ধন করবার ভার সকলের ওপর।" লিখতে পারলে, সকল লেখকের প্রবেশাধিকারের কথা অচিন্ত্যবাবুর গ্রন্থেও আছে। অন্যদের কথা থাক, কল্লোল পত্রিকার সাক্ষ্যকেই এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যাক, যা মর্মান্তিক সন্দেহ নেই—"কল্লোল নূতন কিছু দেবে বলে, নবযুগের কোনও সাধনাকে পরিস্ফুট করে তুলবে, এমন কোনও দুরাশা সে রাখে না। তার প্রথম হতেই সে সকলকে সাদরে গ্রহণ করেছে, বাংলার সকল লেখকলেখিকার অন্তরের ধ্বনিকে সে পরম সমাদরে তার বক্ষে ধারণ করে চলেছে। সে বড়র কাছেও কল্লোল, ছোটর কাছেও কল্লোল। তার ভিতর দিয়ে আজ যে সকল লেখকলেখিকা বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে যশলাভ করেছেন তাঁদের কাছে কল্লোলের কোনও দাবী দাওয়া নাই, যাঁরা আজও কল্লোলের ভেতর দিয়ে আপনার মনের চিন্তাকে উৎকর্ষতার দিকে অগ্রসর করতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের খ্যাতি বা উন্নতির জন্যও কল্লোল কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। এ একটা প্রবাহের বিচিত্র গতি সে কল্লোল নাম নিয়ে চলুক, আর যে নামেই চলুক, সে চিরন্তন কোনও কালে তার শেষ

নাই, অন্ত নাই।" ভাবতে অবাক লাগে, কিভাবে এই সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, কিন্তু আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই যখন শুনি, "যদি কেউ ভুল করে ভেবে থাকেন, কল্লোলের কোনও বিশেষ 'মিশন' আছে, তাহলে তাকে বলতে হয়, কল্লোলকে তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেন নি।' ৭৬ এই বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হলে বিদ্রোহের সমগ্র দাবীটাই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়।

তাহলে কল্লোলের এই কোলাহলের সার্থকতা কোনখানে? সাম্প্রতিক কালের তিনজন সমালোচক একই রায় দিয়েছেন। সরোজ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—"কল্লোল অত্যন্ত স্পষ্ট করে একটা কাজ করে গিয়েছিল। সেটা এই যে যুগমানসকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিতালী করতে নিষেধ করা। চিন্তার ও ভাবনার এবং তৎসহ প্রকাশের ক, খ, গ পাল্টে ফেলার দিকে কল্লোল একটা বড় উদ্দীপক হিসাবে দেখা দিল।"৭৭ অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন—"এ কালের লেখকরা যতখানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ততখানি পরিণত ফসল উপহার না দিলেও তারা বাংলা সাহিত্যে যে প্রবল গতিবেগ দান করেছিলেন সেজন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকব।" ৭৮ আমরাও এ বিষয়ে একমত। বুদ্ধদেব বসু দাবী করে পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—"Kallol though its peak point extended over no more than three years, justified in making a greater noise than any periodical after Sabujpatra," ৭৯এ দাবী অনস্বীকার্য।

---

(১) Studies in European Realism : George Lukacs, Pg. 11-12. (২) Twentieth Century English Literature, Pg. 1. (৩) কল্লোল যুগ, (আষাঢ় ১৩৫৮ সং) পৃঃ ৮০ (৪) Twentieth Century English Literature, Pg. 2, 5. (৫) কল্লোল যুগ, পৃঃ ৮১ (৬) অতি আধুনিক বাংলাসাহিত্য, কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩৪ (৭) কল্লোল, আষাঢ় ১৩৩৪ (৮) কল্লোল যুগ, পৃঃ ১০৮ (৯) ঐ, পৃঃ ৩০ (১০) ঐ, পৃঃ ৬৭ (১১) ঐ, পৃঃ ৮২ (১২) ঐ, পৃঃ ৮৪ (১৩) ঐ, পৃঃ ২৪৮ (১৪) ঐ, পৃঃ ৪৪ (১৫) ঐ, পৃঃ ২৪৫ (১৬) ঐ, পৃঃ ২৪৬ (১৭) আত্মস্মৃতি (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৫৯ (১৮) কল্লোল, আষাঢ় ১৩৩৪ (১৯) ক, ভাদ্র ১৩৩৪ (২০) কল্লোল যুগ, পৃঃ ৭৭ (২১) ঐ, পৃঃ ২৫৭ (২২) ঐ, পৃঃ ১১২ (২৩) অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কল্লোল, চৈত্র ১৩৩৩ (২৪) বুদ্ধদেব বসুর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

(২৫) A Dictionary of Philosophy—Ed. by M. Rosenthal and P. Yudin Pg. 169. (২৬) কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩৬-এ প্রকাশিত পত্র (২৭) আমরা ও তাহারা, পৃঃ ১৪৪ (২৮) An acre of Green Grass, Pg. 72 (২৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ) : সুকুমার সেন, পৃঃ ২৫৩ (৩০) কল্লোল যুগ, পৃঃ ২৫৭ (৩১) বাংলা কবিতা (বিশেষ যুবনাশ্ব সংখ্যা), সং শান্তিলাহিড়ী, বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ (৩২) বাঙ্গালার কথার আভিজাত্য, বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩২ (৩৩) কল্লোল যুগ, পৃঃ ১২৭ (৩৪) ঐ, পৃঃ ১০৮ (৩৫) কল্লোল, আষাঢ় ১৩৩৪ (৩৬) কল্লোল, চৈত্র ১৩৩৪ (৩৭) কল্লোল যুগ পৃঃ ১৭ (৩৮) ঐ, পৃঃ ৭০ (৩৯) ঐ, পৃঃ ৬৭ (৪০) ঐ, পৃঃ ২৭৭ (৪১) ঐ, পৃঃ ২৭৫ (৪২) ঐ, পৃঃ ১৭ (৪৩) ঐ, পৃঃ ৩০১ (৪৪) ঐ, পৃঃ ২৫২ (৪৫) কল্লোল, চৈত্র ১৩৩৩ (৪৬) ঐ, অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, চৈত্র ১৩৩৪ (৪৭) কল্লোল যুগ, পৃঃ ৫৮ (৪৮) ঐ, পৃঃ ৬৩ (৪৯) ঐ, পৃঃ ২৬৪ (৫০) ঐ, পৃঃ ২৯২ (৫১) ঐ, পৃঃ ২৫২ (৫২) ঐ, পৃঃ ২৭৮ (৫৩) বাংলা উপন্যাসের ধারা—অচ্যুত গোস্বামী, পৃঃ ২৩৫ (৫৪) কালের পুতুল, পৃঃ ৯৬ (৫৫) কল্লোল যুগ, পৃঃ ২৩৮ (৫৬ দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য—ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, পৃঃ ১১৮ (৫৭) স্বদেশ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ১৮৫ (৫৮) Studies in European Realism, Pg. 145. (৫৯) লেখকের কথা, পৃঃ ২৭-২৯ (৬০) কল্লোল যুগ, পৃঃ ২৫৭ (৬১) অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কল্লোল, চৈত্র, ১৩৩৪ (৬২) প্রগতি, আষাঢ় ১৩৩৪ (৬৩) কল্লোল যুগ, পৃঃ ৩৫ (৬৪) ঐ, পৃঃ ২৩৯ (৬৫) প্রগতি, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (৬৬) উপন্যাসের কথা—দেবীপদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৪৮ (৬৭) কল্লোল যুগ, পৃঃ ১৩৩ (৬৮) আত্মস্মৃতি (১ম)—সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২২৯ (৬৯) কল্লোলের কাল—ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃঃ ৪৫ (৭০) কল্লোল যুগ—পৃঃ ২৫৮ (৭১) রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড)—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩৩ (৭২) কল্লোল যুগ, পৃঃ ২৮৭ (৭৩) ঐ, পৃঃ ২১৫ (৭৪) আত্মস্মৃতি (২য় খণ্ড)—পৃঃ ৮৫, ৯২ (৭৫) কল্লোল, পৌষ ১৩৩২, (৭৬) ঐ, ফাল্গুন ১৩৩২ (৭৭) নূতন সাহিত্য, মাঘ ১৩৫৯ (৭৮) বাংলা উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ২৫০ (৭৯) An acre of Green Grass, Pg. 70.

তৃতীয় অধ্যায়ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প

।। ক ।।

কল্লোলগোষ্ঠীতে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মতো আর কোনো লেখক সাহিত্যরচনার পথে এত পালাবদল করেন নি। বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়ো, প্রাচীর ও প্রান্তর-এর লেখক যে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ, সারদা, বিজয়কৃষ্ণ যীশু-জীবনীর মাহাত্ম্যকীর্তনে তন্ময় হবেন, একথা কেউই ভাবতে পারেন নি।

পরিবারসূত্রে অচিন্ত্যবাবু আইনজীবী এবং মূলত নাগরিক মননের অধিকারী। অতি তারুণ্যে ফাউনটেন পেন কেনবার পয়সা নেই লিখলেও বন্ধুদের মধ্যে তাঁর অবস্থা ছিল তুলনায় ভাল।১ প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর স্কুলের বন্ধু। দুজনেরই সাহিত্যরচনার সূত্রপাত স্কুলে। আরো জানা যায়, 'নন কো-অপারেশনের বান ডাকা দিন' গুলোতে প্রেমেন্দ্রের মতো প্রিয়বন্ধু ভেসে গেলেও অচিন্ত্যবাবু কলেজ আঁকড়ে পড়ে থাকেন।২ অর্থাৎ, এক অর্থে, কল্লোলের রাজনীতিবিমুখ প্রবক্তাদের যোগ্য হয়ে উঠছিলেন অচিন্ত্য-কুমার।

অতি তরুণ বয়সে 'মৌচাক' পত্রিকায় অচিন্ত্যবাবুরা চারবন্ধু মিলে 'চতুষ্কোণ' নামে একটি উপন্যাস আরম্ভ করলেও তা শেষ হয় নি। পরে, প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে একত্রে লেখেন— 'বাঁকালেখা'। অচিন্ত্যের ভাষায়—"জীবনের লেখা যে লেখে সে সোজা লিখতে শেখেনি এ ছিল সেই বইয়ের মূলকথা।"৩ আরো জানা যায়, স্বনামে ব্যর্থ হয়ে নীহারিকা দেবী ছদ্মনামে কবিতা লিখে 'প্রবাসী'তে কবিতা ছাপান। 'অনেক ঠোকাঠুকির পর 'প্রবাসী'তে ঢুকে পড়লাম স্বনামে, 'ভারতী'-ও অনেক বাধাবারণের দরজা খুলে দিল।"৪ এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, অচিন্ত্যবাবু প্রথমাবধি সাহিত্যে যশ অর্জনের জন্য একান্ত উন্মুখ (যা অবশ্য, তরুণ লেখকের কাছে অসঙ্গত নয়) এবং নূতন যুগের এই আভ্যুদায়িক পুরাতনপন্থী কাগজের স্বীকৃতি পাবার জন্য ব্যাকুল। সে যাই হোক, বিদ্রোহের তূর্য নিনাদ কিন্তু অল্প ছিল না। কল্লোল, ১৩৩৬ কার্তিক সংখ্যার 'আবিষ্কার' কবিতায় অচিন্ত্যবাবু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লিখেছিলেন যে, তাঁরা চোখ থেকে যে 'তীব্র তীক্ষ্ণ আলো' জ্বালবেন, তাতে 'যুগসূর্য' রবীন্দ্রনাথ ম্লান হয়ে যাবেন কিন্তু, কল্লোলের তারুণ্যে কোলাহল যতই থাক, তাতে রবীন্দ্র বিরোধিতার সামর্থ্য ছিল স্বল্প। অচিন্ত্যবাবুর রচনার ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য।

প্রথমে, তাঁর কল্লোল-কালীন লেখার আলোচনা করা যাক। মনে রাখতে হবে, 'কল্লোল' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ) 'গুমোট' গল্প নিয়ে

তাঁর আবির্ভাব হয়। ভাঙা ধ্বসে পড়া এক বাড়ীতে গরীব পরিবারের দাম্পত্য কলহ গল্পটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। তুলনীয় প্রেমেন্দ্রের প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী'-ও গরীব কেরানীর জীবন নিয়ে গল্প। ১৩৩২ বৈশাখে প্রকাশিত হয় 'কেয়ার কাঁটা'। গভীর-রাতে লুট হয়ে যাওয়ায় পুতুলকে তার পিতা সমাজচ্যুত করে। মেয়েটি বেশ্যাজীবন গ্রহণে বাধ্য হয়। লালসাগ্রস্ত পিতা একদিন আকস্মিকভাবে তার ঘরে এসে মেয়েকে চিনতে পেরে পালায়, মেয়ে কাঁদতে থাকে। বেশ্যার প্রতি সহানুভূতি ও সামাজিক অত্যাচারের সচেতনতা নিশ্চয়ই আধুনিক সাহিত্যের নূতনত্ব, যার সূচনা অন্তত শরৎচন্দ্র থেকে, প্রসার ভারতীগোষ্ঠীর লেখকদের হাতে। বেশ্যার ঘরের বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে, যেমন,—দেবদেবীর ছবি, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, আধুনিক নবরামশীলের উপন্যাস ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর বেশ্যাকেন্দ্রিক গল্পের অস্বাভাবিকতার সঙ্গে বেশ মিল আছে। 'বেদে' উপন্যাস নামে প্রকাশিত হলেও এর বিভিন্ন অধ্যায় পৃথক গল্পের স্বাদ-বাহী। তাছাড়া, প্রথম অধ্যায়টি কল্লোল-এ প্রকাশের সময় গল্পরূপে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম রচনাটির নাম 'আহলাদী'। নয় বছরের কাঞ্চন তার থেকে ছোট বেশ্যার মেয়ে আহলাদী ও নটরুর ভালবাসার গল্প। অনাথ আশ্রমে কাঞ্চন আহলাদীর প্রতি সহানুভূতি দেখানোয় সে বুকে কাঞ্চনের মুখ চেপে ধরে, গালে ঠোঁটে এগারোটা চুমু খায়। এই নিয়ে নটরুর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। একদিন নটরু ও আহলাদীকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে মাষ্টার তাকে তাড়িয়ে দেয়, ও আহলাদীকে নিয়ে ট্রেনে চাপে। তিনবছর পর আহলাদী ফিরে এসে একটি মরা মেয়ের জন্ম দিলে কাঞ্চন কেন আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বোঝা যায় না। অনাথ-আশ্রমের পটভূমি নির্মাণে ডিকেন্সের রচনার ক্ষীণপ্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, তবে ডিকেন্সে যৌনতার হাস্যকর আতিশয্য নেই। নায়ক-পরিকল্পনায় বিদেশী সাহিত্যের ভবঘুরে চরিত্র ও মনোবৃত্তির প্রভাব স্পষ্ট। নয় দশ বছরের ছেলেমেয়ের কামজপ্রেম বর্ণনায় এবং মাষ্টার (আশ্রম কর্তা), আহলাদীর মা ও আহলাদীর কাম সম্পর্ক বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, লেখক এ ব্যাপারে দুর্বল। অচিন্ত্যের রচনায়, 'মিথুন প্রবৃত্তির' 'পৌনঃ পুন্য' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ মিথ্যা বলা চলে না। ঘুরে ফিরে কেবলই এই বিষয়টি রচনার মধ্যে এনে অচিন্ত্যবাবু 'দুর্বলতাজনিত প্রমত্ততার' প্রমাণ দিয়েছেন সন্দেহ নেই। সমরেশ বসুর কাছে 'বেদে'র তাৎপর্য ধরা পড়েছে এভাবেঃ "আশ্রয় নেই, নিরাপত্তা নেই, জীবনের কোথাও। বেদেটা জীবন দেখছে। বেদেটা নিষ্ঠুর, নির্মম, সংসারের যাবৎ বিষও পান করেছে।......জন্মগত কিংবা পেশায় নয়, আমাকে বেদে করেছে এই শাসন, এই সমাজ। .....বেদে তাই এই শতকের ত্রিশ-দশকের মূর্তিমান বিদ্রোহ।"৫ কিন্তু বেদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও নিরাশ্রয়ের

এই বোধ নেই। বেদের নায়কের ব্যক্তি ও সমাজকে শাসনের কোনো যোগ্যতা নেই, সে অধিকারও সে বিন্দুমাত্র অর্জন করে নি। অতএব তার মধ্যে 'মূর্তিমান বিদ্রোহ' সন্ধান নেহাৎই আরোপিত ব্যাপার। প্রথম রচনায় যেটুকু সঙ্গতি ছিল, 'আসমানি'তে তা-ও নেই। গল্পের পটভূমি এখানে বদলে হয়েছে মুসলমান জীবন, তাতে লেখকের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যপিয়াসী মনের পরিচয় মেলে। কিন্তু, বুদ্ধদেবের গল্পের মতো অচিন্ত্যের নায়ক পরিকল্পনার (প্রথম দিকের) দুর্বলতা হল, তারা অনেকক্ষেত্রেই লেখক (নিতান্ত সৌখীন), আর মায়িকারা প্রায়ই লুকিয়ে পড়াশুনা করে। আলোচ্য গল্পে, কাঞ্চন মুন্সী নাপিতের বাড়ীতে গিয়ে 'মকবুল' নাম নেয়। খদ্দেরের কাছে জনপ্রিয়তা নিয়ে নায়কের সঙ্গে আর এক কর্মী আজিজের বিরোধ, দোকান ত্যাগ, প্যাটরা আনতে গিয়ে আমিনাকে বই পড়তে দেখা (বর্ণিত গরীব অবস্থার মুসলমান মেয়ের রাতদিন বইয়ে ডুবে থাকা অবাস্তব) নিয়ে গল্পের একপর্ব শেষ। তারপর কাঞ্চন গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের কপালে ফোঁটা কাটতে গেলে কাম জাগে। এদিকে মজুর ছপ্পুর বৌ এর ঘরে রাত পাহারায় গেলে পাড়ার লুব্ধ পুরুষেরা তাকে প্রহার করে। গল্পের তৃতীয় পর্বে কাঞ্চন বড়োলোকের বাড়ীর চাকর। এ বাড়ীতেও মেয়ে আসমানিকে নিয়ে প্রাইভেট টিউটর টিমুদার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব। আসিমানি আর টিমুর বিয়ের সময় আসমানি কাঞ্চনকে একটা সোনার হার প্রেমবশত দেয়। পনের টাকায় নায়ক সে হার বিক্রী করে। এক দাদাবাবু ওকে হোস্টেলে রাখে (কাঞ্চনের রুম মেট যে, তার বাবা নাকি ভিক্ষে করে)। সে বি. এ. পাশ করে। কিন্তু চাকরী না পেয়ে গ্রামের পথ ধরে। পুরো গল্পটাই অদ্ভুত ছকে ফেলা এবং অসঙ্গত ও অবাস্তবতায় পরিপূর্ণ। দুর্বলের হাতে হ্যামসুন ও গোর্কীকে মেলাতে চাওয়ার হাস্যকর প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই। লেখক নায়ককে অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে ঘোরাতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন? এক একটি অভিজ্ঞতা তাকে উপলব্ধির কোন সোপানে পৌঁছে দিল, লেখক সেকথা আমাদের জানান নি। নায়ক কাঞ্চন—তার জীবনের অতীত নেই, বর্তমান লক্ষ্যহীন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই যাযাবর-মনোভাব সেকালে অনেক লেখকের রচনাতেই প্রকটিত। এই প্রভাব নির্ণয় করতে গিয়ে বহু সমালোচকই নুট হ্যামসুনের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৩৩৪ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যা থেকেই হ্যামসুনের 'প্যান' উপন্যাসটি অচিন্ত্যবাবু কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'মীনকেতন' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'প্যান' রচিত হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। এর নায়ক লেফটেনান্ট গ্লান্ (Glahn)-এর মতোই কাঞ্চন অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে ঘুরেছে। তবে হ্যামসুনের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য অচিন্ত্যের ছিল না। হ্যামসুনের নায়কের যাযাবরত্ব যেখানে অভিজ্ঞতার গভীরতায়

সঙ্গতিপূর্ণ, অচিন্ত্যের নায়কের যাযাবরত্ব সেখানে অনেকটাই প্রদর্শনমূলক ও সঙ্গতিহীন। হ্যামসুনের নায়ক সম্পর্কে বলা হয়, "our hero is nervous and irritable, but also generous, and his temperament is humble and arrogant at once." এবং "He feels sorry for mankind, but is too proud to show it. Nearly always he is in love with a proud and unapproachable but nevertheless devoted woman. He scorns city life and civilization."৬

অচিন্ত্যের কাঞ্চনের মধ্যে এর ক্ষীণ প্রতিধ্বনিই লক্ষ্য করা যাবে।

আশ্বিন ১৩৩৪ 'প্রগতি'তে প্রকাশিত হয়—'বিবাহের চেয়ে বড়ো' নামক ছোট গল্প। তবে, এখানে বিবাহের চেয়ে বড়ো প্রেমের মূল সামাজিক কাঠামোয় প্রোথিত নয়। এমন প্রেমের গল্প বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল-ও অনেক লিখেছেন। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের কেরানী প্রভাত তার নিজের বিয়ে উপলক্ষে দিদিকে আনতে যাবার পথে ট্রেনে অশ্রু নামক একটি মেয়েকে দেখে আকৃষ্ট হয়। শেষপর্যন্ত, আবেগের তীব্র তাড়নায় প্রভাত দিদিকে মিথ্যে কথা ব'লে অশ্রুদের সঙ্গে ফিরতে থাকে। অশ্রু চরিত্রটির অসংযমী আচরণ, লেখকের আরোপিত। অন্তত তখনও আমাদের সমাজে তরুণীরা আলাপের তৃতীয় দিনেই 'জ্বর হয়নি ত' ব'লে কপালে হাত রাখতে কিংবা আর দুচার দিন পরে ট্রেনের কামরায় ঘুমন্ত দাদার পাশে থেকেও নায়কের কাছে পরস্পর মাথা ছোঁয়াছুয়ি করে শোয়ার প্রস্তাব করতে শেখেনি। বড়লোকের মেয়ে অশ্রু যখন প্রভাতের দারিদ্র্যের কথা শুনে সহানুভূতিতে তাকে অফিস যাবার জন্য বাইক কিনে দিতে চায়, এমন কি বাড়িতে ঝি রাখার খরচা দিতে চায়, তখন পৌরুষহীন, নির্বিকার প্রভাত ও অসংযমী অশ্রু আমাদের বিরক্ত করে। অশ্রু তার দাদার বিয়ের দিনে প্রভাতের সঙ্গে পরস্পর নগ্নদেহ স্পর্শ করলেও পরপরই প্রভাত কেন যে বেশ্যাবাড়ী গেল বোঝা যায় না। আবার অশ্রুর বিয়ের চিঠি পেয়েই সে মদ কিনে আনে—এটাও বেমানান। সেই অশ্রুই বা বিয়ের রাত্রে কেন প্রভাতের কাছে পালিয়ে এল, কেন একঘরে থেকেও কাম চরিতার্থতার সুযোগ পেয়েও ইচ্ছা অবদমিত রেখে রাত্রি শেষে ফিরে গেল বোঝা যায় না। হামসুনের নায়করা কিন্তু এরকম কার্যকারণহীন, আচ্ছন্ন আচরণ করে না। অচিন্ত্যের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'টুটাফুটা' ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের একটি সমালোচনায় বলা হয়, এ বইয়ের গল্পগুলির মূলসুর—"অন্ন এবং প্রেম না পাওয়ার" হাহাকার। এছাড়া সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সমস্ত বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ। এ ছাড়া টুটাফুটা, অচল টাকা, দুইবার রাজা, গল্প প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"গল্প তিনটি একই ছাঁচের—প্রায় একই

গল্পের বিভিন্ন version. সেই অর্থকষ্ট, সাংসারিক উপদ্রব, প্রেমের অপমান, নারীর মূর্খ হৃদয়হীনতা, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পতিতের প্রতি স্নেহ, স্থূল বৈষয়িকতাকে সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ—আর এর মাঝখানে অবস্থার নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার *সঙ্গে ব্যর্থ সংগ্রাম করছে এক স্বাস্থ্য ও সহায় সম্বলহীন যুবক।" সমালোচক আরো* বলেছেন—"কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এই রূঢ় অসামঞ্জস্যই অচিন্ত্যবাবু তীব্রভাবে বারবার প্রকাশ করতে চেয়েছেন।" (প্রগতি, পৌষ-মাঘ, ১৩৩৫) কথাটি সঙ্গত। কিন্তু নায়কের কল্পনা যদি বাস্তবমুখী হত, তাহলে সামঞ্জস্যহীনতা আরও স্পষ্ট হত। আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প 'দুইবার রাজা' আলোচনা করলে উপরের বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়। নায়ক অমর "অনশনক্লিষ্ট intellectual"দের—অচিন্ত্যবাবুদের কালের যুবকদের প্রতিনিধি। তার অসুস্থ শরীরের উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না, কলেজের বেতন দেওয়া হয় না—এসব হল 'নিষ্ঠুর প্রতিকূলতা।' অধ্যাপকদের ইংরাজী উচ্চারণের কিংবা কবিতা ব্যাখ্যার ত্রুটি তাকে বিরক্ত করে। কবিতার মধ্যে সে 'সোজা কথা বুক ঠুকে খুলে বলে দিতে' চায়। এই তার কল্পনার আশ্রয়, কিন্তু কবিতার এই সত্যাশ্রয়িতার কোনো পরিচয় গল্পে নেই। অনেক কষ্টে সে একটা টুাশন পায়। তার ছাত্রও কবিতা লেখে। একদিন অমর শুয়ে শুয়ে ছাত্রের কবিতা শুনছে আর তারিফ করছে এমন সময় অভিভাবক দেখে ফেলায় তার কাজ যায়। অতএব কি করা? আর চাকুরীর চেষ্টা না ক'রে সে বিয়ে করবে ঠিক করল। (অদ্ভুত বাস্তবতা!) মেয়ে কেমন তা জানার তার প্রয়োজন নেই, কারণ বিয়ে বিয়েই। তারপর এই বিবাহিত নায়ক একদিন রাস্তায় হাঁপানির টান সামলাতে না পারায় গাড়ীচাপা পড়ে। বিবাহযাত্রা আর মৃত্যুযাত্রা, এই দুইই একমাত্র তাকে রাজকীয় সম্মান দিল। আর, এমন 'গুণী' ছেলের মৃত্যুতে বোহেমিয়ান বন্ধু সরোজের বোন 'লুসীর চোখে একবিন্দু অশ্রু' দেখা দেয়। 'তারুণ্যের অপচয়ে' সহানুভূতি আকর্ষণের অন্তরুদ্ধ আকূতি এ গল্প রচনায় কাজ করেছে বোঝা যায়। শিক্ষিত, শিল্পপ্রাণ যুবকের বেদনা ও অপচয় রোমান্টিকভাবে এই গ্রন্থে বারে বারে এসেছে। 'প্রগতি'র সমালোচক ঠিকই বলেছিলেন—"অচিন্ত্যবাবু যতই রিয়্যালিজম-এর ভান করুন, আসলে তিনি অতিমাত্রায় রোমান্টিক।" অচিন্ত্যবাবুর এই ত্রুটি থেকে কিন্তু পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'ইতি' অনেকাংশেই মুক্ত। বিশেষত 'ইতি' গল্পটি নিঃসন্দেহে লেখকের সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে। এ গল্পের নায়িকা বেশ্যা, তবে তার চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। মফঃস্বলের ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদলের নায়িকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বেশ্যাপাড়া থেকে সরলাকে আনা হয়েছিল অভিনেত্রীর কাজ চালিয়ে নেবার জন্য। বাবু সমাজে শিল্পী হিসাবে সমাদর পেয়ে তার মনে নানা স্বপ্ন জেগে ওঠে, থিয়েটারের নায়ক নিমাই-এর অভিনয়ে ও বাস্তব আচরণে

আবেগতপ্ত সংলাপের ব্যবহারে সে আপ্লুত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত মূল অভিনয়ের দিন তাকে বাদ দেওয়া হয়। তার স্বপ্নেরও ইতি হয়ে যায়। ঘরে ফিরে সরলা তার বাঁধাবাবু অটলের হাতে মার খায়। গল্পের পটভূমি রচনায় বাস্তবতার দাবী রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য, নায়ক নিমাই-এর মধ্যে ভবঘুরে নায়কের বৈশিষ্ট্য আছে। এই গল্প প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"জীবনসংযোগরহিত সেই অদম্য যৌবন-পিপাসা ও বিলাসী ভাবালুতা থেকে মানুষের মনের প্রত্যক্ষ শক্ত মাটিতে পদক্ষেপ করলেন শিল্পী 'ইতি' গল্পতে। এ যুগ অচিন্ত্যকুমারের অপারবিস্তৃত গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে মনোবিকল-নাশ্রিত জীবন-সন্দর্শনের যুগ।"৭ 'অরণ্য' গল্পের নায়ক কিন্তু ভিন্নধর্মী—সে এক আম্দা-মান প্রত্যাগত স্বদেশী, মেসের বাসিন্দা। ঝি খুঁজতে বেরিয়ে এক বড়লোক মাসীর বাড়ী পৌঁছে যায়। সে এ বাড়ীর জটিল আবর্তের বাইরের, তাই সে সকলেরই আপন হয়ে ওঠে নিজ ব্যবহারের মিষ্টতায়। তারই চোখে ভিন্ন ভিন্ন ঘরের ভিন্ন ভিন্ন বয়স, রুচি ও মনের মানুষের ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতাবোধের চিত্র রচনা করা হয়েছে। এই নায়ক যখন 'এদের নির্জীবতা, এদের অস্বাস্থ্যকর ভাবাকুলতায়' অসহ্য পীড়িত হয়ে পড়ে, এমন দিনে বাড়ীর সবার প্রিয় একটি শিশু রুষ—তেতালার ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। সমস্ত বাড়ীর মানসিকতার ভিত্তি যেন নড়ে ওঠে। গল্পটি খুবই স্মার্ট ভঙ্গীতে লেখা, সমাপ্তি সুন্দর, কিন্তু সমগ্রভাবে গল্পটি রেখাচিত্র ধরণের। 'ধন্বন্তরি' গল্পের বিষয় বড়লোক ডাক্তারের সঙ্গে গরীব রোগীর সম্পর্ক। ভিজিট দিতে অপারগ রোগীকে ডাক্তার অবজ্ঞা করত, কিন্তু একদিন বিবেকদংশনবশত তাকে সুস্থ করার জেদ করে, ব্যর্থ হয়, লোকটি মারা যায়। ডাক্তার এখানে ধনী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেকের জ্বালা বহন করে। স্পষ্টত, এ পর্যায়ে অচিন্ত্যবাবু জীবনের তাৎপর্য সন্ধানী সন্দেহ নেই। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য এ গল্প প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা যথার্থ ঃ—"এ গল্পে স্বাস্থ্য আর বিত্তের অজস্রতার বৈপরীত্যে ব্যাধি আর দারিদ্রের নগ্ন ও বীভৎস চিত্রটি লিপিকুশলতায় উজ্জ্বলতা পেয়েছে, কিন্তু ডাক্তারের মানস পরিবর্তন এবং তার অন্তিম ব্যর্থতাবোধ গল্পের মুখ্য উপজীব্য।"৮ অচিন্ত্যের এই সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ১৩৪১ সালে প্রকাশিত "রুদ্রের আবির্ভাব" নামক গল্পগ্রন্থের নামগল্পের মধ্যেও পাব। এখানে গল্পলেখক এবং গ্রামপিয়াসী নায়ক তার স্ত্রীকে নিয়ে সহর ছেড়ে গ্রামের প্রকৃতির স্নিগ্ধতার মধ্যে গেল। তাদের জীবনের পরিতৃপ্তির অভাব ছিল না। কিন্তু বন্যার আবির্ভাবে তাদের ঘর ছাড়তে হল, বাসস্থানের বিস্তার ছেড়ে আসতে হল কলকাতা সহরের সংকীর্ণতায়। সেখানে আর্থিক অনটন, প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রতুলতা, পারিবারিক অসুস্থতা, অফিসে ছঁটাইয়ের আশঙ্কা ইত্যাদি দুর্যোগ একের পর এক রুদ্র মূর্তিতে এসে আবির্ভূত হল।

লেখকের অভিপ্রায় বুঝতে কষ্ট হয় না, কিন্তু রুদ্রের আবির্ভাব বিষয়ে একাগ্র না হয়ে লেখক পূর্ব পর্যায়কে অতিরিক্ত বিস্তৃত করায় গল্পের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। 'আর্টিস্ট' গল্পের নায়ক একজন দারিদ্র্য পীড়িত গল্পলেখক। তার এক বন্ধুর কাছে তার মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছালে যারা তার রচনা অবজ্ঞা করত, এমনকি তারাও প্রশংসা শুরু করে, চড়া দামে তার গল্প কেনে, তাকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখে, এমনকি তার নামে চাঁদা পর্যন্ত দেয়। শেষপর্যন্ত লেখক তার বন্ধুর কাছে একদিন আবির্ভূত হলে সে চমকে যায়। লেখক বলে, মানসিক দিক থেকে তার মৃত্যুই হয়েছে, কেননা সে লেখা ছেড়ে দিয়ে কাঠের কারবারে নেমেছে। গল্পে লেখকের পুনরাবির্ভাব গল্পটির সৌন্দর্যকে ভ্রষ্ট করে ভাব-গভীরতার হানি ঘটায়, তার আগে পর্যন্ত চমৎকার—সমাজে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের কদর সম্পর্কে ধারণা হয়। সমকালে প্রকাশিত 'সংকেতময়ী' গল্পগ্রন্থে মধ্যবিত্ত মানসিকতার নানাদিককে আলোকিত করা হয়েছে। 'তিরশ্চী' একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পের নায়ক মেয়ে দেখতে গিয়ে সুমিতার দৃপ্ত অথচ সহজ ভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হয়ে, তার রঙ কালো হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে চায়। সুমিতা তাকে বিয়ে না করার অনুরোধ করে, কারণ সে একজনকে ভালোবাসে। প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নায়ক অন্যত্র বিয়ে করে। এর কিছুদিন পরে আইনজীবী নায়ক রাত্রে যখন রায় লিখেছেন, তখন সুমিত্রা এসে তার স্বামী পশুপতিকে—যে তারই অধীনস্থ কর্মচারী—শাস্তি না দিতে অনুরোধ করে। কিন্তু পশুপতির দোষ ক্ষমার যোগ্য নয়। জানা গেল, পশুপতি অবশ্য তার সেই প্রেমিক নয়, শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করতে সুমিতা বাধ্য হয়েছে। নায়কের মনে সুমিতা ও তার প্রেম সম্পর্কে যে উচ্চ আদর্শ ছিল তা ভেঙে গেল। সেই কারণে নায়ক পশুপতিকে ক্ষমা করল না, সুমিতাকে চলে যেতে বলল। লেখক এখানে রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পের মতো আদর্শবোধের অপমৃত্যুর কাহিনীকে অত্যন্ত সংযত পরিসরে সুন্দর বর্ণনা করেছেন। 'অমর কবিতা' গল্পে অবশ্য অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয় আছে যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কন্যার মৃত্যুতে নির্মলা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। একদিন সে লিখে ফেলল একটা উচ্ছ্বাসসর্বস্ব কবিতা। তারপর বানাতে লাগল একের পর এক মূর্তি, যার সঙ্গে তার মেয়ের সাদৃশ্যই নেই। তারপর একটা পুতুলকে মেয়ে হিসাবে রাত্রিদিন লালনপালন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে গেল। সে সময়ের বাংলা লেখকদের অনেকেই এই অস্বাভাবিক মনোবিকার নিয়ে গল্প লেখার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, অচিন্ত্য তাতেই প্রভাবিত। নইলে এ ধরণের গল্পরচনা তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা নয়। পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'নায়ক নায়িকা' (১৩৪১)র 'ন যযৌ ন তস্থৌ' গল্পে আবার প্রথম পর্যায়ের নায়কের দারিদ্রবিড়ম্বিত

জীবন ফিরে এসেছে, তবে তার লোক দেখানো যাযাবর মনোভাবটি নয়। শচীনের বিদেশে চাকরীর টেলিগ্রাম এল। কিন্তু তার হতাশ, ক্লান্ত এবং অলস জীবনে এ সংবাদ মোটেই উৎসাহ জাগাল না। বাড়ীতে অবশ্য সাড়া পড়ে গেল। মা তার বিয়ের মুখ দেখায় পাওয়া গিনিটা পর্যন্ত বিক্রি করে খরচের টাকা জোগাড় করলেন। ভাই বোনেরা আলুমাংসের স্বাদ পেল। কিন্তু ট্রেনের টাইম বদলে যাওয়ায় সে ট্রেন ফেল করল। এ নিয়ে মায়ের উদ্বেগ, কতক্ষণে ছেলেকে পাঠাতে পারবেন, তার দুশ্চিন্তা। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ীতে একটা চাকরী পাওয়া ও রাখার উদ্বেগ এখানে সুন্দরভাবে ফুটেছে। 'ডবল-ডেকার' (১৩৪২) গল্পসংগ্রহের 'ছুরি' নামক গল্পে সেই যাযাবর নায়ক কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। এক নারীবর্জিত গ্রামে মুদী দোকানী 'গৌরীয়া'কে দেখে অবিবাহিত নায়কের ভাল লাগে। নানান অজুহাত সৃষ্টি করে সে তার দোকানে যায়। গৌরীয়ার ঘরে তার সঙ্গী এক ঝি আর বালিসের তলায় একটা ছুরি। এক বৃষ্টির দিনে নায়ক ধুতি পাঞ্জাবী পরে দোকানে এলে গৌরীয়া তার দুর্বলতা বুঝতে পারে। তার খ্যাতি ও পদমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গৌরীয়া তাকে চলে যেতে বলে। নায়ক উদ্যোগী হয়ে বদলী হয়। যাবার পথে গৌরীয়াকে দেখে নায়কের 'এতদিনে মনে হল বিদেশে চাকরী করতে যাচ্ছি।'

এই দোলাচল সমাজমনস্কতার ভাবটি চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি এসে খানিকটা কেটে যায়। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত 'কাঠখড় কেরোসিন' থেকে অচিন্ত্যবাবুর গল্পে বিষয়গত পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি পরপর কয়েকটি গল্পগ্রন্থে দরিদ্র মুসলমান জীবন অবলম্বনে গ্রাম বাংলার চাষী মজুর সমাজকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী শাসকদের চিত্রও এসেছে। তৎকালীন প্রগতি লেখক সঙ্ঘ ও তার লেখকবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ, দেশে সাম্যবাদী সাহিত্য ও চিন্তার উদার আবহাওয়া প্রভৃতির প্রভাব এই পরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৪ সালে তিনি বিপ্লব পরবর্তী আধুনিক রুশ সাহিত্যের স্বকৃত বারোটি গল্পের অনুবাদ নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় অনুবাদক অচিন্ত্যবাবু সোভিয়েট সাহিত্যের বিস্তর প্রশংসা করেন। 'কাঠ খড় কেরোসিন' গ্রন্থের আলোচনা মারফৎ এই পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় গ্রহণ করা যাক। 'কাঠ' গল্পে দেখা যায় দরিদ্র মাঝিরা কাঠের বেশী দাম চাইছে সিভিল সার্বিস অফিসারের কাছে, আর এই অন্যায় দাম আদায়ে জুলুম চালায় কমিউনিস্ট কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত অফিসারের চাকর মঙ্গল নিজের মাইনের ও মাগগী ভাতার টাকা দিয়ে দাম শোধ করে বাবুর সম্মান ও নিজের চাকরী বাঁচায়। অফিসার এক জায়গায় বলছে : 'দরিদ্র হলেই যে নারায়ণ হয় না, জানতে না তুমি ?'

এটা অচিন্ত্যবাবুরও কথা, আর এ গল্পে কিন্তু তিনি কমিউনিস্টদের সমালোচক। 'খড়' গল্পের সুরও তাই। বড়লোকের মেয়ে কুন্দকলির ধারে পাশে ঘুরে বেড়ায় জামা-কাপড়ে ধরতাই বুলির চেকনাই ফুটিয়ে কমরেড সাজা লোভীর দল—যারা বড়লোকের ছেলে। এদের হটিয়ে কুন্দকলি তাদের দলের একটি গরীব ছেলেকে বিয়ে করে। সেজন্য দলের ভিতরে ও বাইরে কমিউনিজম বিরোধী অনেক কথা তাকে শুনতে হয়। শেষপর্যন্ত তাদের বিবাহিত জীবন দারিদ্র্যের চাপে অর্থহীন হয়ে যায়, খড়ের মতো শুকিয়ে যায়। কমিউ-নিস্ট কর্মীদের সমালোচনার কথা 'চিতা' গল্পেও পাওয়া যাবে (এখানে তাদের হৃদয়-হীনতার কথা)। 'কেরোসিন' গল্পের দরিদ্র চাষী রমজান বিয়ে করেছে হাস্যবিবিকে। গ্রামে কেরোসিনের অভাব আর তেলের এজেন্ট ও ডিপোর বাবুদের আঁতাতে বাজারে চড়াদর। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট কর্মীদের কিছু ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হাস্যবিবি খিদের জ্বালায় কাঁচা বিচেকলা ও কাঁচা তেঁতুল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেরোসিন না পেয়ে রমজান স্থানীয় বিক্রেতা হাতেম শার গুড়ের আড়তে আগুন লাগিয়ে দেয়, যেখানে গুড়ের হাড়িতে আছে লাল কেরোসিন। রমজান প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্ত। এবার সে তার বিবিকে আলোয় দেখতে পারবে। পুরো ব্যাপারটা বড়ই ভাবালু। বিশেষত রমজানের মনে মধ্যবিত্ত মানসিকতা আরোপিত যখন সর্বব্যাপী কেরোসিনের অভাবের দিনে সে ভাবে— "রাতের হাসি কখনো দেখিনি, কিন্তু কান্নাটাকে দেখব।" এ কাব্যিকতা এ গল্পে অচল। 'বস্ত্র' গল্পের সমস্যা গ্রামজীবনের বস্ত্রসংকট। মানুষ ভূতের মতো হয়ে গেছে। লোকে শ্মশানে যায় কাপড় ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো, বালিসের খোল খুঁজতে। গল্পের বক্তা ব্যথিত হয়ে, এই রকম একটি গরীবকে রেশনে পাওয়া কাপড়টা দিয়ে দেয়। এই অবধি গল্পটি সমকালীন বাস্তবতাকে স্পর্শ করেছে, সহানুভূতির দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে। কিন্তু তারপর দেখা গেল, সেই কাপড়টা দিয়ে লোকটা গলায় দড়ি দেয় আর তার লাশটা চালান দেবার আগে তার নতুন কাপড়টা তার বৌ ও তার পুত্রবধূ দু-টুকরো করে পরে। গল্পের এই অংশটুকু মর্মান্তিক সন্দেহ নেই, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রেরণায় সঞ্জীবিত নয়। 'হাড়' গল্পের বিষয় দুর্ভিক্ষের প্রভাবে গ্রাম্য মহিলাদের অধঃপতন। অভাবের তাড়নায় মানদা মেলায় বেশ্যাবৃত্তিতে রাজী হয়ে যাবার সময় অসুস্থ, রোগা স্বামী কান্তরামকে আগাম পাওয়া দশটা টাকা দিয়ে যায় ডাক্তার দেখানোর জন্য। বড়ই নিরানন্দের বছর। "স্ফূর্তি করবার মত কারু মন নেই, স্বাস্থ্য নেই।... শুধু যারা ধান বেচে কাঁচা পয়সা পেয়েছে" তারাই আসে। মেলার শেষে স্বামীর কাছে ফিরে চলল মানদা। মনে সামান্য আশঙ্কা, স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে কুণ্ঠিত হবে কি না। বাড়ীতে গিয়ে দেখল, গাবগাছের নীচে, শেয়াল কাঁটার ঝোপের আড়ালে শুয়ে আছে একটি কঙ্কাল—স্বামী কান্তরামের।

এদিকে কঙ্কাল কিনতে বেরিয়েছে লোক। মানদা কঙ্কালটি কুড়ি টাকায় বেচে দিয়ে চলল ডুমুরতলায় বেশ্যাপট্টিতে ঘর নেবে বলে। সমকালের এই বিষয় নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'আজ কাল পরশুর গল্প।' কিন্তু সেখানে বেশ্যামেয়ের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যাটি মানিকবাবুকে আকৃষ্ট করেছে, এখানে তেমন কোন সমস্যা নেই। দ্বিতীয়ত, মানিকবাবুর গল্প বেশ্যামেয়েটির ঘরে ফেরার কাহিনী, রক্ষণশীলতার, লালসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কাহিনী; অচিন্ত্যবাবুর কাহিনী বিপরীতমুখী হয়েছে। তৃতীয়ত, মানদার মানসিক দিকগুলো গল্পে রাখা উচিত ছিল যার অভাবে মানদার শেষ সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ, স্থায়ীবৃত্তি হিসাবে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ) শুধুই চমক সৃষ্টি করে। ১৯৪৬ সালেই অচিন্ত্যবাবুর আর একটি গল্পগ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে—"কালোরক্ত।" তাতে যুদ্ধের অভিশাপের দিনগুলোর আভাস মেলে। তবে উপস্থাপনায় ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবতার অভাব প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নাম গল্পটিতে দেখা যায়, গরীব স্কুল-কেরানীর বৌ বিভার রাস্তা থেকে ভিখিরীর সদ্যোজাত ছেলেকে সন্তান হিসাবে পালন করবার ব্যর্থ চেষ্টা। বিভার মিছরি সন্ধান এবং পালিত সন্তানের মৃত্যু বর্ণনায় নিতান্ত সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা আছে মাত্র। "বাঁশবাজি" গল্পেও সমকালীন জীবন পরিবেশের কাজ করেছে; দেশপরিণত হয়েছে 'আতঙ্কের অন্ধকূপ'-এ, লোকের চেহারা ক্ষুধায় কাহিল। এ গল্পের দরিদ্র মুসলমান খেলোয়াড় মন্তাজ তার বড় ছেলেকে বাঁশের ওপর তুলে সামলাতে না পারায় ছেলেটি আহত হয়। ক্ষুধা মেটানোর পয়সা থাকলে এই দুর্বলতা ঘটত না—লেখক এ কথাটা কিঞ্চিৎ ঝাঁঝের সঙ্গে রাখতে পেরেছেন। 'সাহেবের মা' গল্পের গ্রামসেবক অমূল্যের মুখ দিয়ে লেখক এই প্রশ্ন তুলেছেন—"কিন্তু গ্রামকে ধ্বংস করল কে? আজ গ্রামকে খাড়া করলে কালই যে সে ফের ধ্বংস হয়ে যাবে না তার ঠিক কি?" কিন্তু এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সন্ধান যে অচিন্ত্যবাবুর অভীষ্ট নয় তা বোঝা যায়। সাহেবের মাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লা নেই সে বলছে কেন? তার উত্তরে সে বলেছে— 'সে গেছে তোমাদের পকেটে। কোঠাবাড়ীতে।" ('পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরূপ উক্তি এখানে স্মরণ হবে) কিন্তু সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনাপ্রসূত এই নাস্তিকতা আদ্যন্ত নেই ফলে তাৎপর্য হারিয়ে যায়। এর পরবর্তী গল্পগ্রন্থ—"আসমান জমীন" (১৯৪৭)। এখানে গ্রামবাংলার মুসলমান জীবনকে লেখক উপজীব্য করেছেন। 'সরবান্ ও রোস্তম' গল্পের সরবান্ স্বামী আর শাশুড়ীর যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে বাপের বাড়ী বাড়ী চলে গেল। লোকে বললেও তার স্বামী রোস্তম কিন্তু তাকে তালাক দেয় না। শমনের চাপে একদিন তাদের দু'জনকেই আদালতে হাজির হতে হল। কিন্তু এই দুই সরল চাষীপরিবারের পুরুষ ও মহিলা আদালতের

নিষ্ঠুর ও বিচিত্র শোষণের উদ্যত হাঁ-এর সামনে নাজেহাল হয়ে আদালতের বাইরে পালিয়ে আসে, তাদের ঝগড়া মিটে যায়, তারা তাদের মৃত পুত্রের কথা স্মরণ করে, তার কবর দেখতে যায়। এই গল্পে অচিন্ত্যবাবু বেশ সার্থকতা অর্জন করেছেন, নির্দ্বিধায় বলা চলে। এখানে শ্রেণীচেতনা সুন্দর ও যথার্থ। অচিন্ত্যবাবু যখন পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকেন তখন তিনি জীবনের যেটুকু প্রতিরূপ আঁকতে পারেন সেটুকু কিন্তু তাঁর প্রসারিত সামাজিক পরিবেশে ন্যস্ত কাহিনীতে রক্ষা করতে পারেন না। "বেদখল" গল্পে লেখক দেখাচ্ছেন, জমিদার পক্ষের লোকেরা কে কার থেকে কতটা হাতিয়ে নিতে পারে, আর কিভাবে সরল চাষী পরিবারের সঙ্গে ভালোমানুষি ক'রে তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে ও বাড়ীর কর্তাকে বন্দী করে। যদিও গল্পে কষ্টকল্পিত অংশ আছে কয়েকটি। 'দাঙ্গা' গল্পেও একই ব্যাপার লক্ষণীয়। জমি বা চর দখলের দাঙ্গার প্রসঙ্গ গ্রামীণ জীবনের অত্যন্ত সত্য ঘটনা (তারাশঙ্করের লেখায় তার পরিচয় একাধিক স্থলে বাস্তব স্বরূপে উপস্থিত হয়েছে)। এখানে সেই তীব্র সমস্যাকে উপেক্ষা করেছেন লেখক রোমান্টিক প্রেম বর্ণনার লোভে। জিন্নত ও মমিনার কাহিনী সে কারনেই নিছক প্রেম কাহিনী। "কেরামত" গল্পে আবার পারিবারিক সঙ্কীর্ণ পরিসর ফিরে এসেছে। গরীব কেরামতের সুন্দরী বৌ-কে মিথ্যে তালাক নামা দাখিল করিয়ে গ্রামের হাওলাদার সাহেব নিকে করল। কেরামত কোর্ট কাছারি করেও এর প্রতিকার পেল না। মোক্তারবাবুর কথানুযায়ী সে শিখল (এবং পাঠকেরাও) যে, লেখাপড়া শিখলে সব হারাতে হবে না। কিন্তু শ্রেণীগত বঞ্চনা কি শুধুমাত্র লেখাপড়া শিখলেই সমাধান হবে ? অচিন্ত্যবাবু একাধিক গল্পেই কোর্ট কাছারি, প্রচলিত আইন, বিচার ব্যবস্থায় আস্থা সঞ্চার করতে চেয়েছেন, কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের দিনগুলোতে বাংলার চাষী কি ভিন্নমুখী হয় নি ? লেখকের গ্রাম পর্যবেক্ষণের ধরণটাও কোর্টের কর্মী সুলভ—যেন বিচারকের দলিলের খণ্ডিত বিকৃত সামাজিক পরিচয় মাত্র। 'সারেঙ' (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের আলোচনায় আমরা একই অনুবর্তন লক্ষ্য করব। এই গ্রন্থ বিষ্ণু দে-কে উৎসর্গ করা হয় এবং বিষ্ণুবাবু পরিচয়ের পাতায় অচিন্ত্যবাবুর সমকালীন গল্প গ্রন্থগুলির প্রশংসাসূচক সমালোচনাও করেছিলেন। 'সারেঙ' নামক গল্পটি গোর্কীর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার ছেলেবেলা' বা 'পৃথিবীর পথে'র কথা স্মরণে আনে। মা পুনরায় বিয়ে করবে জেনে নাসিম স্টীমারে সারেঙের চাকরের কাজ নেয়। তার মুখে কিছু প্রগতির কথা বসানো হয়েছে, যা বড়ই বেমানান। নাসিম যাত্রীদের জিনিষপত্র চুরি করে সারেঙকে খুশী করার চেষ্টা করত। একদিন নতুন বিয়ে করা মায়েরই গলা থেকে হার চুরি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে সে নতুন বাবার হাতে প্রচণ্ড মার খায়। সারেঙ তাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে রক্ষা করে। অগত্যা নাসিমের

মা লজ্জা গোপন করার জন্য বলে, নাসিম চুরি করে নি। গল্পটি অত্যন্ত অগভীর মনোভাবের ওপর রচিত। 'নতুন দিন' গল্পে লেখকের দৃষ্টি ব্যাপক গ্রাম সমাজের ওপর গিয়েছে। গরীব চাষী জোনাবালির সঙ্গে অর্থবান সুন্দর খাঁর জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। দেশে ভোট এল, গরীবরা ভাবল তাদের বোধহয় সুদিন আসছে। কিন্তু ভোটের পর প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও তাদের অবস্থার এতটুকু বদল হল না। বরং বাকী খাজনার দায়ে জোনাবালিকে জেলে যেতে হল। সামাজিক পরিস্থিতিটা লেখক এখানে সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন। অনুরূপ পরিচয় "মাষ্টার সাহেব" গল্পেও পাওয়া যাবে। গ্রাম্য পাঠশালার দরিদ্র শিক্ষক চাষীদের কাছে কাতর অনুরোধ ক'রে তাদের ছেলেদের নাম খাতায় রেখে গ্র্যান্ট বজায় রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি স্কুল ইনস্পেক্টরকে খাতির ক'রে এই পাঠশালা তুলে দিয়ে নতুন স্কুল বসাল, পূর্বোক্ত শিক্ষক এখানে মাত্র চাকুরীজীবী শিক্ষক ও কর্মচারীতে পরিণত হল। তার চোখ দিয়ে দেখানো হয় শিক্ষা নামক ব্যবসা, গ্র্যান্টের টাকা মারা, স্কুল বোর্ডে ঘুষের ব্যবস্থা ইত্যাদি। গল্পটি অবশ্য শেষপর্যন্ত কোনো বক্তব্যের ব্যঞ্জনায় সমাপ্তি লাভ করেনি, নিছক স্কেচ হিসাবে শেষ হয়েছে। 'ধান' গল্পে কৃষক ও মহাজনের উত্তপ্ত সংঘর্ষের পটভূমিকা থাকলেও লেখক তার সদ্ব্যবহার করেন নি। গ্রাম্য মহাজন যোগেশ সিঙ্গি প্রজাদের ধান রক্ষায় উদ্বুদ্ধ ক'রে ভেবেছিল সরকারী প্রাপ্য ফাঁকি দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজারাই সরকার পক্ষের হয়ে ধান নিতে এল। এটা নাকি "ভাঙবার মহড়া" দিয়ে রাখছে তারা। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখক এইভাবে মাঝে মাঝে অবাস্তব মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়ে বসেন। এই মনোভঙ্গি "অপরাধ" গল্পে আরো কদর্যরূপ লাভ করেছে। ডেটিনিউ অজয় তার বন্ধু, দারিদ্র্যপীড়িত, ঋণগ্রস্ত দীনেশের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল। পাওনাদার এসে পাওনা চাওয়াতে অজয় বন্ধুকে শেখাল—"ওদের বেশী ওরা দিয়েছে, তোমার অল্পতম-ও নেই, তুমি দিতে পাচ্ছ না। এর মধ্যে এতটুকু অন্যায় নেই" ইত্যাদি। আর এই বক্তৃতা শুনে সব পাওনাদার মন্ত্রমুগ্ধ, ভীত হয়ে চলে গেল। দীনেশও একদিনে আকস্মিকভাবে শ্রেণী সচেতন ও দেশ প্রেমিক হয়ে উঠল। সেদিনই সন্ধ্যেবেলা পা টিপে টিপে বাড়ী ফিরে সে দেখল, "অজয়ের কোলের মধ্যে মুখ রেখে অসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।" (এখানে স্পষ্টত বোঝা যায়, বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়ো প্রভৃতি গ্রন্থের মানসিকতা ছদ্ম-প্রগতিশীলতার আড়ালে কাজ করে গেছে।) যা হোক, উদার দীনেশ এতে কিছুই মনে করল না। রাত্রে সে অসীমাকে বলল, অসীমা যদি মনে করে থাকে সংসারের থেকে দেনা বড়, তাহলে সে ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারে, সে কোনো অপরাধই করে নি। দীনেশ-কথিত অসীমার এই রূপান্তরও একান্তভাবে আকস্মিক, তাই পাঠক

হতচকিত হয়ে যান। যুগের হাওয়ার এই দিকে যেমন তিনি সুর মিলিয়েছেন, অন্যদিকে অর্থাৎ গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা আছে 'সূর্যদেব' গল্পে। গান্ধীজী গ্রামের পাশ দিয়ে যাবেন শুনে গ্রামের লোকেরা সবাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছে, কারণ তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, "দেখতে দেখতেই দিন রাতের বদলে যাবে চেহারা। আর দুর্ভিক্ষ হবে না। দুর্ভাগ্য থাকবে না আর কারুর।" একজন গ্রাম্য বালককে দিয়ে বলানো হল, "যে অন্ধ, যার চোখ নেই, সেও তাঁকে (গান্ধীজীকে) দেখতে পায়।" এবং তিনি হলেন "ঠিক সূর্যের মতো। যেই এসে দাঁড়ান চারিদিক আলো হয়ে ওঠে। ভয়ের দুঃখের, বিবাদ-কলহের লেশমাত্র থাকে না।" গান্ধীজী সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষের বিমূঢ় ভক্তির সুন্দর আলেখ্য আছে সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত "ঢোঁড়াই চরিত মানস"-এ (২য় খণ্ড), কিন্তু এখানে গান্ধী প্রশস্তির বাহুল্য গল্পের গল্পত্বকে নষ্ট করেছে।

১৯৪৭ পরবর্তীকালে যেহেতু সাধারণভাবে বাংলা কথাসাহিত্যের পালাবদল ঘটল, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের লেখা থেকেও গ্রামবাংলার নিম্নতম জীবন ও জীবনসমস্যার চিত্রগুলি হারিয়ে গেল। লেখার পরিবর্তন যে ভেতরের টানে আসেনি বোঝা গেল। তৎকালীন লেখার প্রধান বিষয়বস্তু দুটি—প্রেম ও আইন ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা (সমান্তরালভাবে অধ্যাত্ম-জীবনী খণ্ডে খণ্ডে লেখার ব্যাপার তো আছেই)। যেমন ধরা যাক, "বরবর্ণিনী" (জুন ১৯৪২) গ্রন্থের কথা। 'অঙ্গুলি' গল্পে লেখকের প্রতিপাদ্য বোধ হয়, সম্পত্তির জন্য মানুষ তার বাবা বা শ্বশুরকে কিভাবে বঞ্চিত করে। কিন্তু কৃষ্ণেন্দু কেন বাবার বাড়ী ছেড়ে বস্তিতে থাকে বোঝা গেল না। গল্পের শেষে বস্তিতে পিতাপুত্রের মিলনে যে দরদ প্রকাশিত তা পূর্বে কিভাবে ছিল—এ সব প্রশ্নের উত্তর লেখক দেন না। "তপ্ত ইক্ষু" গল্পের স্টেনো লিপিকা—প্রথম দিন অফিসার সিদ্ধার্থের ডিকটেশন নিতে গিয়ে অনেক ভুল করায় তিরস্কৃত হয়। তারপর আস্তে আস্তে সম্পর্ক সহজ হয়। ইউনিয়ন নেতা প্রসাদের অনুসরণ সম্পর্কে লিপিকা সিদ্ধার্থের কাছেই অভিযোগ আনে, তার গাড়ীতে বাড়ী ফেরে। ঘেরাওয়ের সময় তার দিক নেয়। কিন্তু গোপনে প্রেম জমে যায় প্রসাদেরই সঙ্গে। লিপিকার বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে সিদ্ধার্থ যখন তার সম্পর্কে ভাববিহ্বল ও প্রেমোচ্ছ্বাসপ্রবণ, তখন সে জানতে পারে ভাবী স্বামীটি হল প্রসাদ। সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। গল্প উপভোগ্য, কিন্তু গভীরতার একান্তই অভাব। 'কুমারী' গল্পের প্রতিপাদ্য গৌরীর মত বড়লোক ঘরের মেয়েদের প্রেমের চেহারাটা এমন যে, একই সঙ্গে নাট্যপরি-চালক, কবি ও অধ্যাপককে প্রেমিক করে রাখতে চায়। বেশ কয়েকটি মজার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এগল্পে। 'মণিবজ্র' গল্পের প্রতিপাদ্য বোধ করি দুটি—কলকাতায় বাড়ী ভাড়া পাওয়ার সমস্যা ও একালের ছেলেমেয়ের খোলা যৌনতা ও প্রেম। বাদবাকী গল্প-

গুলির বিষয় এসেছে আইনের জগৎ থেকে। যেমন—'হাউসবোট' গল্পের বিষয় এক শ্রেণীর অফিসার পারিবারিক দলবল নিয়ে সরকারী কনফারেন্সের নামে কিভাবে কাশ্মীর বেড়িয়ে আসে। তাদের পদসচেতন প্রতিটি পদক্ষেপ এগল্পে সুন্দর ফুটেছে। 'তিনসাহেব' গল্পের বিষয়—আইনজীবনের যান্ত্রিকতা, যেখানে সাহিত্যচর্চা বা পড়াশুনার অভ্যাস কিভাবে কৃতিত্বহানিকর রূপে বিবেচিত হয়। 'আর্দালি নেই' গল্পে দেখানো হয় আইনজগতে বড় অফিসারদের জীবনে আর্দালি কি বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে। একমাত্র 'দিন' গল্পের মনোরথ নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র। তুচ্ছ মামলায় উকিলদের প্যাঁচে দিনের পর দিন পড়তে পড়তে তাদের টাকা পয়সা কিভাবে আত্মসাৎ হয়—তার জীবন্ত চিত্র এখানে লেখক আপন অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে উপহার দিয়েছেন। "দময়ন্তীর শাড়ি" (ভাদ্র ১৩৪০) গ্রন্থের অনেকগুলোই প্রেমের গল্প। নাম গল্পের বিষয়টা সম্ভুত। আরাধনা তার স্বামী-পুত্রের অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনীশ নামে পাড়ার এক স্বচ্ছল একক চাকুরের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নানান ছলাকলায় দিনের পর দিন টাকা আনতে থাকে। কিন্তু আরাধনাকে পুরোপুরি না পেয়ে অনীশ বীতস্পৃহ হয়ে পড়লে আরাধনাও তার ওপর চটে যায়। বরং 'সামান্য স্বর্গ' উপভোগ্য গল্প। রেডিও দোকানদার দেবতোষের সঙ্গে দুর্গার প্রেমের ফল-শ্রুতি গর্ভবতী হওয়া। তারপর ঘটনা গোপন করে সীতানাথের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই ব্যাপারটা জানতে পেরে সীতানাথ তাকে তাড়িয়ে দেয়। বাপের বাড়ীতেও স্থান না পেয়ে শেষপর্যন্ত সে একটা রেসকিউ হোমে জায়গা পায়। ছেলে প্রসব হলে সীতানাথ শুধু দুর্গাকে নিতে রাজী, দেবতোষ অবশ্য দুজনকেই। নির্দিষ্ট দিনে দেখা যায় দেবতোষের কোলে ছেলে ধরিয়ে দিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে দুর্গা স্বচ্ছল সীতানাথের রিক্সায় গিয়ে ওঠে। অর্থ যে 'প্রেমের নিয়ন্ত্রক' এটি লঘু ভঙ্গিতে প্রকাশিত। "কলঙ্ক" গল্পেও একই কথা। 'অন্যভুবন'-এর বিষয় পেইংগেস্টের সঙ্গে কিশোরী মেয়ের প্রেম। কিন্তু পেইংগেস্ট নৃসিংহ যে হঠাৎ কেন বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, বা তার মানসিক দিকটা লেখক অনুক্ত রেখেছেন। 'তাজমহল' অবশ্য বর্ষীয়ান বর্ষীয়সীর প্রেমের গল্প। নিত্য কলহ পরায়ণ এই দম্পতি পরস্পরের বিপরীত আচরণ ও ভালো লাগা নিয়ে চলত। তারপর বিমলা যেদিন দুটো পাখী পুষল, মণিশঙ্কর সেদিন থেকেই সে দুটোকে বিড়াল দিয়ে খাওয়ানোর চক্রান্ত করল। পাখী দুটো বড় হল, কথা বলতে শিখল। কিন্তু একদিন মেয়ে পাখীটা মারা গেলে মণিশঙ্কর খুব দুঃখ পেল। নিজ হাতে কাঠের বাক্সে নুন দিয়ে বাগানে কবর দিল। তারপর পুরুষ পাখিটাও একদিন মরলে দুঃখ আরও বাড়ল। তাকেও একইভাবে পাশাপাশি কবর দেওয়ার সময় মণিশঙ্কর ও বিমলার মিল হল। মণিশঙ্কর স্নিগ্ধ স্বরে বলল, "ভয় নেই। মৃত্যুতে আমরাও এমনি

কাছাকাছি হব।" সমাপ্তির এই উক্তিতে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে। 'ঘর কইনু বাহির' সত্যিই করুণ গল্প। দজ্জাল গৃহিণী মায়ালতার হাতে রিটায়ার্ড জজ সুরেশ্বরের বিড়ম্বনা সুন্দর দেখানো হয়েছে। মায়ালতা তাকে হাত খরচ দেন না, পেনসনের টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দেন, চাকর ছাড়িয়ে কাজগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, আর একটা চাকরী জোটানোর জন্য অতিষ্ঠ করে তোলেন। অথচ ইনি চেয়েছিলেন, রিটায়ার্ড জীবনটা বিশ্রামে কাটাবেন। কিন্তু তা হল না। অসহ্য ‑নের দুঃখে তিনি ট্রেনের তলায় আত্ম-হত্যা করেন। এই দুঃখটা খানিক ফুটেছে, যদিও আরও সুন্দরভাবে তা উপস্থাপিত হতে পারত। অচিন্ত্যবাবু যেন যথাদৃষ্টং চরিত্রগুলি, ঘটনাগুলি উপস্থিত করেই তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত হল মনে করেন, তাদের জীবন উপলব্ধিতে তাৎপর্যময় করে তোলার কথা তেমন চিন্তা করেন না। "গোপন পত্র" (আশ্বিন ১৩৪০) গ্রন্থের প্রায় সব গল্পই আইন জগতের। নাম গল্পের বিষয়, মফঃস্বলী আইনি পরিবেশে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা। সৌখীনতা ওপরঅলার চক্ষুশূল, কিন্তু বিনীত শীর্ণ ভাব, তোষামোদী চাকরীর উন্নতির সোপান। এ বিষয়টি অবশ্য তাঁর আরো অনেক গল্পেই আছে। 'একটুকু বাসা'র বিষয় মফঃস্বলে ঘরের সমস্যা। সস্ত্রীক তিনকড়ি চাকরীতে এসে উপযুক্ত কোয়ার্টারের অভাবে সার্কিট হাউসে ওঠে, বারংবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও ঘর ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত মহিলা মন্ত্রী, যিনি আবার তিনকড়ির স্ত্রীর সহপাঠিনী, তার আবির্ভাবে সমস্যার সমাধান হয়। উপভোগ্য পরিস্থিতি সৃজনে লেখকের দক্ষতা স্বীকার্য। 'ইনি আর উনি'র বিষয় পরস্পর ক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বন্দ্ব। এককালের দুই বান্ধবী স্বামীর পদমর্যাদা ও নূতন চাকরী অনুযায়ী কে কার বাড়ী আগে যাবে তা নিয়ে বিরোধ শুরু করে। তারপর স্থানীয় নানা ব্যাপারে ক্ষমতার দাপট দেখানোর চেষ্টা, অধীনস্থদের বৌদের এ পাশ ওপাশ করার অংশ সত্যই উপভোগ্য। কিন্তু রেলগাড়ীতে প্রসববেদনায় এই দ্বন্দ্বের উপশম ঘটিয়ে পদমর্যাদা-সচেতনতার প্রসঙ্গটি অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাহলেও গল্পটি উপভোগ্য। 'অতিরিক্ত বাবু' গল্পের রাধানাথ ব্যাচেলর বলে তার ওপরওয়ালা তার কুশ্রী মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। রাধানাথের ভীত অবস্থা ও মা মেয়ের নাছোড়বান্দা ভাবের চিত্রণ সুন্দর। শেষপর্যন্ত আর এক বয়স্ক, বিপত্নীক কিন্তু অর্থবান অফিসার দয়াময় আসাতে রাধানাথের উপর থেকে চাপ গিয়ে পড়ে দয়াময়ের ওপর। সে কিন্তু বিয়ের কথায় অরাজী না হ'য়ে ছুটি নিয়ে বন্ধুদের আনার নাম করে একে একে হাজির করে মেয়েটির পূর্বতন পাঁচটি প্রেমিককে, যারা মারামারিতে ওস্তাদ। এদের সবাইকে দেখে সাহেব ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দরখাস্ত ক'রে অন্যত্র বদলী হয়ে যায়। এগল্পের বিভিন্ন পরিস্থিতি উপভোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। 'কলারসিক' গল্পের বিষয় তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের

সাহিত্য সম্পর্কে নির্বুদ্ধিতার মনোভাব। সুবোধ তরফদারের একটি গল্প পড়ে বেশ কয়েকজন তার নিজের বা স্ত্রীর বা শালীর বা মেয়ের সঙ্গে হাস্যকর মিল পেয়ে সুবোধের ওপরওয়ালার কাছে অভিযোগ ক'রে তাকে শায়েস্তা করতে চায়, কিন্তু তা না পেরে একটা অপদার্থ গল্প লেখে, কিন্তু সে গল্প কেউই ছাপাতে রাজী হয় না। 'খাই খালাসী' গল্পে আইন জগতে সাহেবকে খুশী করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রমোশন পাবার দ্বন্দ্ব উপভোগ্য করে রচনা করা হয়েছে। গল্প নেই, পরিস্থিতির পর পরিস্থিতি সাজিয়েই উদ্দিষ্ট বিষয়কে উজ্জ্বল করে তোলা হয়েছে। 'আমার অসুখ' গল্পের জগৎও আইনের জগৎ। গল্পের আমি একা থাকতে চেয়ে অনেক শত্রু বৃদ্ধি করেছিল, কিন্তু তার অসুখের সময় দেখা গেল সবাই এসে হাজির, তাকে নানাভাবে সাহায্য করতে চায়। তারপর রোগ সেরে গেলে পাছে আবার সবাই নিন্দামুখর হয়ে ওঠে তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া। এটাই মফঃস্বলী নিয়ম, না মানলে টেঁকা অসম্ভব। অচিন্ত্যবাবুর একটা ব্যাপার সত্যিই প্রশংসনীয়। দীর্ঘদিন আইনজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ফলে তিনি সে জগতের নানা চিত্র নানা সময়ে উপস্থিত করেছেন। সেগুলি যে চিত্র হিসেবে জীবন্ত ও বাস্তব তা অস্বীকার করা যায় না।

তাঁর সাহিত্য-জীবনের উজ্জ্বল প্রবেশাধিকারের মুহূর্তে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অচিন্ত্যবাবুর 'প্রতিভা', 'শক্তির বিশিষ্টতা'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'বেদে' গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯২৮ থেকে আমৃত্যু অচিন্ত্যবাবু সক্রিয় লেখক। বৈচিত্র্যের পরিমাণে তিনি তাঁর সতীর্থদের মধ্যে তুলনারহিত। বাংলা গল্প উপন্যাসের রোমান্টিক ধারায় অচিন্ত্য-সাহিত্য নবতর সংযোজন সন্দেহ নেই। ৩য় দশকে হতাশা ও অবক্ষয়-ক্লান্ত যুবমানস মুক্তির দুর্মর ইচ্ছায় প্রচলিত আদর্শ ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে যাযাবর মনোবৃত্তি প্রকাশ করে। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম পর্বের সাহিত্যপ্রয়াসে এই সব মনোভাবের ভালোমন্দ দুটো দিকই ধরা পড়েছে। ফ্রান্সে ১৮৩০ এর বিপ্লবের পর প্যারিসের দরিদ্র লেখকদের মধ্যে হতাশামুক্তির ইচ্ছা বোহেমিয়ান জীবনকে রোমান্টিক ক'রে দেখানোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। যা হোক, এই মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল—"free, careless of material gain, and with no thought for tomorrow". বোহেমিয়ানরা হয়—"unconventional, immoral, careless of debts and unwashed".৯ এই সব মনোবৃত্তি আমাদের যাযাবরী সাহিত্যেও অনেকাংশে প্রতিফলিত। এ ব্যাপারে নরওয়ের সাহিত্যিক হ্যামসুনের রচনা আমাদের সাহিত্যিকদের একাংশের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। অচিন্ত্যবাবু মূলত রোমান্টিক লেখক হলেও তাঁর লেখায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সামাজিক সমস্যা বারে বারে

এসে গিয়েছে এবং চরিত্র নির্বাচনে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, নিঃস্ব মানুষের ভিড় দেখা গেছে। বুদ্ধদেবের মতোই, অচিন্ত্যবাবুর লেখার একটি প্রধান বিষয়, প্রেম। বারে বারে নানান পরিবেশে, কখন সরস নাটকীয়তায়, কখনও উচ্ছ্বাসে তা অচিন্ত্যসাহিত্যে পরিবেশিত হয়েছে। একসময় মনে হয়েছে বিবাহের চেয়ে বড় প্রেম। পরে কল্লোলের উন্মাদনা থিতিয়ে এলে তিনি প্রেমে আবিষ্কার করেছেন শান্তি। তখন দেহকামনার বিস্তৃত বর্ণনা তিনি ত্যাগ করে উন্মুখ হয়েছেন আত্মার আবিষ্কারে। যদিও শেষাংশঃই "রূপবর্ণনায় দেহরূপের আরতি অচিন্ত্যকুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য।"১০ প্রেমের বিচিত্র রূপায়ণের মতো অল্প পরিসরে চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যের জন্যও তিনি প্রশংসার অধিকারী। তবে চটুল প্রেমের গল্প লেখায় তাঁর ঝোঁক শেষকাল পর্যন্ত। অচিন্ত্যকুমারের অভিজ্ঞতার সীমানা নিতান্ত কম নয়। আইনজীবী হিসাবে সহর ও মফঃস্বলের আদালত-জীবন, কর্মচারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে তিনি একাধিক গল্প লিখেছেন। সংলাপে ও বর্ণনায় তাদের নিজস্ব ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত আদালত জীবনের রূপকার হিসাবে তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী। চল্লিশের দশকে অচিন্ত্যের গল্পে লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। কল্লোলীয়দের যে দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি আকর্ষণ ছিল, সেই টানেই প্রধানত অচিন্ত্যের লেখায় অবহেলিত শ্রেণীর আলেখ্য রচনার নানা চেষ্টা দেখা যায়। তাঁর এই সব প্রচেষ্টা চল্লিশের বামপন্থী সাহিত্যিক ও সমালোচক মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরিচয় ১৩৫৪ শারদীয় সংখ্যায় বিষ্ণু দে "গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা" শীর্ষক রচনায় 'অচিন্ত্যকুমারের ক্লান্তিহীন বিষয়-অনুসন্ধিৎসা ও রচনার পরীক্ষা নিরীক্ষা'কে প্রশংসা করেন। গ্রাম্য মুসলমান জীবন রচনায় "এতো দরদ" ও "এতো তথ্যজ্ঞান" লক্ষ্য করে বলেন "অকুন্ঠ মানবিকতাই তাঁর এক নতুন নির্মাণে সহায়।" বিষ্ণু দে আলোচ্য রচনায় অচিন্ত্যবাবুর রচনায় এই পরিণতিগত সার্থকতাকে হেমিংওয়ের রচনার সঙ্গেও তুলনা করেন। (কিন্তু এ তুলনা সঙ্গত নয়। হেমিংওয়ের কথাসাহিত্যের পটভূমি যেমন দেশকালে সুদূর প্রসারিত, তেমনি চরিত্রগুলি অনুভবে উদ্দাম। দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখকও বেশ সিনিক্যাল।) এই সব নিয়ে পরিচয়ের পাতায় একাধিক বাদানুবাদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহার দাশগুপ্ত প্রভৃতি লেখক ও সমালোচক অংশগ্রহণ করেন। মানিকবাবুর বক্তব্য ছিল, "মধ্যবিত্তের জীবন একদিন ছিল তাঁর (অচিন্ত্যের) সাহিত্যের অবলম্বন। তারপর চাকরী জীবনে চাষীর জীবন, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীর জীবন, এক ভাবে তাঁর সামনে এল, একদিকের উলঙ্গ বাস্তবরূপে।" "চাষীর রিক্ততা তাঁর চোখে মূল্য পেলো মধ্যবিত্তের ব্যর্থতায়" তার কারণ—"চাষী জীবন (তাঁর কাছে শুধু দর্শনীয় ও বুদ্ধি-মননীয় ব্যাপার।" এখানেই লেখা ও লেখকের ব্যক্তিগত

জীবনাচরণের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার যে কত জরুরী, মানিকবাবুতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "সমাজ ভাঙাজর্জর বাংলার চাষীজীবনের আসল বাস্তবতা", তাদের 'বাঁচার সংগ্রাম' যা তাদের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা প্রেমবিরহ নীতিদুনীতি কলহ বিবাদ একতা প্রতিরোধ" অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হয় নি। ফলে, এইসব "চাষাভূষো নিয়ে গল্প" "বাবুদের মনোরঞ্জন করলে ও "আসল বাস্তবতা" পায় নি।১১ মানিক বাবুর এই মন্তব্য যে কতদূর সঙ্গত, তা একাধিক আলোচনা ক'রে আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি। বিষয় অবলম্বনই যে বিষয়-রূপায়ণে সার্থকতা আনে না, একথা অচিন্ত্যবাবুর লেখাই প্রমাণ করে। বহু অভিজ্ঞ লেখক বাস্তবতা-সৃজনের উপকরণ সংগ্রহ ক'রেও 'গল্পের কত শত উপাদান' সংগ্রহ ক'রেও তাই 'বাস্তব' সাহিত্য রচনা করে উঠতে পারেন না। কারণ, বাস্তবজীবনের গতিকে তিনি লক্ষ্য করেন নি, যত্নশীল অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে রূপায়িত করতে চান নি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, দারিদ্র্যপীড়িত ও শোষিত বাংলায় এতোদিন কাটিয়েও জীবন সায়াহ্নে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল— "পার্ক ময়দানে রাজনীতি আছে, দৈনিক পত্রিকা রয়েছে অনেক, জীবিকার প্রশ্ন নিয়ে সেখানে তর্ক হোক, লড়াই হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাহিত্যের শান্ত পবিত্র সরোবরকে ওসব দিয়ে ঘোলাটে করার চেষ্টা কেন?"১২ তরুণ বয়সেও তাঁর চিন্তা ছিল অনুরূপ। কল্লোলীয়দের 'শিল্পের জন্য শিল্প' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চতুর্থ দশকের সামাজিক সংঘাত রূপায়ণ করতে যাওয়ায় ব্যর্থতার পরিমান তাই এতো ব্যাপক।

বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়ো-র লেখক শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্ম জীবনচিত্র রচনায় তৎপর হয়েছিলেন। এ ঘটনা বিস্ময়কর হলেও ব্যাখ্যাতীত নয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবর্তনকে "সাহসিকতার বিস্ময় সৃজনের দুর্মর অভীপ্সা"র ফসল বলেছেন।১৩ এই প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছিল। 'অশ্লীলতার ফ্যাশন' থেকে তিনি যে 'ধর্মের ফ্যাশনে' ঝুঁকবেন তাতে বিস্ময় থাকলেও তার তাৎপর্য নেহাতই মামুলি। চলতি হাওয়ার পন্থী হিসেবে সত্যই তাঁর জুড়ি নেই।

॥ খ ॥

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে বলেছেন—"কল্লোলকে নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাট-মন্দিরে।"১৪ ভাষার নাট-মন্দিরে এই প্রাণোচ্ছ্বাস সঞ্চারে অচিন্ত্যকুমারের উদ্যম অবশ্যই স্মরণযোগ্য। বুদ্ধদেব বসু অচিন্ত্য ও প্রেমেন্দ্রের ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন "playful, wistful, hide and seek prose" বলে।১৫ প্রেমেন্দ্র অপেক্ষা অচিন্ত্যের গদ্য সম্পর্কে এ মন্তব্য

অধিকতর প্রযোজ্য। এই কথাটিকেই পরবর্তীকালে ভিন্নভাবে বলেছেন ভূদেব চৌধুরী—"মধুস্যন্দী ভাষায় তাঁর গল্পের প্লটকে বর্ণনা করে গেছেন অচিন্ত্যকুমার; ফলে কথার ঝোঁকে কথার ফুলঝুরি খেলা জমে উঠেছে, কখনো হয়তো বা অজান্তেই ....।"১৬

উদাহরণ—

(১) "দিন যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি তার পর কালো ঝড়ো রাত্রিই আসে, তাতেও ভড়কাবার কিছু নেই। আমাকে জন্ম থেকে এমং পঙ্গু পক্ষাহত করে বানিয়েছেন বলে জবাবদিহি দিতে হবে বিধাতাকেই।" (দুইবার রাজা)

আলোচ্য উদাহরণে সংলাপের ভাষা অলঙ্কারমণ্ডিত হয়ে গল্পের ঐশ্বর্যবৃদ্ধিই করেছে, গল্পের লেখক-নায়কের মুখে উপযুক্ত হয়েছে।

(২) "কিন্তু তখন বলসেবী বলশেভিকদের মন্ত্র নিয়ে নয়,—অভিজাত জীবনের ওপর আমার স্বভাবজাত একটা বিতৃষ্ণা ছিল, তাই মাসীমার সীমাতেও আমি আসি নি।"

(অরণ্য)

অনাবশ্যক শব্দালঙ্কার চাতুর্য এ গল্পে অনুপযোগী। বিশেষত যে নায়কের মুখে এই কথা, তার মুখে বিপরীতধর্মী।

(৩) "ন্যাংটো হাওয়া সার্সিতে মাথা ঠুকছে,—মামদো বাড়ীটার সারা গায়ে যেন গুটি উঠেছে;—সব বাজে। উচিত বুড়ি পৃথিবীর কান ধরে কসে কতগুলি চড় মারা,—যাতে টেঁসে যায় একেবারে।' (বিবাহের চেয়ে বড়ো) অব্যবস্থিতচিত্ত, ভাবালু নায়কের উন্মার প্রতিফলন এই বর্ণনায় প্রকাশিত, কিন্তু তা যেন অনিবার্য নয়। ভাষায় কাব্যিকতা কিন্তু প্রৌঢ়ত্বেও অচিন্ত্যের অন্যতম অস্ত্র। এ তাঁর অনিবার্য আকর্ষণ বা দুর্বলতা। যথা—

(৪) "অন্তত একটা আন্দাজ করতে চাইবে না তায় বয়েস কত? সে কি শস্যের তরুণ ক্ষেত, না কি খাঁ খাঁ মরুভূমি?" (তপ্ত ইক্ষু)

(৫) "কত সময়ের ধুলো উড়ে গিয়েছে তারপর। স্তরের পর স্তর কত গভীর করে সময়ের পলি পড়েছে। পাঠোদ্ধারের অতীত হয়ে মুছে গিয়েছে জীবনের অক্ষর।"

(তৃণশয্যা)

কাব্যিকতার প্রতি বা শব্দালঙ্কারের প্রতি মোহ থেকেই তিনি নূতন শব্দ সৃজনে কখনও সার্থক, কখনও মোহগ্রস্ত। যেমন—

(১) সঙ্গের ছেলেটি ভারি মজাড়ে, আমুদে;—স্ফূর্তিলা। (২) ছুটুলে বৌ (৩) পরিক্লান্ত ঘুমন্ত করুণ মুখ (৪) গায়ে বীতবর্ষণ আকাশের সুনীল, সস্মিত প্রখরতা (৫) উজোন বয়েস (৬) গ্রামিক ক্রেতার দল (৭) অফিসারিকা-মহলে।

শুধু প্রথম যৌবনে নয়, এ প্রবণতা তাঁর প্রৌঢ় রচনাতেও উপস্থিত। যেমন— ক্ষতাক্ত

মানের দুর্গন্ধ, শাসন ত্রাসন, সঘৃণ উপেক্ষা, সুহঁাট মর্নিং কোট, কর্তনাকীর্ণ স্ক্রিপ্টটা, অভিযোক্ত্রী, স্ফারিত, ফড়িংবাজী, পিটনচণ্ডী ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের বাক্যব্যবহার সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য করছেন—"both had a peculiar weakness for the present indefinite tense, no doubt a Scandinavian influence and a rather unfortunate one."১৭ মন্তব্যের দ্বিতীয়াংশ অদ্ভুত। প্রথমাংশ সম্পর্কে বলা যায়, এ বৈশিষ্ট্য তাঁদের কালের লেখায় সহজলভ্য। উদাহরণ—

(১) ছোট ছেঁড়া র‍্যাপারখানি কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসে।

(ধন্বন্তরি)

আমাদের মনে হয়, বুদ্ধদেব বসু একথা না ব'লে বর্তমানকালের নানা ক্রিয়ারূপের কথা বললেই অধিকতর সঙ্গত হত। অচিন্ত্যবাবু সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। মাঝে মাঝে সংলাপ বর্ণনার বিকল্প ক্ষুদ্র বাক্য হয়ে উপস্থিত হয়েছে। (১) যেমন—"আমার কাজটাই হবে নিভৃতে। একজন দমেভারী অফিসবাবুর গোপন কক্ষে। তার ল্যাংবোট হয়ে। লেজ ধরা হয়ে। এতো জানা কথা।" (২) "তাই পাকা একটি দানপত্র দরকার। নির্ব্যূঢ় হস্তান্তর।"

'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে তাঁর লেখার প্রতি (তাঁর নিজের অন্তত) আপ্লুত ভক্তির কথাও বলেছেন।১৮ এই গ্রন্থে "নবীনতার, অনন্যতার সাধনা"য় প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।১৯ বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার, কল্লোলের তরুণ লেখকদের অনেককেই একসময় প্রভাবিত করেছিল। অচিন্ত্যের লেখা থেকে এ রকম উদাহরণ—

(১) "কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে গোঁ ধরিয়া বসিলাম, মনে হইল, ত্রেতা যুগে রাম হইয়া অবতীর্ণ হইলে সেই জোরে অনায়াসে হরধনু চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতাম।"

(রুদ্রের আবির্ভাব)

(২) "গোড়ায় গোড়ায় দুঃখটা তাকেও লেগেছিল প্রচণ্ড, কিন্তু যা পুরুষের ধর্ম, ক্ষতিকে সে বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে, হৃদয় দিয়ে নিষ্পরিমাণ করে তোলে না।" (অমর কবিতা)

আলোচ্য উদাহরণ দুটির একটি গল্পগুচ্ছ প্রথম পর্যায়ের ভাষা ব্যবহার মনে পড়ায়, অন্যটি শেষপর্যায়ের রবীন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরীর শাণিত, ব্যঙ্গপ্রাণ, সংযত সরস বাকভঙ্গী মনে পড়ায়। অবশ্য, চল্লিশের দশক থেকে অচিন্ত্যবাবুর গল্পে আমরা দেখব এ ধরনের ব্যবহার প্রায় নেই। পরে আবার যখন মধ্যবিত্ত জীবন বা অধ্যাত্মমহিমা বর্ণনে তিনি তৎপর হয়েছেন, তখন পূর্বোক্ত শব্দালঙ্কার চাতুর্য, কথকতাভঙ্গি, ভিন্ন মাপের বাক্য ব্যবহার, বর্ণনা অপেক্ষা

সংলাপে অতিরিক্ত মনোনিবেশ প্রভৃতি চোখে পড়ে। প্রৌঢ়ত্বের কথকতাসুলভ বাকভঙ্গি—

(১) "কিন্তু তুমি তিনকড়ি হালদার, সর্ব ছাইয়ে ভাঙা কুলো, তোমারই হয়রানির একশেষ। (একটুকু বাসা)

(২) "যা বেটা উচ্ছেদ হয়ে। যা বিচারে আছে তাই এখন হতে দে।" (নাচের পুতুল)

পূর্বোক্ত আলোচনার জের টেনে বলা যায়, অচিন্ত্যকুমারের গল্প অনেকাংশে সংলাপ-নির্ভর। সংলাপ এখানে ঘটনার গতি বা চরিত্রের ভঙ্গি নিদেশক। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

(১) "রোগশয্যা থেকে বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন—গুয়োটা যেতে না যেতেই ব্যামোয় পড়ল! তখনই বলেছিলাম ঐ অজাত দেশে গিয়ে কাজ নেই। আর, এমনকি ব্যামোই হল যে একেবারে বিছানা গাড়তে হল।" (বিবাহের চেয়ে বড়ো)

নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ীর নিত্য অসন্তুষ্ট, অশিষ্টশব্দপ্রবণ গৃহকর্তার কণ্ঠস্বর এখানে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত।

(২) "কিন্তু গরীবের ঘরে মুক্তোর হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল বলেই সন্দেহ করে, বাবুসাহেব !.... তাতে গরিব আরো গরিব হয়, তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না। আপনি বাড়ী যান।" (ছুরি)

গ্রামীণ, অশিক্ষিত এক মুদী দোকানীর মুখে এধরনের সংলাপ নিছক ব্যতিক্রম। কল্লোলীয়রা অনেকেই শিক্ষিতসুলভ সংলাপ অন্য চরিত্রে বসিয়ে চরিত্র প্রকাশে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন।

(৩) আমি হাত-তালি দেব ঊর্মিলা, such a fand of রবীন্দ্রনাথ! দাস আবার দুটো দোল খেলেন; বললেন চা করতে বল। একটু চা খাও। It's darned thirsty work, speech making." (অকারণ)

আলোচ্য সংলাপ স্পষ্টত চরিত্রদ্যোতক। ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাঙালী সাহেবদের ঈষৎ ভাবালুতাময় এবং বাংলা ইংরাজী মিশ্রিত অদ্ভুত সংলাপের সঠিক প্রতিধ্বনি পাঠক পেয়ে যান।

(৪) "ওসব শোধবোধের ধার দিয়েও যাবে না মহাজন। সে শুধু ফন্দি দেখবে কি করে জমিতে ঢুকতে পারে। ওয়াশিল দিয়ে শুধু তামাদি বাঁচাবে। তাই যেই একবার খন্দ খারাপ হবে, ঝোপ ব ঝে কোপ মেরে জমি দখল করে নেবে।" (চাষাভুষা)

এটি মুসলমান চাষীর সংলাপ। চল্লিশের দশকে অচিন্ত্যের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়। মুসলমান চাষী বা মজুরদের মধ্যে ব্যবহৃত অজস্র আরবী ফারসী শব্দের সহ-যোগিতায় সংলাপগুলি রচিত হয়েছে। সেগুলি যেমন চরিত্রকে প্রকাশ করে, তেমনি স্থানিক-

পরিবেশ চিত্রণেও সহায়ক হয়। পরবর্তীকালে অচিন্ত্যবাবুর গল্পধারা বদলে যায়, সংলাপের এই অভাবনীর বৈচিত্র্যও লুপ্ত হয়। তবে, এখন গল্পে বর্ণনা অনেকক্ষেত্রেই একেবারেই লুপ্ত। গল্প প্রধানত সংলাপনির্ভর, সংলাপের পর সংলাপ। আর, বর্ণনা যেটুকু আছে তার ভঙ্গিও সংলাপসুলভ। সংলাপকে শব্দালঙ্কারাশ্রিত করে তোলা তাঁর দীর্ঘকালীন প্রবণতা। পরবর্তীকালে ভক্তিকথকতার আশ্রয়ে তা বেড়েছে বই কমে নি। যেমন— (৫) "মোটরেরও টায়ার বদলাতে হয়, উকিলই কোনদিন রিটায়ার করে না।" (৬ "আসানসোল পাষাণ-Soul হয়ে গেছে।" (৭) 'ও অথর্ববেদের ভাষ্যকার।' 'অথর্ব বেদ মানে?' 'মানে জড়, নিশ্চেষ্ট, যাকে বলে অকর্মণ্য, ও তার পণ্ডিত।' অর্থালঙ্কারের বৈচিত্র্যেও সংলাপ অনেকক্ষেত্রে উজ্জ্বল শাণিত হয়ে উঠেছে। যেমন— (৮) 'বউমরা স্বামী আর জখম হওয়া বাঘ একগোত্র।' (৯) (শরৎচন্দ্র ও পরবর্তী লেখকদের রচনা সম্পর্কে) 'হেমন্ত বসন্ত চলে গিয়ে এখন গ্রীষ্ম চন্দ্ররা এসেছেন। জগৎ সংসার পুড়ে যাচ্ছে।' (১০) 'যদি তুমি আনিম্যারেজ করতে, আজ তা হলে এমন ফ্যাচাঙে পড়তে না। আরে, আফিং খেয়ে রাখলে সাপের বিষ পর্যন্ত গায়ে লাগে না।' ভাষাকে অলঙ্কার-মণ্ডিত করা, নূতন শব্দ সৃজন প্রভৃতি ব্যাপারে বুদ্ধদেবের নাম বহুউল্লিখিত হলেও অচিন্ত্যের লেখায় এর প্রাচুর্য তুলনায় বেশী। উদাহরণ— (১) "সেই বিকৃত দেহটা যেন একটা উদ্ধত তর্জনীর মতো ওকে শাসায়।" (২) "হঠাৎ আলো নেবানো অন্ধকার ঘরে জ্যোৎস্নার মলিন, দীর্ঘ একটি রেখার মতো নির্মলা আমার ঘরে, আমার সামনে এসে দাঁড়াল।" দুটো উপমাই দৃশ্যগ্রাহ্য। (৩) 'এই তো সেই দিব্যকান্তি রক্তবাস স্ফীতবদ্ধ-পরিকর মোহনমূর্তি। তাপতৃষাহর অমৃতের সরোবর।' উপমাটি ব্যবহার করা হচ্ছে কথকতার ভঙ্গিতে আর্দালি প্রসঙ্গে, সেই কারণে কৌতুককর প্রয়োগ বলা চলে।

(৪) "একটা বিড়ি ধরাল দলিলদ্দি। দু টানেই আঁট-করে-বাঁধা ধনুকের গুণের মত শরীরটা টন-টন করে উঠল। আমা-ইট ঝামা হয়ে উঠল।'—উপমা এখানে সুপ্রযুক্ত। লক্ষণীয় যে, তিনি একই উপমেয়কে বিভিন্ন উপমানাশ্রিত বাক্যের মাধ্যমে বলবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল আগে তাঁর উপমা ব্যবহার প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা পরবর্তীকালের রচনা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। "তোমার শক্তি এখনো যে আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতিতে পৌঁছায়নি তার প্রমাণ তোমার ভাষায় উপমার সদাসচেষ্ট প্রয়াস। তোমার উপমা অনেক স্থলেই খুব ভালো, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তারা স্বস্থানে এসে পৌঁছতে যেন হাঁপিয়ে পড়েচে। তাদের অনেক সময়ই তুমি টেনে এনেছ।" ('বেদে' প্রসঙ্গে চিঠি থেকে)

ভাষাকে অলংকারমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে বিশেষণের অবদান অসামান্য। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এ ব্যাপারে অচিন্ত্যের মিল আছে। দুজনেই বহুল বিশেষণ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত।

(১) "ওর পাশে সত্যিই রমা—স্বচ্ছকান্তি, অভিনবযৌবনা, অভিমানিনী।" (২) "আর আমাদের সম্মুখে নদী—স্রোতমুখর, ফেনিল, লালায়িত।" এখানে বিশেষ্যকে পূর্বে রেখে বিশেষণগুলিকে পরে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে—অনেকটা ইংরাজী বাক্যবিন্যাস-রীতি অনুযায়ী। (৩) "গায়ের স্কার্ফটা দিয়ে গীতিমান, উড্ডীয়মান, অপসৃয়মাণ মশা তাড়িয়ে বললে, ... ।" (৪) "লুব্ধ, বিজ্ঞ, তৃপ্ত, ব্যর্থ, ধূর্ত, ভণ্ড, তঞ্চক-বঞ্চক অনেক রকম কাক।" (৫) "বুকে চেপে বসা, টুঁটি টিপে ধরা, কাছা টেনে ধরা মেয়ে।"

আলোচ্য উদাহরণগুলিতে বিশেষণের পরই বিশেষ্যকে রাখা হয়েছে। বিশেষণ ব্যবহারে বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য লেখার আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

অচিন্ত্যবাবুর গল্প বলার রীতি হল তিনি শুরুতে নিতান্ত সাধারণ, একেবারেই চমক-বর্জিত কোনো প্রসঙ্গ দিয়ে গল্পের উত্থাপন করেন, তারপর গল্প কখনও নিরুত্তাপ বর্ণনায়, কখনও কথকতার নাট্য-প্রবণ উক্তি প্রত্যুক্তি ধরণের ভাষার সঙ্গে গল্পের নায়ক নায়িকার সংলাপ মিশে এক অপরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিরুত্তাপ গল্পের গতি সমাপ্তিতে আকস্মিক মোড় ঘোরায় উল্কার মতই জ্বলে উঠে গল্প শেষ হয়ে যায়। সব মিলিয়ে অচিন্ত্যের ভাষাভঙ্গিমা বাংলা গল্পসাহিত্যে নবস্বাদের সংযোজন করেছে, সন্দেহ নেই। তবে তার বেশীর ভাগই ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোর ব্যাপার। এটা দুঃখের কথা।

---

(১) কল্লোল যুগ, পৃঃ ৪ (২) ঐ, পৃঃ ১২ (৩) ঐ, পৃঃ ১৮ (৪) ঐ, পৃঃ ২ (৫) সমরেশ বসু, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৬ (৬) A History of Norwegian Literature, Harold Beyer, Pg. 272. (৭) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃঃ ৪৯৯ (৮) অচিন্ত্য সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠগল্প, ভূমিকা (৯) The Encyclopedia Americana : Emily Hahn, Pg. 142. (১০) বিজিতকুমার দত্তের প্রবন্ধ, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকা, শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৪৭ (১১) লেখকের কথা, পৃঃ ১০৪-১২৫ (১২) 'পূর্বাঞ্চল', সম্পাদক অমিতাভ গুহচৌধুরী (১৩) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ২৮২ (১৪) কল্লোলযুগ, পৃঃ ৮২ (১৫) An Acre of Green Grass, Pg. 78 (১৬) বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃঃ ৪৯৪ (১৭) An Acre of Green Grass, Pg. 78. (১৮) কল্লোলযুগ, পৃঃ ১৪৪ (১৯) ঐ, পৃঃ ৮২

চতুর্থ অধ্যায় : প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প

(ক)

জীবন-বিধাতার বিরুদ্ধে প্রীতিহীন প্রণিপাত নিয়ে বিদ্রোহী দলের দলী হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রবেশ। নশ্বর মৃত্তিকা গেহে জর্জর তৃষিত দীন যত নরনারী, তাদের, সব ব্যথা, গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ, পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন, প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রির ঘৃণিত জীবনযাত্রা, কলঙ্ক, হতাশা আর কদর্য কলুষ সযতনে চয়ন করে তিনি উপহার দিতে চেয়েছেন। (নমস্কার/প্রথমা) কি পেরেছেন, কি পারেন নি, তার হিসেব নিকেশ শুরু করতে হবে এই কথাটা মনে রেখেই—কবিতা ও গল্পে রবীন্দ্রপরবর্তিতার বার্তাবহ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন তিনি।

কল্লোল পত্রিকার ২য় বছর থেকে বিতর্কিত তরুণ লেখকদের রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই ২য় বছরেই, অর্থাৎ ১৩৩১ শ্রাবণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংক্রান্তি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। কল্লোল-এ এটাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। ইতিপূর্বে প্রবাসীতে ১৩৩০ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর সাড়া জাগানো গল্প—'শুধু কেরাণী।' তাই, "কল্লোলের ঘাটে তাঁর সৃষ্টির তরী যখন ভিড়েছে—প্রবাসী ও বিজলী পত্রিকার সাহচর্যে তিনি তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ।"১

বারাণসীতে প্রেমেন্দ্রের জন্ম। দাদামশাই ও বাবা ছিলেন যথাক্রমে রেলের ডাক্তার ও অ্যাকাউন্টেন্ট। এঁদের বদলী চাকরীর সূত্রে তাঁরও পশ্চিমের নানা শহর দেখা হয়ে যায়। সাতবছর বয়সে মা মারা গেলে দিদিমার আদরযত্নে তিনি মানুষ হন। অচিন্ত্যবাবুর সাক্ষ্য অনুযায়ী, স্কুলজীবনে প্রেমেন্দ্রর সঙ্গতি ছিল স্বল্প, তাই ফাউন্টেন পেন কেনার সামর্থ্যও ছিল না। তিনি ছিলেন 'ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে অসাধারণ।'২ ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর তাঁকে উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা পাঠানোর কথা হয়, কিন্তু যাওয়া হয় না। স্কটিশ চার্চ কলেজে আর্টস পড়াও ভালো লাগে না। আর্থিক মন্দার বিশ্বব্যাপ্তিতে যখন অস্তিত্ব মাত্রই বিপন্ন, "প্রেম অর্থ যশের সমস্ত ব্যক্তিপ্রচেষ্টা মধ্যবিত্ততার স্বৈরবৃত্ত পঙ্কে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক দণ্ডাঘাতে" ডুবে মরছে, যখন সমস্ত পুরাতন মূল্যবোধ ধ্বসে পড়ছে,৩ তখন এই ভালো না লাগা ও অস্থিরতার পথ বেয়েই তিনি শ্রীনিকেতনে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করতে যান, আশুতোষ কলেজে ফিরে আসেন, চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে ছাত্র হন।৪ এর ফাঁকে নন কো-অপারেশনের বানে ভেসে পড়ার কথাও অচিন্ত্যবাবু বলেছেন।৫

পড়াশুনা ঠিকমত না হওয়ায় তাঁর ভয়—"হয়ত এবার একজামিন দেওয়া হবে না।" কিন্তু নৈরাশ্যের গ্রাসে নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিতে চাননি। তাই অচিন্ত্যকে লেখেন—"থামব না আমরা, কিছুতেই না। ভয় মানে থামা হতাশা মানে থামা অবিশ্বাস মানে থামা, ক্ষুদ্র বিশ্বাস মানেও থামা।"৬ একদিকে উপলব্ধি করেন—"বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলেছে তাতেও পাই না কোনো আনন্দ।" অন্যদিকে স্বপ্ন দেখেন—"হয়ত এমন কাল আসছে যার কাব্যের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তারা এই মাটির গানই গাইবে, এই সবুজ ঘাসের এই মেঘলা দিনের কিম্বা এই ঝড়ের রাতের ..."৭ এই আশা-নিরাশার দোলাচলতা যুগচরিত্র থেকে লেখক প্রেমেন্দ্রের চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছিল।

প্রেমেন্দ্র তাঁর অন্যবন্ধুদের মতো নারী বিষয়ে বয়সোচিত আগ্রহী হলেও তাতে অতিরেক ছিল না। তরুণ প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন—"যৌন সম্বন্ধ ছাড়াও আর একটা সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের হওয়া সম্ভব।' এবং "প্রিয়া আমার জীবনের যতখানি, বন্ধু তার চেয়ে কম নয়।"৮ সেই বয়সে মনে হওয়া স্বাভাবিক "আমি আর্টকে প্রিয়ার চেয়েও ভালবাসি।"৯ তবে, একথাও ভেবেছেন, "অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম আর সাহিত্যসৃষ্টি এই দুকাজ একসঙ্গে করবার মত প্রচুর শক্তি আমার নেই।' ১০ তাঁর জীবনী থেকে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর্টের প্রতি ভালবাসা আন্তরিকতা হারিয়েছে। অচিন্ত্যবাবু তাঁর আর্থিক সংকটের কথা বলেছেন। 'কালিকলম নাকি এই সংকটমুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে বার হয়। (অবশ্য, কবি অজিত দত্ত লিখেছেন, মতবিরোধিতাই এই পত্রিকার জন্মের প্রেরণা। ১১) হয়তো এ কারণেই বেঙ্গল ইমিউনিটি নামক ঔষধ প্রতিষ্ঠানের ও 'নবশক্তি' পত্রিকার বিজ্ঞাপন রচনা করতে করতে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যরচনা ও পরিচালনার গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েন, তারপর পঞ্চাশের দশকে যখন তিনি আকাশবাণীর সাহিত্য বিভাগের পরিচালক, তখন আর্থিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সজীবতা ও দায়িত্ববোধ অনেকদূরে সরে গেছে। এ সংকট নিয়ে ভাবনার অবসর তাঁর আর মেলেনি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম—"শুধু কেরাণী।" গল্পের নামকরণে, অতি সাধারণ কেরাণীজীবনের রূপায়ণে, গল্পের কাঠামো নির্বাচনে তিনি নিঃসন্দেহে নূতনকালের বার্তা নিয়ে এসেছেন। গল্পের কেরাণী এতই সাধারণ যে সে শুধুই 'ছেলেটি', তার বৌ 'মেয়েটি' মাত্র। রবীন্দ্রনাথ 'বাঁশি' কবিতায় হরিপদ কেরাণীকে যে মর্যাদা দান করেছিলেন, যুগের দাবীতে প্রেমেন্দ্র তা বর্জন করেছেন। এই ছেলেটি আর মেয়েটি অর্থ-নৈতিক সংকটে এমনই বিপর্যস্ত যে, তারা পৃথিবীর আর পাঁচটা খবরের জন্য আগ্রহী নয়,

তেমনি 'সৃষ্টির বিরুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে এই অকারণ উৎপীড়নের জন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে জানে না।' এ গল্প উচ্চকোটির রঙীন জীবনের নয়, বরং অনুল্লেখযোগ্য মানব মমতায় পূর্ণ। 'প্রবাসী'তে এই গল্পটি ও 'গোপনচারিণী' গল্পটি প্রকাশ হবার পর 'কল্লোল-এ' তাঁর রচনার সামর্থ্য প্রশংসিত হয়, বলা হয়—"এই লেখকের প্রথম গুণ, ইহার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা।"১২

অনেক সতীর্থের রচনার মতো 'কল্লোল'-এ তাঁর ১ম গল্প 'সংক্রান্তি'র নায়ক গল্পলেখক ও বেকার। মেসের বাসিন্দা, বেকার অখিল নিজেকে 'সমস্ত পৃথিবীর দ্বারা বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত' মনে করে। সামনের বাড়ীর কিশোরীকে দেখে আত্মহারা হয়ে সে কাগজকলম নিয়ে লেখালেখি করে, গান গায়। মেয়ের মা গালি দেয়। দর্জিকে দেখেই ধারের ভয়ে পালায়। টাকা ধার চাইতে গেলে বন্ধু অপমান করে। তখন মনের দুঃখে আত্মহত্যা করার ইচ্ছায় আফিং খায়। তারপর চিঠি পড়তে শুরু করে। প্রথম চিঠি মা'র—তাতে বোনের মৃত্যুসংবাদ। দ্বিতীয় চিঠি প্রেমিকার যে, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে একটিবার তার সাহায্য চায়। যে অখিল পৃথিবীর প্রতি অভিমানে মরে যেতে চেয়েছিল, সে এখন প্রাণপণে বাঁচতে চায়। কিন্তু মেসের কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। সে নিজেই প্রাণভয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটতে থাকে। রাস্তায় দুজন মজুর তাকে ডাক্তারখানায় পৌঁছে দেয়, হাতে প্রেমিকার চিঠি। কল্লোলের পূর্ব্বোক্ত প্রশংসার মর্যাদা কিন্তু এই গল্পটি রাখতে পারে নি। 'শুধু কেরাণীর' বাস্তব জীবনের নিরুচ্ছ্বাস স্পর্শ এখানে নেই, অখিলের বেদনা কোনক্রমেই সহানুভূতি আনে না। এ গল্পে কল্লোলের "রঙীন উচ্ছলতা"র পাপস্পর্শ লেগেছে নেই। প্রেমেন্দ্র যদি এ গল্পে অজস্র ভাবালুতাকীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনের সংক্রান্তি সমাগত একথা বলতে চান, তবে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—'কালো মেয়ে'। এর নায়ক-লেখক নিরঞ্জন মেসের কুশ্রী মেয়েকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতে। হয়তো নারীর ভালোত্ব দেখানোর এই ব্যর্থ চেষ্টা শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে। পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে।" (গ্রন্থভুক্ত হবার সময় নাম হয়—'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে') এটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। পতিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু গল্প উপন্যাস লেখা হলেও (যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', নরেশচন্দ্রের 'শুভা', 'লুপ্তশিখা') মূলতঃ ৩য় দশক থেকেই পতিতা-জীবন যথেষ্ট গুরুত্ব পায় এবং আদর্শায়িত করে দেখানোর ঝোঁকটাও কমে। নায়িকা বেগুন বিগতযৌবনা, রোগা, লম্বা। অর্থ এবং শরীর দু'দিক থেকেই সে সর্বস্বান্ত। ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালির গালাগালিতে এবং নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার দুর্মর আগ্রহে সে বহুদিনের ছেঁড়া সিল্কের শাড়ীটা সেলাই ক'রে

পুরোনো হিলতোলা জুতোটা প'রে মেলায় যায় শিকার খুঁজতে। প্রথম সাক্ষাৎ একটি কুৎসিত দর্শন লোকের সঙ্গে যার "ঠোঁট একেবারে নেই—মাড়ি থেকে লম্বা অপরিষ্কার দাঁতের পাটি, ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তুলেছে আর তার বাঁদিকের সমস্ত গাল কবে যেন আগুনে ঝলসে পুড়ে বিবর্ণ মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে।" বেগুন ঘৃণায় লাফিয়ে উঠে চলে গিয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত উপযুক্ত শিকার না পেয়ে, হাজির হয় সেই লোকটারই কাছে। ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত বেগুন তাকে হাতধরে তুলে এগিয়ে যেতে চাইল। খাবারের দোকানের সামনে এসে বেগুন খাবার কেনার জন্য কিছু পয়সা চাইল। কিন্তু লোকটার কাছে কিছুই নেই, বেগুন নিজে খুঁজেও পেল না। তখন অসীম হতাশায় কপর্দকহীন মূর্তিমান সেই দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন চলতে থাকে। বেগুনের অস্তিত্ব টেঁকানোর এই যে দুর্মর সংগ্রাম, নিরুপায়ত্ব, প্রতিযোগিতা ও অপহৃত যৌবনের আর্তনাদ—একের পর এক উন্মোচিত হওয়ায় গল্পটি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে। লক্ষণীয়, প্রেমেন্দ্র এখানে গণিকার মুখে ভদ্র সংলাপ ও ভদ্র-শিক্ষিত মনোভাব আরোপ করেননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই বলেছেন—"গল্পটির Nauseating Reality ছাড়া আরো বড় বক্তব্য আছে—সে হল ছত্রে ছত্রে আভাসে ইঙ্গিতে জীবনমমতার অনুরণন।"১৩ ১৩৩১ পৌষ-এ প্রকাশিত স্কেচধর্মী 'কমলাকেবিন' নামের গল্প থেকে বোঝা যায় লেখকের অতৃপ্ত মন নানা বিষয়বৈচিত্র্যের তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে। তরুণ লেখকের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে ভাল লক্ষণ। ১৩৩২ বৈশাখ থেকে 'কল্লোল'-এ 'পঞ্চশর' এই সাধারণ নামে, ভিন্ন ভিন্ন উপনামে (অচিন্ত্যের 'বেদে'র মতো) গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। হয়ত মানবজীবনে পঞ্চশরে দহনের প্রতিক্রিয়া লেখক দেখাতে চান। অভিজ্ঞতার প্রসার-প্রবণতাও এক্ষেত্রে গণ্য করতে হয়। প্রথমটির নাম 'চিত্রা'। কল্লোলপর্বের কদর্থক বৈশিষ্ট এখানে প্রতিফলিত। গল্পের নায়ক ভাড়াটের মেয়ে চিত্রার প্রতি টানে তার বাবাকে ঘোড়দৌড়ের জন্য ধার দেয়, মাসের বাজার করে এনে টাকা নিতে ভুলে যায়। অথচ ভালবাসার কথা বলে নায়িকা টাকা চাইতে গেলে নায়ক টাকা দেওয়া 'অপব্যয়' মনে করে। নায়িকা পেপার ওয়েট ছোঁড়ায় নায়ক দৃষ্টিশক্তি হারায়। সে চলে গেলে নায়কের নিজেকে নিঃসঙ্গ, ব্যর্থ, শূন্য মনে হয়। আবার নায়িকা সন্ধানে দেশান্তরী হয়েও সব চুম্বন, আলিঙ্গন পনের বছরের সুন্দরীদের হাতে পাঠাতে থাকে। বিহারের গ্রামে চিত্রার সঙ্গে দেখা হলেও সে কেন রাতে তাকে ভাবী স্বামী জিতেন ভেবে কাঁদে, সকালে চটাচটি করে, নায়ক নিজেকে নায়িকার মনে গোপন বেদনার কাঁটা মনে করে, তার মানে বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই বাস্তবতা সৃজনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সমকালের অনেক গল্প-নায়কের মতোই এ নায়ক কাম ও প্রেমের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছে। যুগের

কারণে এটা হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা জীবন ও শিল্পের অসঙ্গতিই প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টির নাম—'কসৌলিয়া—দরদিয়া'। এই সময়ের এক কবিতায় তিনি লিখেছিলেম—"মানুষের মানে চাই—/ গোটা মানুষের মানে/রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জা, / ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত।" মানুষের সমগ্রতার এই সন্ধান, রিপুতাড়িত মানুষের এই চিত্ররচনা কল্লোল পর্বে বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। এই প্রেরণাই প্রেমেন্দ্রকে বস্তীজীবন, গণিকা জীবন, হিন্দুস্তানী জীবন রচনায় অগ্রসর করেছে। অবশ্য এ গল্পে বিহার জীবন ও হিন্দীভাষা ব্যবহারে নূতনত্ব থাকলেও প্রত্যাশিত সার্থকতা নেই। এ গল্পের নায়ক 'কাগুজে জীবন' কাটিয়ে গদীর মালিক হয়ে বিচিত্র প্রাণধারা স্পর্শের সুযোগ পায়। মাতাল সর্দার বৌকে মারতে গেলে নায়কের দরদ জাগে, কিন্তু 'কসৌলিয়া'কে নিজের পড়ে থাকা জমিতে গোয়াল করতে দেয় না। দরদিয়ার প্রতি কামলুব্ধ হয়েও ঘরে যাবার আমন্ত্রণ পেয়েও ভীরুতায় রাজী হয় না। নায়ক এখানে ভীরু অথচ লুব্ধ, অভিজ্ঞতা-বিলাসী কিন্তু সহজ মেলামেশায় অবিশ্বাসী—এরকম চরিত্র কল্লোলের নবীন লেখকদের অনেকেরই বিশেষতঃ অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেবের প্রিয় ছিল। দেখা যাচ্ছে প্রেমেন্দ্রেও তা এড়াতে পারেন নি। 'কালিকলম'-এ প্রকাশিত 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পের পটভূমি কলকাতার গঙ্গার ঘাটে সুরকীপট্টি। সুরকীর কলের কেরাণী বলাই নেশার ঘোরে ভুল করে চাকরী হারায়। গাড়োয়ান, ঠিকাদার, মুসলমান, কামার বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গাঁজা খাবার সময় সুরকীকলের মালিক খোঁড়াবাবু ওদের তাড়িয়ে দেয়। বাবুর ডিঙি নিয়ে বলাই পালালেও ধরা পড়ে। তারপর একদিন নেশার ঘোরে খোঁড়াবাবুর খড়ের গোলায় আগুন দিতে গিয়ে সে পাশের গোলায় আগুন দেয়। গল্পটির নামের সঙ্গে বিষয়ের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। হয় তো এ গল্পে দ্রষ্টব্য বলাইয়ের "বিকৃত জীবনের এক কুটিল আক্রোশের অভিব্যক্তি" যা শেষপর্যন্ত "নিষ্ঠুর পরিহাসে রূপান্তরিত' হয়। ১৪ কিন্তু পাঠকের কাছে এর আবেদন নিতান্তই স্বল্প। 'ভবিষ্যতের ভার' কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর গল্প। স্কুলের নতুন হেডমাস্টার মশাইয়ের অনেক স্বপ্ন, অনেক আদর্শ ছিল মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেবে। স্কুলের শিক্ষকরা অনেকে ফাঁকিবাজ ও ছিদ্রান্বেষী। শেষপর্যন্ত অভাব ও দারিদ্র্য হেডমাস্টারকেও তাদের সমগোত্রীয় করে তুলল। একদিন ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে উঠে সে বোঝে নিত্য-ঘুমানো পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে তার আর তফাৎ নেই। করুণ ও মর্মান্তিক এই উপলব্ধিতে লেখক আমাদের মুখোমুখি করে দিয়েছেন আশ্চর্য সংযত ভাষায়। জানা যাচ্ছে হেডমাস্টারের চরিত্রে "প্রেমেন্দ্র নিজেকে প্রক্ষেপ করেছেন।" সত্যই "লেখকের এই নির্মোহ নির্দয় আত্মসমালোচনার শক্তিটি লক্ষণীয়।" ১৫ 'উত্তরা'য় প্রকাশিত 'পুন্নাম' গল্পেও প্রেমেন্দ্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ।

ডাকের সামান্য সরকার-এর চিররুগ্ন "পাঁচ বছরের শিশুকে কেন্দ্র করে এই ছোটো সংসারটি ক্লান্ত পদে পরম দুঃখের ভার বহন করে নিঃশব্দে আবর্তন করে।" ছেলেটি "অন্ধ অবোধ স্বার্থপর" কিন্তু ললিত তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা করে কোনো ত্যাগেই কুণ্ঠিত হয় না। ডাক্তারের কঠোর নির্দেশে অনেক কষ্টে চেঞ্জে যাবার পর বাবা, মা, ছেলে সবাই মুগ্ধ। ছেলেটা কিন্তু স্বার্থপর থেকেই যায়। প্রতিবেশীর ছেলে টুনুর স্বভাব ভালো, সে পড়াশুনায় আগ্রহী। তার সঙ্গে নিজের ছেলের তুলনা করে ললিত তৃপ্তি পায় না। চেঞ্জে আসার জন্য সে লুকিয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করেছে। কিন্তু ছেলের স্বভাব বদল হয় কই। টুনুর মৃত্যুতে ললিত ভাবে—টুনুর মতো ভালো ছেলেরা মরলেও তার ছেলের মতো ছেলেরা বেঁচে থাকবে, "বড়ো হবে, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে।" মধ্যবিত্তের "সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে/ধূসর মৃত্যুর মুখ", জীবনানন্দের মতো প্রেমেন্দ্রও দেখতে পান। কিন্তু তাঁর নায়ক আশা হারিয়েও 'প্রতীক্ষার ধৈর্য' হারায় না। এই আলোচিত গল্পগুলির তিনটি (শুধু কেরানী, ভবিষ্যতের ভার, পুন্নাম) তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বেনামীবন্দর' (১ম প্রকাশ ১৯৩০) এর এবং 'সংক্রান্তি', বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, পোনাঘাট পেরিয়ে 'পুতুল ও প্রতিমা'র (১৯৩১) অন্তর্গত। তরুণ লেখকের প্রতিশ্রুতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেছে উপরের আলোচনায়। 'পুতুল ও প্রতিমা'র আলোচনা সূত্রেই 'সাগর সঙ্গম' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। দাক্ষায়ণী ব্রাহ্মণ বিধবা, তেজী প্রৌঢ়া। সাগর মেলায় নৌকোয় তাদের সহযাত্রিণী একদল বেশ্যা। তাদের অল্প বয়সী মেয়ে বাতাসীর অশ্লীল গালিগালাজ, মিথ্যা পটুত্বে দাক্ষায়ণী ক্রোধে আচ্ছন্ন হন। ঘটনাচক্রে নৌকাডুবির পর দাক্ষায়ণী বাতাসীর হাত জোরে আঁকড়ে ধরেন। উদ্ধারকারীরা ধরে নেয় বাতাসী তারই মেয়ে। দাক্ষায়ণী প্রথমে ঘৃণাবোধ করলেও রাতে মাতৃস্নেহ প্রাধান্য পায়। বাতাসীর 'মা' ডাকে বিচলিত দাক্ষায়ণী শেষপর্যন্ত ওকে নিয়েই ফিরবেন ঠিক করেন। কিন্তু বাতাসী নিউ-মোনিয়ায় মারা যায়। দাহকালে পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসায় দাক্ষায়ণী ক্ষণকাল দ্বিধাগ্রস্ত থেকে শেষপর্যন্ত নিজশ্বশুর কুলের পরিচয়ে মেয়েটিকে পরিচিত করেন। সংস্কারের ওপর মাতৃস্নেহের জয়ের ব্যাপারটা এখানে দেখানো হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখায় পাওয়া গেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের সঙ্গে এ গল্পের ভাবগত ঐক্যের কথা বলেছেন। এছাড়া প্রশংসনীয় "পরিবেশ রচনায় লেখকের বাস্তব চেতনা এবং কবিকুশলতা।"১৬ এই কৃতিত্বের পেছনে ন'বছর বয়সে দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাসাগর ভ্রমণের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই প্রেরণাসঞ্চার করেছে।১৭

'অফুরন্ত' (১৯৩২) গল্পগ্রন্থের 'অফুরন্ত' গল্পটি জমিদার জীবনকেন্দ্রিক। লেখকের বক্তব্য জমিদার বংশগুলো চরিত্রে ক্লেদাক্ততার ঐতিহ্য বহন করে, অতএব তাদের বিদায় অনিবার্য, কিন্তু যারা সংগ্রামী তারাই টিকবে। বক্তব্যে অনেক ফাঁক আছে। গল্পটি শিথিল হওয়ায় তাও আকৃষ্ট করে না। এক্ষেত্রে তারাশঙ্করের কথা মনে পড়া প্রাসঙ্গিক। প্রেমেন্দ্রের গল্পে সামন্ততন্ত্রের পতনের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নেই, বিষয়ের সঙ্গে লেখকের মানসিক যোগ নেই, তাই গল্পের আবেগ স্বতোৎসারিত নয়। 'প্রত্যাগত' গল্পে স্বার্থপরতা, অর্থলোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিভাবে মানুষের বিবেককে বদলে দেয় তার সুন্দর চিত্র আছে। সরসীর গৃহশিক্ষক সরোজ তাকে বিয়ের কথা ভাবে আবার ছাত্রহিসাবে আরো কৃতী হতে চায়। সরসী তার মায়ের গয়নার বাক্স তুলে দেয় সরোজের হাতে। সেই টাকায় সে বিলেত যায়, কিন্তু উত্তরোত্তর সাফল্যের স্রোতে সরসীর প্রতি দায়িত্ব ভুলে যায়। কলকাতায় ফিরে যখন সংবাদপত্রে সরসীর মায়ের বাড়িভাড়া দেওয়ার অক্ষমতা, পাড়ার যুবকদের হাতে বাড়ীওয়ালার মার খাওয়ার কথা পড়ে তখনই সে দেখা করতে যায়। কিন্তু বাড়ীর সামনে গিয়ে কড়া নাড়তে আবার দ্বিধা হয়। এমন সময় বড়লোক ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার বাড়ীতে যেতে বাধ্য হয়। গল্প করতে করতে সরসী আর তার বিধবা মা-র কথা হারিয়ে যায়। গল্পের এই ভঙ্গিতে, বিশেষতঃ শেষাংশে চরিত্রের মনোভাব বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা স্মরণে আসে। এই একই মনোভাব এসেছে 'পুনরুক্তি' গল্পে। এককালের প্রাইভেট টিউটর ও বাজার সরকার অনিরুদ্ধের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় ইলার দেখা। অনিরুদ্ধ আজ নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ, গ্রাম্যতা দোষেদুষ্ট বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেছে। ইলা চলে যাবার পর, স্ত্রীর কাছে নিজের অনুরাগের কথা বলতে সাহস পায় না, বরং তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করে। ১৯৩৪-এ প্রকাশিত 'অরণ্যপথ' গল্পগ্রন্থে ধরা পড়েছে গঠনরীতির অস্থিরতা ; জানিনা তা লেখকের জীবনচর্যার কোনো অস্থিরতা থেকে এসেছে কি না। যেমন 'বৃষ্টি' গল্পটি। গল্পের সূচনায় আছে একটি বিস্তৃত পটভূমি, আদিমকালে সৃষ্টির সূচনায় মানুষের কথা, কখনও একালের মানুষের কথা। কিন্তু মূল কাহিনীতে এর কোনো তাৎপর্য নেই। প্রতুল লতিকাকে অনুরাগবশতঃ ট্যাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে আসে, যেখানে তারা দুজনেই শিক্ষার্থী। এই আনন্দশিহরিত অভিজ্ঞতার তিনমাস পর "বর্ষার গাঢ়, মৃত্যু-গভীর, অবসাদ তার মনে সঞ্চারিত হয়", তন্দ্রার জড়িমায় মনে হয় জীবন নিয়ে এত আস্ফালন, উদ্বেগ, ব্যস্ততা, এসব কিছু নিরর্থক, শেষ পর্যন্ত মানুষের ভবিতব্য—'উদাসীন অন্ধকার।' কিন্তু নায়কের এ মনোভাব সাময়িক। লতিকার সঙ্গে প্রতুলের প্রেম আরও ঘনিষ্ঠ হয়। প্রতুল একটা সাধারণ রিসার্চ পেপার করে জার্মানী যাবার বৃত্তি পায়।

সে লতিকার প্রেমের জন্য যাওয়া বাতিল করতে চায় আর লতিকা কেঁদে বলে, তাহলে সে সারাজীবন অপরাধী হয়ে থাকবে। এই অতিপরিচিত ভাবালুতার সঙ্গে বৃষ্টির তাৎপর্য, বা বিস্তৃত বর্ণনা একেবারেই অন্বয়হীন। 'অরণ্যপথ' গল্পেও এ ত্রুটি আরও স্পষ্ট। এর মূল প্রসঙ্গ, মালবাবু রামপদবাবুও তার পাগল মেয়ে নিয়ে। গল্পের বক্তা ও তার বন্ধু বিমল প্রথমে ভেবেছিল রামপদ নিষ্ঠুর হয়ে মেয়েকে শিকলি দিয়ে গাধাবোটে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখেন। কিন্তু, তা ঠিক নয়। রামপদর বক্তব্য তারই পাপে মেয়েটি পাগল হয়েছে। কিন্তু সে পাপ কি, পরিস্থিতি কি লেখক তা আমাদের জানান নি। কিন্তু গল্পের বক্তা অতি সহজেই বুঝে ফেলল এবং প্রাকৃতিক অরণ্যের সঙ্গে মানুষের মনের তুলনা করে বলল, "সে অরণ্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু মনে হইল মানুষের মনের অরণ্য রহস্য বিভীষিকায় তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।" ফ্রয়েড প্রভাবিত এই বক্তব্য একালের ঠিকই (তুলনীয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ') কিন্তু তার বিন্যাস উপযুক্ত হয় নি। তাছাড়া, বক্তার সঙ্গে তার বন্ধুর কিভাবে পরিচয় হল সে বিস্তৃত বিবরণ একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। অসুস্থ মেসবন্ধু বিমল ঘোষকে নিয়ে নদীপথে ঢাকাযাত্রার ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার কাব্যিক অংশকে লেখক, অনুমিত হয়, বলপূর্বক তত্ত্বের উদাহরণে রূপায়িত ক'রে, কাব্যের, কাহিনীর, সাম্প্রতিকতার নানা দাবী মেটাতে গেছেন, কিন্তু সফল হন নি। বরং 'মহানগর' গল্পটি প্রেমেন্দ্রের কৃতিত্ব অনেকাংশে রক্ষা করেছে। গ্রামের মেয়ে চপলা শ্বশুরবাড়ী থেকে নিখোঁজ হয়ে স্থান পায় বেশ্যাপল্লীতে। বাবার সঙ্গে নৌকায় কলকাতায় এসে রতন ঘটনাক্রমে দিদির দেখাও পেয়ে যায়। রতন দিদিকে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু দিদির নিরুপায়ত্ব সে বুঝতে না পেরে ভীষণ বেদনা পায়। এই বেদনার পটভূমি কলকাতা মহানগর যে ' সবকিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।" কিন্তু কেন এই রোমান্টিক প্রত্যাশার অপমৃত্যু তা নিয়ে প্রেমেন্দ্র চিন্তা করতে চান না। এই প্রত্যাশার অপমৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে 'অমোঘ' গল্পে। বিনয় ও নলিনীর প্রেম পরিণতি পাবার পূর্বেই বিনয়কে ডাক্তার হিসেবে দুর্গম প্রদেশে যেতে হয়। নলিনীর বিয়ে হয়, সে বিধবা হয়। পনের বছর পর ফিরে নলিনীর অপমৃত, শুচিবায়ুগ্রস্ত, অকাল প্রৌঢ় অস্তিত্ব দেখে সে চমকে যায়। বিনয়কে দেখে তার মধ্যে আজ আর বিশেষ কোনো আবেগ জাগে না। হয় তো লেখক বলতে চান, সংস্কারাচ্ছন্ন বাংলার বদ্ধ পরিবেশে নারীত্বের এই বিকৃতি অনিবার্য ; 'অমোঘ' নামে তা বুঝি ইঙ্গিত দিয়ে যায়। আর এই অপমৃত্যু থেকে ফেরার কথা এসেছে 'ভূমিকম্প' গল্পে। বিপত্নীক শশাঙ্ক জানে, মালতী কর্তব্যনিপুণ কিন্তু স্বচ্ছন্দ নয়, তাই নানা সন্দেহ মনে আসে। একদিন ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে মালতী তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে, অস্ফুটস্বরে বলে—"আমরা তো একসঙ্গে আছি।" শশাঙ্কর

সমস্ত মন এই আত্মসমর্পণ ও নির্ভরতায় গুঞ্জন ক'রে ওঠে আনন্দে। কিন্তু ভূমিকম্প থেমে গেলে মালতী আবার আড়ষ্ট হয়ে যায়। ঈষৎ কষ্টকল্পিত এই কাহিনী মারফৎ লেখক হয়ত এটাই বোঝাতে চান, মধ্যবিত্ত জীবনের প্রচলিত রুটিনে আবেগ নিত্য শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই সেই আবেগকে সরস ও অব্যাহত রাখতে মাঝে মাঝে জীবনে ভূমিকম্পের প্রয়োজন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূমিকম্প' গল্পে অবশ্য এরকম কোনো বক্তব্য নেই, সেখানে মনস্তত্ত্বের জটিলতার চিত্রণই লেখকের প্রধান লক্ষ্য।

"একাধিক মননমূলক গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র দাম্পত্য জীবনকেই আশ্রয় করেছেন এবং যে সমস্ত মনোবিকার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান রচনা করে, তারই সংকেত দিতে চেয়েছেন।"১৮ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য অত্যন্ত সংগত। এই সূত্রে আমরা 'নিশীথ নগরী' গল্পগ্রন্থের 'স্টোভ' গল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। ভীরু শশিভূষণ ভালবেসেছিল সহপাঠিনী মল্লিকাকে। কিন্তু বিবাহের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলে, বাসন্তীকে বিয়ে করতে হয় যে মল্লিকা প্রসঙ্গ জানত। দীর্ঘদিন পরে মল্লিকা তাদের বাড়ি এসেছে, স্টোভ জ্বালিয়ে বাসন্তী খাবার বানাচ্ছে। দুটো নারীর উত্তপ্ত আবেগকে জলন্ত স্টোভের সামনে লেখক উপস্থিত করেছেন। মল্লিকা সেই বিপজ্জনক স্টোভের কাছে এসে শশিভূষণকে বলে—যদি সেটা ফেটে যায় 'তাহলে ভয়ানক একটা কেলেঙ্কারী হয় না?' আর বাসন্তী শ্বশুরবাড়ীতে বারবার মল্লিকা প্রসঙ্গ শুনে ভাবত : 'এই স্টোভটাই তার শেষ মুক্তির পথ'। 'কেউ কিছু জানবে না, কিছু বুঝবে না, কোনো অপরাধ কারুর গায়ে লাগবে না। সবাই জানবে শুধু একটা দুর্ঘটনা হল।' কিন্তু আজ বাসন্তী ভাবে—না, মল্লিকার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সে নিজেকে নাটকীয়ভাবে অপদস্থ করতে চায় না। প্রেমেন্দ্রের সংযত লেখনীর গুণে স্টোভ এখানে অপূর্ব ব্যঞ্জনাসঞ্চারী হয়েছে। 'কুয়াশায়' গল্পের আশ্রয় অসামাজিক প্রেমের সংকীর্ণ পথে আত্মপ্রকাশ ও প্রতারণা। অল্পবয়সী বিধবা রাঁধুনি সরমাকে ভালোবেসে ফেলে নরেন। দুজনে গৃহত্যাগের কালে সরমা যখন ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে জানতে পারে দেশে নরেনের স্ত্রী ও ছেলে আছে তখন সে জোর ক'রে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। তারপর আশ্রয় না পেয়ে, শীতের রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ছোট্ট একটি পার্কে একটি দোলনার ওপর আত্মহত্যা করে। গল্পের উপস্থাপনা বড় গল্প ধরণের হলেও খারাপ নয়। সমাপ্তিতে লেখকের বর্ণনা সুন্দর। 'সংসার সীমান্তে'ও অসামাজিক প্রেমের সার্থক গল্প। পটভূমি বেশ্যালয়, পাত্রপাত্রী চোর ও বেশ্যা। খদ্দেরের প্রতীক্ষায় থাকা রজনীর ঘরে সিঁধেল চোর অঘোর দাস ঢুকে পড়ে আর ভোরবেলা রজনীর টাকা-পয়সা চুরি ক'রে পালায়। এক দুপুরে অঘোর এলে রজনীর চেঁচামেচিতে লোক অঘোরকে প্রচণ্ড মার দেয়, কিন্তু পুলিশের নাম শুনে তারা পালায়। অগত্যা রজনীই তাকে ঘরে তুলে শুশ্রূষা করে।

ঝগড়াঝাটির মধ্য দিয়ে দুজনের মধ্যে টান সৃষ্টি হয়। একদিন অনেক টাকা চুরি ক'রে অঘোর এলে রজনী তাকে চুরি ছেড়ে দিতে বলে। অঘোরও অন্য দেশে গিয়ে ঘরসংসার করার স্বপ্ন দেখে। একদিন সামান্য কয়েকটি টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে শিশুর মত কাঁদে, চুরি ছেড়ে দেবার শপথ করে। কিন্তু তার এই কাতরতা কাকে প্রভাবিত করবে? সে পাঁচ বছরের জন্য জেলে যায়, আর রজনী হতাশ নয়নে ব্যর্থ প্রতীক্ষা করে। সামাজিক নিয়মের যান্ত্রিকতা কিভাবে সংসারসী গল্পের এই দুই পুরুষ ও নারীর সংসারে অনু-প্রবেশে অন্তরায় হয়ে দেখা দিল, এই বেদনা গল্পে সুন্দর রূপ পেয়েছে। তবে, ও হেনরীর একটি বিখ্যাত গল্প 'পুলিশ ও উপাসনা গীতি' বড্ড বেশী মনে পড়ে যায়।

'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থের 'মাটির ঢেলা' কবিতায় মৃত্তিকাশ্রয়ী মানুষের প্রতি প্রেমেন্দ্র সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এইভাবে—"ভুখ দিলে যে, বুক দিলে যে,/দুখ দিতে সে ভুললো না,/মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে—পাছে।" এবং 'ডাকছে তোরে তোর মাটি,/টানছে আপন স্নেহ শীতল কোলে।" "আমি কবি যত কামারের" নামক বিখ্যাত কবিতায় কবি পরিশ্রমী মানুষের কবি হতে চেয়েছেন, 'কর্মের ও ঘর্মের' কবি হতে চেয়েছেন। বোধকরি এই ভাবনাই 'মৃত্তিকার' (১৯৩৫) গ্রন্থকারের মনে এসে থাকবে। তবে গল্পের আলোচনায় দেখা যাবে তিনি মৃত্তিকাশ্রয়ী শ্রমজীবী মানুষের যথার্থ রূপকার হতে পারেন নি, অন্ততঃ এক্ষেত্রে। 'মৃত্তিকা' নামের গল্পটির ধরন বড় গল্পের। এক মাড়োয়ারী তার নরম জমিতে দোতালা মাডব্যারাক গড়ে ভাড়া দেয়। বিজয় আর শ্রীপতি দুজনেই ছদ্মনামে এখানে ভাড়াটে হয়। বিজয় শ্রীপতির বৌকে নিয়ে পালানোয় ধরা পড়ে জেলে যায়, শ্রীপতি বৌকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এ বাড়ীতে একদিন বিজয় শ্রীপতিকে চিনে ফেলে গলা টিপে খুন করতে যায়, কিন্তু সহসা ভূমিকম্পে ব্যর্থ হয়। লেখক এ গল্পে মাড়োয়ারীটির অর্থলিপ্সা দিয়ে সূচনা ও সমাপ্তি করলেও বিজয় শ্রীপতির কাহিনীতে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, অথচ সূচনা থেকে মাড়োয়ারী বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটেদের যেকোনো ধরণের সম্পর্কজনিত একটা কাহিনী গড়ে ওঠার আভাস ছিল এতে ছোটগল্পের একমুখিনতা স্পষ্টতঃ নষ্ট হয়েছে। লেখক গল্পের শেষে বলেছেন—"মাটির ইতিহাস বৈচিত্র্যহীন—যেখানে দিনের পর দিন পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু সেখানেও বিস্ময় আছে। এক টুকরো কাঠা-আস্টেক পরিমাণ জমির ইতিহাসে একদিন একটি নয়, দুটি নয়, একসঙ্গে তিনটি অসাধারণ, অতিবিরল, কল্পনাতীত ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল।" গল্প তিনটি কিন্তু মোটেই অসাধারণ বা অতিবিরল নয়, পরস্পরের সঙ্গে অনিবার্য ভাবে সম্পৃক্ত ও নয়। দ্বিতীয়তঃ' ভূমিকম্পে মাটির দোতলা ধূলিসাৎ, সব কটা লোক মারা গেলেও শ্রীপতি বেঁচে গেল এটা অবিশ্বাস্য। হিন্দুস্থানী জীবনের চিত্র এসেছে

'মোটবারো'তে। ঘমণ্ডি কেমন করে ঘোড়ার সহিসের চাকরী পেয়ে, পশুপক্ষী নিয়ে থাকত, তার বিবরণ আছে। ছাগল-চরানী দুলারীর সঙ্গে এগার বছর কেটে যায়। দুলারী একদিন দেশে তার ভাই বৌ-এর কাছে যেতে চাইলে ঘমণ্ডি শেষপর্যন্ত রাজী হয়। কিন্তু ঘরে ফিরে দুলারীকে টাকা পয়সা বাসন চুরি করতে দেখে ঘমণ্ডি ক্ষেপে যায়, দুজনের মারামারি হয়। গল্পের নাম থেকে অনুমান হয়, লেখক দেখাতে চান মোট বারো বছরেই দাম্পত্য সম্পর্ক কিভাবে বিষাক্ত পরিণতি পায়। কিন্তু এতদিন পরে কেন ও কিভাবে দুলারী চোর হল, ঘমণ্ডি তাকে কেন ভাই বৌ-র কাছে যেতে দিতে চায় না, এসব সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় না, তাই গল্পটি তাৎপর্য হারিয়ে নিছক বিবরণধর্মী হয়ে থাকে! অন্যান্য গল্পে আশ্রয় করা হয়েছে মধ্যবিত্তজীবন। কোথাও দেখানো হয়েছে স্বামীর অতিরিক্ত শাসনে স্ত্রীর কাতরতা (প্রতিবেশিনী), কোথাও দাম্পত্য ভুল বোঝাবুঝি কিন্তু ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা (সুরু ও শেষ) ইত্যাদি। বাদবাকী গল্পগুলি কি বক্তব্যে, কি বিন্যাসে নিতান্তই গতানুগতিক।

'ধুলিধুসর (১৯৩৮) গল্পগ্রন্থের নামকরণ থেকে অনুমিত হয় লেখক ধুলিধুসরিত জীবনের নানা দিককেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চান। 'সিদ্ধকল্প' গল্পে দেখা যায় প্রেসমালিক ধরনীধরের ছেলে অরুণ ব্যবসাবুদ্ধিতে আরো অসাধারণ। দূরাত্মীয় দরিদ্র সুরেনের বাড়ীতে ছেলের যাতায়াত ও তার মেয়ের রান্নার প্রশংসা শুনে ধরণী ভেবেছিলেন ছেলের বিয়ে দেবেন ওখানে। কিন্তু ছেলে যখন অর্থ ও মর্যাদার ভিত্তিতেই তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধনবান দেবকিশোরের মেয়েকেই বিয়ে করবে ভাবে তখন ধরণীও অবাক হয়ে যান। সিদ্ধির এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মুখোমুখি হতে তিনিও অস্বস্তি পান। 'যাত্রাপথ' গল্পের সদ্যবিবাহিত মলিনা ও অজয় ট্রেনে করে চলেছে। অজয় চায় মলিনা তাকে আঁকড়ে থাক, সব সময় তার কথা চিন্তা করুক। না হলেই নানা কথার ইঙ্গিতে বিব্রত করে। এদিকে কুলীকে প্রাপ্যের কম দিয়ে স্বামীর ঝগড়া, পান দোকানে অচল দোয়ানী চালিয়ে উল্লাস মলিনাকে পীড়িত করে। ট্রেনে এক মহিলা যাত্রিকে দেখে অজয় গল্প করে কিভাবে সে তার গয়নার বাক্স নিয়েও তাকে নিয়ে গেল না। স্বামীর এই মনোবৃত্তি জেনে মলিনার মন খারাপ হয়ে যায়। আর অজয় ভাবে—" এই নিতান্ত সাধারণ মেয়েটিকে চিরজীবনের বোঝারূপে বহন করায় কোন উন্মাদনাই নাই।" 'সহযাত্রিনী' গল্পে ট্রেনের কামরায় এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার প্রকৃত সম্পর্ক আবিষ্কার নিয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয়টাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। 'শরতের প্রথম কুয়াশা' গল্পে প্রায় যৌবনান্ত অথচ খ্যাত সামাজিক অতসীর সঙ্গে এক ছবির প্রদর্শনীতে নিরঞ্জনের আলাপ ও শরতের এই প্রথম কুয়াশা ভরা দিনে তাদের সম্পর্কটা ব্যঞ্জনাময় হয়ে

উঠতে থাকে। বাড়ী ফিরে অতসী ভাবে —"নিরঞ্জনের দৃষ্টি বিভ্রম কাটাবার সুযোগ সে দেবে না।" মধ্যবিত্ত দাম্পত্য -সম্পর্ক বর্ণনায় প্রেমেন্দ্রের নিপুণতা আলোচিত গল্প-গুলি ছাড়াও অমীমাংসিত, ভীড়, ভগ্নশেষ প্রভৃতি গল্পে আছে। 'অমীমাংসিত' গল্পে প্রকাশের কাগজপত্রের আড়াল থেকে তার পুরাতন প্রেমপত্রের বাণ্ডিল পড়ে গিয়েছিল অপর্ণার হাতে। প্রকাশ সারাদিন অস্বস্তিতে ছিলো অপর্ণার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। কিন্তু বাড়ী ফিরে অপর্ণার ভাবান্তর না দেখে সে মর্মাহত হয় (তুলনীয় সুরু ও শেষ)। 'শৃঙ্খল' গল্পের পিতৃহীন ভূপতি প্রশ্রয় ও পীড়নের মাঝে 'অক্ষম বিদ্রোহে বিকৃত' হয়ে উঠেছে। সে মাকে পীড়ন করে, স্ত্রীর প্রতি প্রভুর মত আচরণ করে তৃপ্তি পায়। একদিন স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় গিয়ে ভূপতি হঠাৎ হল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী পালাচ্ছিল কিন্তু স্ত্রী বুঝতে পেরে যথাসময়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসে। এরপর থেকে তাদের কথা বন্ধ, কিন্তু তবু কেউ কাউকে ত্যাগ করে নি। এ সম্পর্কে লেখকের ভাষা— "তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ।" এই মান-সিক বিকারের পরিচয় আরো মিলবে "থার্মোফ্লাস্ক ও চীনের যুদ্ধ' গল্পে। একটা রঙচটা থার্মোফ্লাস্ক নিয়ে প্রশান্ত তার বিগত স্ত্রীর স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকে। এই প্রসঙ্গেই এসেছে এলাহাবাদের অরুণের কথা যার সঙ্গে তার স্ত্রী মায়ার প্রেম ছিল। অরুণের ঈর্ষা ও তৎপ্রসুত দু একটি কার্যকলাপ এ গল্পে বর্ণিত। এই সঙ্গে চীনের ওপর জাপা-নের বোমারু আক্রমণ, জনসাধারণ আহত হওয়া ইত্যাদি বর্ণনা মাঝে মাঝে মূল কাহি-নীতে 'রিলিফ' আকারে এসেছে। কিন্তু এ সব প্রসঙ্গ গল্পটির ক্ষেত্রেও অবান্তর। "ভগ্নশেষ" গল্পে ও দাম্পত্য জীবনের বিকার বর্ণিত। অমরেশ ডাক্তারের সঙ্গে সুরমার প্রেম থাকলেও কাঠের কারবারী জগদীশবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়। সুরমা-সান্নিধ্যের দুর্বার আগ্রহে সে বনাকীর্ণ অঞ্চলেই ডাক্তারখানা খুলে বসে, ওদের বাড়ী নিত্য আসা যাওয়া করে। অমরেশ সুরমাকে দিনে দিনে বাড়ী ছাড়ার জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু হঠাৎ জগদীশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের অপেক্ষা করতে হয়। আরোগ্যের সময়টুকু অপেক্ষা করতে করতে তাদের প্রেমের আগুন নিভে যায়। গল্পটি লেখকের সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে। দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাভাবিক দিকের একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতির কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে 'ভীড়' গল্পে। কাহিনী এখানে নিতান্তই সামান্য। বিজয় তার স্ত্রী, দিদি, জামাইবাবুর সঙ্গে মধুপুরে চলেছে। বিজয়ের স্ত্রী করুণা মেয়েদের কামরায়। বিজয় স্ত্রীকে একটু একা পেতে চেয়েছিল, কিন্তু না পাওয়ায় ট্রেনের ভীড়, আত্মীয়দের ভীড়, বিজয়ের মনকে বিরক্ত করে তোলে। এক স্টেশনে করুণার জন্য

জলের অভাবে লেমনেড নিয়ে এসেও লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পাত্র ভেঙ্গে যায়, গাড়ী ছেড়ে দেওয়ায় কোনক্রমে ট্রেনে উঠতে পারে। এজন্য তার মনে দুঃখ জাগে। এই অনুভূতি নিয়ে অবশ্যই সুন্দর গল্প হয়, যেমন মানিক বাবুর 'স্বামী স্ত্রী' গল্পের শেষাংশ। যাহোক, এ গল্পগুলির আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ধুলিধুসর বাস্তব জীবন বলতে যে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়কে বোঝায়, তা কিন্তু এখানে নেই, উচ্চ মধ্যবিত্তের দু-এক ধরণের মানসিক সঙ্কটকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন, কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতকে স্পষ্ট করে ধরতে চান নি।

তাঁর 'কুড়িয়ে ছাড়িয়ে' গল্পগ্রন্থেও (১৯৪৬) বাস্তবতার চেহারাটা বড়ই এলোমেলো। 'চুরি' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত সমাজ পরিস্থিতির প্রতিফলন স্পষ্ট। স্কুল-মাস্টার প্যারীমোহনবাবুর দুর্দশা চরম সীমায় যায় কিন্তু তারই অপদার্থ ছাত্র রাখালের ব্যবসা ফেঁপে ওঠে। লজ্জা নিবারণ ও শাক ভাতের ব্যবস্থার কারণে অনেক ইতস্ততঃ করে প্যারীমোহন রাখালের কাছে তার ছেলেকে পড়ানোর প্রার্থনা করেন। সে প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে রাখাল প্যারীবাবুকে নিজের বর্ধমান প্রতিষ্ঠা দেখিয়ে তাকেও ব্যবসায় নামতে বলে। কিন্তু সরল সত্যাশ্রয়ী প্যারীবাবুর কথাটা পছন্দ হয় না। কিন্তু বাড়ীতে ফিরে দেখলেন সামাজিক অবনমনের ছায়া পড়েছে তার নিজসংসারেও। দুষ্টচরিত্রের পুলিনবাবু মেয়েকে শাড়ী উপহার দিয়েছে, ছোট ছেলেটা পাশের বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তবে, স্তম্ভিত প্যারীবাবু ছেলেকে মারতে গিয়েও না মেরে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে গল্প শেষ করে প্রেমেন্দ্র এই ক্রমাবনমনের চিত্রটাই মাত্র তুলে ধরেন, সামাজিক তাৎপর্য সন্ধানের ব্যাপারটায় গুরুত্ব দেন না। আর, 'চুরি নামটাও গল্পের ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে ওঠে না। নামকরণে এই অনিবার্যতার অভাব 'পিস্তল' গল্পেও দেখা যায়। গল্পের পটভূমি ও চরিত্র অবশ্য বদলেছে। লালমোহন রেলকন্ট্রাকটরের আড়কাঠি গোরাদের মেয়ে চালানদার, ঘুষে বকশিষে সমস্ত স্টেশন তার হাতের মুঠোয়। অভাবেরা জ্বালায় বিনা টিকিটে ঝুলতে ঝুলতে লোকে চাল এনে ব্যবসাদারকে দেয়, কখনো ধরা পড়ে, কখনো মরে। স্টেশনের ছেলে নিধিকে লালমোহন পছন্দ করে না, কারণ সে তার অনেক অভিসন্ধি বানচাল করে দিয়েছে। এরকম স্টেশনের মেয়ে শ্যামা ফিরে আসে গর্ভবতী হয়ে। শ্যামা লালমোহনের কাছে রাত্রে যায়, চাল নিয়ে আসে। কিন্তু নিধের৽ দেওয়া পিস্তল সে কোনদিনই ব্যবহার করে না বলে তা নিছাৎই জড় খেলনা থেকে যায়। বিবরণ সর্বস্ব এই গল্পে নতুন জগতের পরিচয় ছাড়া সুনির্দিষ্ট বক্তব্য কিছু নেই। গ্রামের টুকরো ছবি এসেছে ইদানিং চলচ্চিত্র খ্যাত 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে। মাঝে মাঝে গ্রাম্য পরিবেশ অনেকেরই ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। সেই কল্পনা

ভিসারকে লেখক অনর্থক 'আবিষ্কার' বলেছেন। তেলেনাপোতা সেই কাল্পনিক গ্রাম, সেখানে এখনও বাঘ আছে, প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দিরের ভগ্নাংশ আছে। পুকুরঘাটে মাছ ধরতে গিয়ে হয়ত দেখা হয়ে যাবে কোনো তরুণীর সঙ্গে, হয়ত আশ্রয় নিতে হবে তাদেরই বাড়িতে। মেয়েটির অন্ধ মা নিরঞ্জনের কাছে তার মেয়েকে বিয়ে করার কথা পেয়েছিল। হয়ত সাজা-নিরঞ্জনকে শেষে স্তোকবাক্য দিতে হবে। তারপর শহরে ফিরে বিস্মরণ। সমকালীন শহরলুব্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ অসহায়তার কাব্যিক আবেদনটি সুন্দর, কিন্তু এই পুরো 'হয়ত'র ওপর গল্পটিকে দাঁড় করানোয় আবেদন গভীর হয় নি। 'পটভূমিকা' গল্পের পটভূমিও গ্রাম। বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে গ্রামে আসা যুবক অমলের চিন্তার মধ্য দিয়ে লেখক গ্রামের পুরনো ইতিহাসটা (শ্রমণভিক্ষু সঙ্ঘারামের যুগ, রাঘব সামন্তের জনপদ পত্তন, জমিদার নরহরি চৌধুরীর কথা) বলতে চান। কিন্তু জমিদারী ব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণীসম্পর্ক ও জীবনযাত্রার পরিচয়ের কথা না ভেবে লেখক শুধু সমাজব্যতিরিক্ত ব্যক্তি মানুষ ও তার কার্যকলাপকে রেখেছেন (যেমন নরহরির বিষ থেকে ওষুধ তৈরীর চেষ্টা, মন্দিরে বলি বন্ধ রাখা, দেশের দুর্গতিতে আত্মগ্লানি ও আত্মহত্যা, জমিদার বংশে বৈষ্ণব-দীক্ষা)। অমল যেমন গ্রাম সম্পর্কে ভাবালুতায় মুগ্ধ হয়ে সাঁওতাল জীবনের 'সহজ স্বাভাবিক শ্রী'তে মুগ্ধ হয়ে তাদের মধ্যে বসবাসেই গ্রামীণ মানুষের মুক্তি খোঁজে, গ্রামের ছেলে মোহিত তেমনি গ্রামজীবনে বীতস্পৃহ। তার চোখে শহরে শুধুই "অন্তহীন আকস্মিকতা" ও "চমকের অফুরন্ত মিছিল"। বলা বাহুল্য এই দুই ধারণার অসঙ্গতি কম নেই। তাই, বিভূতিভূষণ যে অর্থে পল্লীমুগ্ধ প্রেমেন্দ্র তা নন। আবার তারাশঙ্করের গ্রাম অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি, গভীরতা বা সামাজিক তাৎপর্য অন্বেষণ—এর কোনোটাই প্রেমেন্দ্রের মধ্যে তুলনীয় মাত্রায় নেই।

সামাজিক লেখকের পক্ষে নিছক অদ্ভুতত্বের ওপর ঝোঁক বিড়ম্বনা মাত্র। 'এক অমানুষিক আত্মহত্যা' গল্পে স্বামীস্ত্রীর রুচির বৈপরীত্য ও অবনিবনার সমাধান করতে হয় যখন একটা বাঘকে এনে বা অন্যভাবে, (যেমন—ভূমিকম্পে) তখন একথার প্রমাণ মেলে। পঞ্চাশের দশকে প্রেমেন্দ্রের রচনায় এই ঝোঁক বারেবারে চোখে পড়ে। (অবিস্মরণীয় 'ঘনাদা' সিরিজও তাই, পরাশরের হাস্যকর রহস্যসন্ধানও তাই।) 'সবুজে সোনায়' গল্পগ্রন্থের 'ময়ূরাক্ষী' গল্পের পতঞ্জলি রায় এমনই এক অদ্ভুত চরিত্র। এক ভাটিখানায় পতঞ্জলির সঙ্গে গল্পের বক্তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। পতঞ্জলি জীবিকায় কনট্রাক্টার, মাঝে মাঝে অন্তর্ধান করে লেখক জানালেও এই ভাটিখানার অন্তরালে তার লেখার আস্তানায় কিছু লেখার কোনো ব্যাপার লেখক দেখান নি। পতঞ্জলির ছিল অভ্রের কারখানা, সে দিন-রাতে কুলি-কামিন মজুরদের সঙ্গে কাটাত। এক কুলি মেয়েকে নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়,

প্রেমিকের হাত ফসকে যাওয়া গুলিতে পতঞ্জলির পায়ে আঘাত লাগে। তারপর কারখানা বিক্রী ক'রে সে এখন কন্‌ট্রাকটার। পতঞ্জলি বলে, জীবনের কদর্যতাকেই একমাত্র সত্য বলে মানতে সে নারাজ, বরং সে পরিবেশে স্বেচ্ছায় থেকে সে সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখতে চায়। কিন্তু তার বহু জনপ্রিয় 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসটি সেই সৌন্দর্যের স্বপ্নে কতখানি সফল তার কথা এ গল্পে নেই। পতঞ্জলি আবিষ্কার করতে চেয়েছিল কুলি কামিনরা কি নিয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু গল্পের কোথাও সে জীবন-স্বরূপের পরিচয় নেই। আসলে শৈলজানন্দ তার কয়লাকুঠির গল্পের অভিজ্ঞতাকে যতটুকুও ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার অভাবে প্রেমেন্দ্র তা পারেন নি। 'যখন বাতাসে নেশা' গল্পেও আমরা তাৎপর্যহীন প্রেমের আর একটি চিত্র পাই। বাসব ও কমল ভালবেসেছিল রমাকে কিন্তু বিয়ে হয় রমা ও কমলের মধ্যে। তিনবছর পর বাসব অনেক খুঁজে এক গ্রামে এসে দেখে কমল ঘানি চালাচ্ছে। কিন্তু কেন, তার বিশ্বাস্য কারণ লেখক দেননি। কমল বাসবকে পরের দিনই ফিরে যেতে বলে। বাসব রমার সন্ধান দাবী করে। তারপর শ্মশানে এসে সব সমাধান হয়। রমা যে কেন বলেছিল, "আমায় দূরে কোথাও নিয়ে চলো। এতো দূরে যেখানে নিজের কাছ থেকেও লুকিয়ে থাকা যায়" তা বোঝা যায় না। ফলে চরিত্রগুলোর ভাবালুতা ও খেয়ালীপনাই বড়ো হয়ে ওঠে। 'নানারঙে বোনা' (১৯৫১) গল্পগ্রন্থের 'কেশবানন্দের তিরোধান' গল্পের কেশবানন্দ চরিত্রটি পূর্বকথাই প্রমাণ করে। (পূর্বে 'পুতুল ও প্রতিমা'র অন্তর্গত) দুঃসহ দারিদ্র্যে কেশবানন্দ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সেজে লোক ঠকিয়ে অনেক অর্থ উপার্জন করেছে। একদিন যখন স্ত্রী সুলতা এসে তার পায়ে পড়ে ছেলেকে বাঁচানোর প্রার্থনা করল (না চিনে), তখন সে বিচলিত হয়ে ভক্তদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই সুলতার দরিদ্র কুটিরে যায়। সে অর্থ সাহায্যের আদেশ দিয়েছিল কিন্তু কুশল সংবাদ নিতে পারে নি। তারপর জন্মদিনের বিশাল আয়োজন উপেক্ষা করে গিয়ে দেখে ছেলেটা মারা গেছে। সুলতার নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেয়ে সে ফিরে আসে। বিবেকদংশনে কেশবানন্দ আবার সুলতার স্বামী হয়ে ফিরে আসে। এই ধরণের কাহিনী অনেকেই অবলম্বন করেছেন। তবু যে লেখক এটি বেছেছেন তার কারণ, অ-সাধারণ ঘটনা ও চরিত্রে লেখকের ও পাঠকের কৌতূহল। কাল্পনিক খালাসী জীবন নিয়ে লেখা হয়েছে 'কল্পনায়'। স্ত্রীকে মৃত্যুশয্যায় রেখে মালেক জাহাজের কাজে যেতে চায় নি। মনের দুঃখ চেপে সে জাহাজে যায় ও আত্মহত্যা করে। কিন্তু, গল্পের মধ্যে এই মালেকের অন্য একটি মহিলার বাড়ীতে রাত্রে যাবার ব্যাপার কেন? 'রাত্রির ছায়ায়' বিকারগ্রস্ত মনের গল্প। মুমূর্ষু নীলিমার কাছে পৃথিবী ও জীবনের মাধুর্য বেড়ে গেছে, সে বাঁচার কথা ভাবছে। ননদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতা

তার মনে ঈর্ষা আনে, স্বামী একদিন চুম্বনেচ্ছা পূর্ণ করেনি বলে মৃত্যুর আগে মনো-বিকারে স্বামীর শরীরে রোগ সংক্রমণ করিয়ে দিয়ে যেতে চায়। এ ব্যাপারে প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিশ্চয়ই শিক্ষা নিতে পারতেন যে (যেমন, কুষ্ঠ-রোগীর বৌ) জীবনের সর্বব্যাপী বিকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ভাবালুতা-বর্জিত লেখনী ছাড়া তা নিয়ে গল্প লিখে সাফল্য অসম্ভব। 'নিশীথনগরী' গল্পটি তো পুরোপুরি কল্প-কাহিনী। গল্পের বক্তা ও দর্শনপ্রিয় মাতাল মৃত্যুঞ্জয় ভাঁটিখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে দেখে এক অতি সুন্দরী অলংকৃতা মহিলা গভীর রাত্রে হাঁটছে, একজন পুরুষ কিছু দূর থেকে অনুসরণ করছে। এরাও এগিয়ে যায়। পরে জানা যায় মহিলাটি মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, কল্পনা করে স্বামীবন্ধুর লোলুপতার। ঘুমিয়ে পড়লে সব ঠিক হয়ে যায়।

১৯৫৫ তে প্রকাশিত 'শ্রাবণে ফাগুনে' গল্পগ্রন্থে-ও একই মানসিকতার ফসল রয়েছে। ছোটো ছোট স্মৃতিচিত্র, বক্তব্য নেই, সমকালীন উপলব্ধি নেই, মাঝে মাঝে অদ্ভুতত্বই যাদের বাঁচায়। 'শুক্তি' গল্পের নায়িকা অফিস চাকুরে, স্বামী রাতুল শিল্পী। স্বামী চায় স্ত্রী চাকরী ছেড়ে দিক, স্ত্রী রাজী হয় না। অগত্যা রাতুল চলে যায়। পাঁচবছর পর দূর দেশে রাতুলের খোঁজ করতে এসে নায়িকার সঙ্গে ভিন্ন ঘরণীর আলাপ হয়, সে ঠিক করতে পারে না তার আন্তরিকতায় সাড়া দিয়ে সে দিনটা থেকে যাবে, না চলে যাবে? 'মেয়েটি' গল্পে আছে এক গণ্ডগ্রামের ষ্টেশনে এক গরীব মেয়ে অরুণাভের পায়ে পড়ে পয়সা চাইছিল, কিন্তু পয়সা দেবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় অরুণাভ মেয়েটিকে ধরে রাখে। তারপর ঘন্টাখানেক পরে ষ্টেশনে গাড়ী থামলে মেয়েটিকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে নিরুপায় হয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ে। মেয়েটির পরম নির্ভরতায় জামা আকড়ে ধরা তার মনে বাৎসল্য জাগায়। কলকাতায় ফিরে নিজের মেয়েকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরে অকারণ আশঙ্কায়। 'একটি পুরোনো স্মৃতি' এক অক্ষম অহংকারের সাধারণ গল্প। শেলফ পরিষ্কার করতে গিয়ে শিবকালী দের বইটা পেয়ে লেখকের মনে পড়ল একবার সাহিত্যসভা ফেরৎ গাড়ী বিকল হওয়ায় ড্রাইভারের বিশেষ অনুরোধে তার ঘরে যান ও শ্বশুর শিবকালীকে দেখেন। শিবকালী লেখককে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নিজের লেখা বইটা দিলে লেখক ভদ্রতা ও সংযম হারান না। পরে একটা মিথ্যে প্রশংসাপত্রও পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই গল্প নিতান্তই গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করা ছাড়া আর কি করতে পারে? বরং 'নতুনবাসা-'র ভাবনাটা সুন্দর। নোংরা বাড়ী ছেড়ে অমল যাচ্ছে পাকা কোঠা বাড়ীতে। একটা নোংরা পরিবেশ ছেড়ে একটা সুন্দর পরিবেশে যাওয়া নিয়ে নায়কের চিন্তা ও স্বপ্ন এসেছে এ গল্পে। কিন্তু যখন সে আবার কোনো

নিরুপায় পরিবারের এই ছেড়ে যাওয়া ঘরে আসা নিয়ে ভাবনা এড়িয়ে যেতে চায় ("কি দরকার এসব ভাবনার—ভেবে সে কি করতে পারে"), তখন নায়কের এই পলাতকচিন্তা বোধহয় বাস্তবতা-সন্ধানী কোনো পাঠকেরই ভালো লাগবে না। নায়কটির মতো লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গেও কথাটি না উঠে পারে না।

কল্লোলযুগের ইতিবাচকতার বিশিষ্ট শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিশ্চয়ই বলতে হবে। তিনি উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে সংযত, ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার পক্ষপাতী তা প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী'তেই প্রমাণ হয়। রবীন্দ্রকথিত মিথুন প্রবৃত্তি বা দারিদ্রের আস্ফালন কোনো ব্যাপারেই তাঁর আতিশয্য নেই। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, প্রেমেন্দ্র যেহেতু অভিজ্ঞতার ঘাটে ঘাটে ঘুরেছেন তাই তাঁর রচনায় বাংলাসাহিত্যের সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি শৈলজানন্দের সঙ্গে অংশত তুলনীয়। কয়লাকুঠির কালো অঞ্চলে শৈলজানন্দের কৌতূহল অল্পকালেই স্তিমিত হয়ে যায়. প্রেমেন্দ্র আরও বেশ কিছুকাল এই বৈচিত্রপিয়াসী মনকে টিঁকিয়ে রাখেন। বুদ্ধদেব অত্যন্ত আঙ্গিক-প্রিয়, অচিন্ত্য অনেকটা সমগোত্রীয়, শৈলজানন্দ আঙ্গিক-উদাসীন, সমকালীনদের মধ্যে মধ্যপন্থী বোধহয় একমাত্র প্রেমেন্দ্রকেই বলা যেতে পারে।

কল্লোল যুগের যে ধারাটা জীবনমুখী, পরিবেশের চাপে নৈরাশ্য পীড়িত হয়েও দুর্মর আশা বুকে নিয়ে প্রেমেন্দ্র দাঁড়াতে পেরেছিলেন সেই ধারাপথে। 'গোটা মানুষের মানে' খোঁজার এই চেষ্টা প্রথম যুগের কিছু কিছু গল্পে নিশ্চয়ই আছে। যেমন আছে, কর্মে আর ঘর্মে যাদের জীবন, সেই নীচের তুলার তুচ্ছ মানুষকে সাহিত্যের আঙ্গিনায় আমন্ত্রণ জানানো। এই সূত্রেই তিনি জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে চেয়েছেন হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায়। '১৯ ননকোঅপারেশন আন্দোলনে প্রেমেন্দ্রের ভেসে যাওয়ার কথা ২০ অচিন্ত্য বললেও গ্রন্থালয় প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ডের তথ্যপঞ্জীতে তা নেই। তবে উপেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বাংলার কথা' সম্পাদকীয় মারফৎ 'ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তেড়ে গায়ের ঝাল মেটানো'র কথা আছে। একথা কতদূর সত্য জানিনা। তবে প্রেমেন্দ্রের গল্পে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় মেলে না। অনেককাল পরে তিনি বলেছেন—"আমার নিজের কথা বলতে পারি যে সেদিনকার রুশ সাহিত্য ভাষাও ভঙ্গীর সমস্ত অন্তরাল তুচ্ছ করে হৃদয়মনের একেবারে গভীরে গিয়ে স্পর্শ করেছিল।"২১ এবং অন্যত্র গোর্কীর আত্মজীবনী পড়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন—"সমস্ত পৃথিবীর রঙ সেই লেখাই এক মুহূর্তে বদলে দিলে। জীবনের সত্যকে এমন নির্ভীক নিরাসক্ত মন নিয়েই ত খুঁজে খুঁজে ফেরা যায়। —সবচেয়ে আমার কাছে যা মূল্যবান, তাই

পেলাম এবার, পেলাম সাহস।"২২ কিন্তু তাঁর গল্পে এই অধ্যয়নের, এই অর্জিত সাহসের পরিচয় কতটুকু ? অচেতনভাবে শৈলজানন্দ এবং সচেতনভাবে যুবনাশ্ব ও প্রেমেন্দ্র গোর্কীর মতই নীচের তলার মানুষদের নিয়ে ২/৪টে গল্প লিখেছেন ; কিন্তু রুশ সাহিত্য বিশেষ গোর্কীর সাহিত্যের মর্মোদ্ধার তাঁরা কি আদৌ করতে পেরেছিলেন ? সে দুরন্ত জীবনপ্রেমের সঙ্গে সত্যি সত্যি তুলনা করতে গেলে বলতেই হয় প্রেমেন্দ্রের জীবনপ্রেম প্রেমের অভিনয় মাত্র (কথাটা আরও অনেক সতীর্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।) বুদ্ধদেব কথিত প্রেমেন্দ্রের ক্ষণকালীন Proletarian Phase নেহাৎই কথার কথা !

প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন—"মানুষের জীবন তার সাময়িক প্রাকৃতিক সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে জড়ানো। স্খলনে পতনে, আশা নৈরাশ্যে, গ্লানি মহিমায়, সার্থকতায় ব্যর্থতায় যেমন তা নিজের যুগে নিজের দেশে দেখেছি তা যতখানি সাধ্য আমার গল্পগুলিতে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি।"২৩ কিন্তু তা কতদূর তিনি পেরেছেন ? তাঁর পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য জীবনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক তরঙ্গ তো কম ওঠেনি। সাহিত্যে যদি সমাজের দর্পণ হয়, সাহিত্যের চরিত্র (এবং সাহিত্যিক) যদি একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষ হন, তাহলে তো পরিপ্রেক্ষিতের সংকট ও সংঘর্ষকে তুলে ধরতেই হবে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র কি তা করেছেন ? যৌবনের কিছু গল্পে তিনি নৈর্ব্যক্তিক দৃঢ়তায় সমাজের সংকীর্ণতা, নীচতা, কু-সংস্কার, উৎপীড়ন সম্পর্কে চাপা ক্ষোভকে শিল্পরূপ দিলেও আন্তরিকতা কালক্রমে প্রথাপালনে পর্যবসিত হয়েছে। 'পরবর্তীকালে গ্রামজীবনের পুরোনো মূল্যবোধ ও শ্রেণীসম্পর্কগুলো যখন দ্রুত ভাঙছে তখন প্রেমেন্দ্র গ্রাম সম্পর্কে ভাবালুতায়, কাল্পনিক বেদনায় আবদ্ধ (যেমন, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, পটভূমিকা প্রভৃতি গল্পে)। কিন্তু বিভূতিভূষণের মুগ্ধতা সত্ত্বেও অনুপুঙ্খ দর্শনের ক্ষমতা তাঁর নেই, তারাশঙ্করের গ্রাম অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও অর্জন তাঁর নেই, কারণ তিনি শহর প্রেমিক। আবার শহর কলকাতা যখন মিটিং মিছিলে লাঠি রাইফেলে গ্রেপ্তারে মৃত্যুতে বেকারীত্বে অবক্ষয়ে আত্মত্যাগে আশাবাদিতায় চরিত্র পেয়েছে, প্রেমেন্দ্র সেখানে স্বকীয়া বা পরকীয়া প্রেমের সূক্ষ্ম টানা পোড়েনের বা অদ্ভুত চরিত্রের গল্প শুনিয়ে খুশী করতে আগ্রহী। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর তাঁকে প্রজ্বলিত করেনি ('চুরি', 'পিস্তল' নেহাৎই গল্প, স্বাধীনতা সংগ্রাম তাকে আত্মদংশন এনে দেয়নি, যে প্রেম সম্মুখপানে চলবার প্রেরণা দেয় সে প্রেমের গল্প তিনি লেখেন নি তাঁর শৃঙ্খল, অমীমাংসিত, যাত্রাপথ, সহযাত্রিণী প্রভৃতি গল্পে আছে দাম্পত্যের বিকার। হয়তো তা কালপ্রভাবিত, কিন্তু প্রেমেন্দ্র তার কার্যকারণের পথে চলেন না। আর, অন্য ধরণের প্রেমের গল্পে আকাশ থেকে পড়া নৈরাশ্য, কিন্তু তা উত্তীর্ণ হবার পথ সৃজনের দায়িত্ব লেখক

অনুভব করেন না। ফলে, সামাজিক সত্যাবলীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, সমাজ কাঠামোর সত্যিকারের পরিবর্তনে উদাসীন হয়ে শুধুই গল্প বলে যান। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—"প্রেমেন্দ্রই কল্লোলের সেই লেখক "যার অসঙ্গতি অল্প।'২৪ কিন্তু অসঙ্গতির অল্পতা তাঁর সামাজিক দৃষ্টির প্রখরতা বাড়াতে সাহায্য করেনি। তাই "মানুষের দুঃখ বেদনাকে মূল্য প্রদানের চেষ্টায় সাফল্যের পরিমাণ অত্যল্প হতে বাধ্য। এককালে জীবনচর্চার বহুচারিতায় "বিষয়বস্তুর মধ্যে সত্যনিষ্ঠা" যেটুকু ছিল, কালক্রমে কলকাতার বাস, চলচ্চিত্র থেকে আকাশবাণী হয়ে সরকারী প্রাইজের পথে উত্তরোত্তর বৈষয়িক সাফল্য তাঁর দৃষ্টিতে আবিলতা বাড়িয়েই দিয়েছে এ নিয়ে কোনো সাহিত্যিক সংকট তিনি অনুভব করেছেন ব'লে জানি না। এ ঘটনা, আর যাই হোক, অচ্যুত গোস্বামী কথিত 'নিরঙ্কুশ সততা' নয়। ফলে 'বেনামী বন্দরের' মুটে মজুরের কবি 'ধূলিধূসর' 'মৃত্তিকা' ঠিকমত চিনতে ও চেনাতে না পেরে মধ্যবিত্ত জীবনের 'নিশীথ নগরী'র অন্তহীন জটিলতার কুম্ভীপাকে তলিয়ে গিয়ে তৃপ্ত রইলেন, মাঝে মাঝে 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' 'নানারঙে বোনা' কিছু আহত মানুষ কিছু ঘনাদার কল্পবিজ্ঞান বা কিছু পরাশরের অপরিণত রহস্য কাহিনী সরবরাহ ক'রে পাঠক সমাজকে ব্যস্ত রাখলেন। সত্যিই, এ বড়ো আক্ষেপের কথা।

॥ খ ॥

গল্পগঠনের দিক থেকে প্রেমেন্দ্র বহু প্রশংসিত শিল্পী। কল্লোলের অতি তরুণ লেখকদের রচনায় সাধারণভাবে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ছিল, জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও আদর্শ ছিল উপরিতলশায়ী। প্রেমেন্দ্রের রচনায় দ্বিতীয় ব্যাপারটি থাকলেও উচ্ছ্বাস প্রায় ক্ষেত্রেই বর্জিত হয়েছে। তাঁর 'মিতভাষিতা', 'সংযত, ঘনপিনদ্ধ এবং তির্যক, ঈর্ষাযোগ্য সতর্কতা' সঙ্গতভাবেই পরবর্তীকালের খ্যাতিমান গল্পলেখক ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।২৫ সতীর্থ বুদ্ধদেব তরুণ বয়সেই প্রেমেন্দ্রের এই 'মিতভাষিতার' প্রশংসা করে 'প্রগতি'তে লিখেছিলেন— "প্রেমেন্দ্রবাবু ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল—ইংরাজিতে যাকে বলে Compact style বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ।" (অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) বর্তমান কালের ছোট গল্পের এই অন্যতম সর্তটি পালিত হওয়ায় প্রেমেন্দ্রের প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী' আজও পড়তে ভালো লাগে, তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বেনামী বন্দরে'র কয়েকটি গল্প আজও বারংবার পাঠে আনন্দ দান করে। দ্বিতীয় আর একটি বৈশিষ্ট্য অনেকেই উল্লেখ করেছেন। সেটি হল—গল্পে কবিত্ব। নারায়ণবাবুর ভাষায়, তাঁর গল্পে 'কাব্যিক ব্যঞ্জনা', 'কবিতার মতোই সংযম ও সতর্কতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাতে কবিত্ব গল্পকে ছাপিয়ে যায়নি। কল্লোলের

অনেক লেখকই যুগপৎ কবি ও গল্পলেখক হলেও এ ব্যাপারে প্রেমেন্দ্রের কৃতিত্ব যথেষ্ট। উদাহরণ :—ক) "যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁটে থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ ক'রে ভেসে যাচ্ছে।" (তেলেনাপোতা আবিষ্কার)। গ্রামীণ অসহায়তায় প্রতিমূর্তি সরল মেয়েটি এই সাজা-নায়কের সাজানো আশ্বাসে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই বর্ণনায় কাব্য থাকলেও আতিশয্য নেই। পরবর্তীকালের আর একজন গল্প লেখক ঠিকই বলেছেন, প্রেমেন্দ্রের "গল্পগুলির কাব্যধর্মিতা ভাষার আড়ম্বরের মধ্যে নয়, ভাষার সুকঠোর সংযমের মধ্যে।"২৬ তবে কোনো কোনো গল্পে কবি প্রেমেন্দ্র প্রভাব ফেলেছেন গল্পকারের ওপর। যেমন— ক) 'ছায়ার মত জড়িয়ে থেকেছে ওদের জীবনের সঙ্গে,—ছায়ার মতই কোন দাবী না রেখে, কোনো দাগ না ফেলে।' (যখন বাতাসে নেশা) খ) 'আমার সঙ্গে চল মহানগরে,—যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মত, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে আর চূড়ায়, অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।' (মহানগর)

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রেমেন্দ্রর রোমান্টিক গল্পে 'লিপিকা'র প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।২৭ পরে শ্রীগোপিকানাথ রায় চৌধুরীও কথাটি সমর্থন করেছেন। 'শুধু কেরাণী' প্রসঙ্গে কথাটি নিশ্চয়ই প্রযোজ্য। যেমন—'তখন পাখীদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল, মুখে করে উৎকন্ঠিত হয়ে ফিরছে। তাদের বিয়ে হল। —দুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলেমেয়ের।" পরে 'মহানগর' গল্পেও এই ধরনটি মেলে। "আমার সঙ্গে চল মহানগরে,—যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মত, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে আর চূড়ায়, অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মত মানবাত্মার।" তবে, 'লিপিকার' এই ভঙ্গিমা প্রেমেন্দ্রের বেশী গল্পে নেই।

বুদ্ধদেব বসুর মনে হয়েছিল প্রেমেন্দ্রের ও অচিন্ত্যের ভাষার স্বভাব লুকোচুরি, দুজনেরই অদ্ভুত দুর্বলতা সাধারণ বর্তমানকালের ক্রিয়া ব্যবহারে।২৮ কথাটা অংশত সঠিক। যেমন—

(ক) 'তারপর জোর করে মেয়েটি বাঁধতে যায়। ছেলেটি এবার খুব রাগ করে, ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বলে ··· ।' (শুধু কেরাণী)

(খ) "বাড়ীতে ঢুকিতে না ঢুকিতেই আবার রমার কান্না শোনা যায়—সে কান্না অসহ্য। তার শিশু কন্যার সাত বৎসরের সমস্ত ইতিহাস কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিয়া যায়।" (শবযাত্রা)

এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া চলে, তবে এটা "অদ্ভুত দুর্বলতা" বলাটা সঙ্গত নয়, কারণ অন্য ধরণের বাক্য ব্যবহারও বিস্তর।

প্রেমেন্দ্রের গল্পে সাধু ও চলিত দুয়েরই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরাণী' চলিতে লেখা আবার 'নিশীথনগরী' গল্পগ্রন্থের একটি বাদে সব কটিই চলিতে লেখা। ক্রমশ চলিত ভাষা ব্যবহারেই তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক চোখে পড়ে। বাক্য ব্যবহারে প্রেমেন্দ্র প্রয়োজনানুগ বলা চলে। তাতে অতি সংক্ষিপ্ত ("স্কুলে যাই।") বাক্য আছে, আবার বিস্তৃত বাক্যেরও অভাব নেই। তবে সাধু ভাষাতেই সম্ভবত বিস্তৃত বাক্য বেশী। বাক্যে ব্যঙ্গ বা শ্লেষ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, তাও যতটা ব্যক্তিগত ততটা সামাজিক নয়। তবে এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ক্রমশ কমেছে।

ছোটগল্পে সিদ্ধির অন্যতম প্রকরণগত উপাদান বোধহয় উপমা ও চিত্রকল্প, তার প্রয়োগ। এ সম্পর্কে একজন সমালোচক সুন্দর বলেছেন—

"The vital necessity in technique is to make the symbol belong so naturally to the cause of the story, to its furnishing or to the behaviour of its inhabitants that it does not announce itself as manufactured, imported, a false way of underlining some meaning."২৯

কবি ও গল্পকার প্রেমেন্দ্রের ছোটগল্পে উপমা চিত্রকল্পের বেশ কিছু সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। দু-একটি উদাহরণ দিই।

(ক) "লাবণ্য দেখিল। দেখিয়া বুঝি অজ্ঞাতে একটু শিহরিয়া উঠিল। শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দিয়া জরার মূর্তি যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।" (হয়তো)

লেখক এখানে একটি বাক্যের মধ্যে একটি উপমাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বৃদ্ধা পিসিমার প্রতি আরোপ করেছেন।

(খ) "পরের ও নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁচিয়ে অতিকষ্টে বিজয় দরজার দিকে এগুতে থাকে। চার হাত দূরের দরজাটা যেন চার যোজন পথ, পায়ের দুর্ভেদ্য অরণ্যের ভিতর দিয়ে।" (ভীড়)

স্বল্প পরিসর উপমার মাধ্যমে পরিবেশের রুদ্ধতা ও দীর্ঘতা সুন্দরভাবে বর্ণিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় প্রেমেন্দ্র অরণ্যের উপমা ব্যবহার করতে ভালবাসেন।

(গ) "বিনা টিকিটে চাল কিনতে যাওয়ার হিড়িকে রেল-লাইন দিয়ে মানুষের যেন বন্যা বয়ে চলেছে রাতদিন। সেই বন্যায় ভেসে যাওয়া পুরুষ মেয়ের পাল হরদম এ স্টেশনে

এসেও ভিড়ছে, বিছিয়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের ওপর বনের ভাঙা ডালপালার মত।" (পিস্তল)
(ঘ) "কণ্ঠস্বরটি ছেঁড়া জুতোর নতুন ফিতার মতো একেবারে বেখাপ্পা।"

(বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে)

বিগতযৌবনা গণিকার যৌবনাবশেষ ওই কণ্ঠস্বরেই মাত্র বিদ্যমান বলে তা অন্যান্য সাজসজ্জা আচরণের সঙ্গে বিসদৃশ ঠেকছে। এর সম্পর্কেই অন্যত্র তিনি বলেছেন—

(ঙ) "নিশাচর শ্বাপদের মতো তার অন্ধকারের সঙ্গেই আত্মীয়তা।" তার জান্তব লুব্ধতা এতে প্রকাশ পাচ্ছে। চরিত্রটির নঞর্থক অংশকে মুহূর্তেই আলোকিত করে তোলে এই উপমা।

তবে, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতির তুলনায় প্রেমেন্দ্রের রচনায় উপমা, উৎপ্রেক্ষাদির ব্যবহার কম। গল্পের ভাষাকে অতিরিক্ত অলংকৃত করা অপেক্ষা স্বভাবোক্তির আশ্রয়ে বর্ণনীয় বিষয়কে রাখার দিকেই তাঁর ঝোঁক। কোনো কোনো গল্পে তিনি সমগ্র বিষয়ের ওপর একটি উপকরণকে প্রতীক আকারে ব্যবহার ক'রে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা আনেন। এই সূত্রে 'স্টোভ' গল্পটির উল্লেখ করা যায়। স্বামীর পূর্ব প্রণয়িণীর আগমনে স্ত্রীর অসন্তোষ দেখে যখন বলা হয় "স্টোভটা অনেক দিনের পুরোনো, খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ফেটে যেতে পারে" তখন দাম্পত্যে বিপজ্জনক দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। আবার গল্পের সমাপ্তিতে আমরা পাই—"স্টোভটা কিন্তু সত্যি যেন উন্মাদের মতো হিংস্র গর্জন করেছে। উঠে কোথাও সরে যাবার কথাও বাসন্তী ভাবতে পারে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে চাবিটা খোলবার চেষ্টা করে। কিছুতেই—কিছুতেই আজ কোনো দুর্ঘটনা যে ঘটতে দেওয়া যায় না।" এই বর্ণনায় স্ত্রীর নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম, সব কিছু বিধ্বস্ত না হতে দেওয়ার দুর্মর ইচ্ছা, মধ্যবিত্তসুলভ শোভনতা ও সমন্বয়স্পৃহা ইত্যাদি চোখে পড়ে। প্রতীকের এই সর্বাত্মক ব্যবহার গল্পটিকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। তবে এরকম উদাহরণ বিরল।

ছোটগল্পের পরিসর অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, গঠনরীতি বিশেষধরণের, সে জন্যই এর সূচনা ও সমাপ্তি বিশেষ তাৎপর্য ও অতিরিক্ত মনোযোগ দাবি করে। প্রেমেন্দ্রের রচনায় এর সার্থক উদাহরণ বিস্তর পাওয়া যাবে। প্রথমে সূচনাংশ দেখা যাক—

(ক) 'তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল, মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে। তাদের বিয়ে হল।—দুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলেমেয়ের।' (শুধু কেরাণী) প্রেমেন্দ্র এখানে নিতান্ত সাদাসিধে অনুল্লেখ-যোগ্য মানুষের কথা বলেছেন বলেই নামোল্লেখ না করে 'তাদের' বলেছেন। পাখিদের

সঙ্গে নবদম্পতীর তুলনায় তাদের বাসাবাঁধার কথা এসেছে। এখানে জীবন উদাসীনতা নেই, অথচ জীবনের কাব্যাংশ কর্তিত হয় নি।

(খ) 'ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, ভর সন্ধেয় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন? খোল না, কতক্ষণ দাঁড়াব।' প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক শিল্কের একটা শাড়ি সেলাই করছিল।" (বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে) গল্পের সূচনায় বাড়িউলীর দরজা ধাক্কানো এবং বেগুন নামের মেয়েকে ডাকা থেকে সহজেই গণিকা-পরিবেশটি অনুমান করা যায়। আর বোঝা যায় পারস্পরিক সম্পর্কের হৃদয়হীনতাও। প্রদীপের আলোয় দরজা বন্ধ করে স্ত্রীলোকটির শিল্কের শাড়ি সেলাই তার যৌবনান্তে গণিকাবৃত্তির অসাফল্যই প্রকট করে। বোঝা যায় এই বেদনাই লেখকের উপজীব্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই অংশের অতি সুন্দর আলোচনায় বলেছেন—গল্পটি in the very initial sentence বক্তব্যে প্রবেশ করেছে।... কত অল্প উপকরণে কত বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা যেতে পারে—এই দুটি বাক্যই তার প্রমাণ।"৩০

কয়েকটি গল্পে গল্পলেখা, বলার কথা তুলে তিনি গল্প শুরু করেছেন। যেমন—

(ক) 'তা যদি বল, তা হলে সব গল্পেরই আরম্ভ মাঝখান থেকে, খেয়াল মত জোর করে হঠাৎ আরম্ভ।' এইভাবে দুটি অনুচ্ছেদ গল্পবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার পর তৃতীয় অনুচ্ছেদে শুরু হয়েছে এভাবে—'বনমালী ঘোষ সেই পুরোণ রঙচটা দোশালাটি গায়ে দিয়ে ভাঙা দেউড়ি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়—এই ধর গল্পের আরম্ভ।'

(খ) 'গল্পটা আরম্ভ নেহাৎ মন্দ হয় নাই।
লিখিয়াছিলাম—
বর্ষার রাত্রি কিন্তু জ্যোৎস্না আছে।' (সুরু ও শেষ)

(গ) 'সত্যই এ কাহিনী লিখিতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যে দুটি মানুষকে লইয়া এই গল্পের আয়োজন, তাহাদের কথা লিখিবার অধিকার আমার নাই। .... তবু একবার বলিবার চেষ্টা করিয়া দেখি।'

(সংসার সীমান্তে)

কতকগুলি গল্পে বর্ণনা বা মন্তব্যের পর গল্পের শুরু হয়। যেমন—

(ক) 'অরণ্য স্বপ্ন' গল্পে একপৃষ্ঠাধিক অরণ্য বর্ণনার পর সেখানে কর্মসূত্রে বাসিন্দা পুরন্দরকে উপস্থিত করা হল। গল্পটি পড়লে বোঝা যায় পুরন্দরের জীবনে

অরণ্যের বাঞ্ছিত ভূমিকা আছে। "সে অরণ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে যায় কিন্তু সভ্যতার অভ্যাস পরিত্যাগ করে না।"

(খ) 'বৃষ্টি' গল্পে বৃষ্টির দীর্ঘ বর্ণনার পর নায়কের মানসিকতা বর্ণনা করা হয়েছে।

(ন) 'শকুন্তলা গল্পে বাঙালি সম্পর্কে ১২ পংক্তি মন্তব্যের পর গল্পের শুরু এইভাবে —'তারা জাতিতে ছিল কেরানী।'

কতকগুলি গল্পে নিতান্ত অনুচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে চরিত্রের সক্রিয়তার মাধ্যমে গল্পের শুরু হয়, যেটা পরে একটা বহুল প্রচলিত রীতি হয়েছে।

(ক) 'সকাল বেলা করুণা নিজে হাতেই চা নিয়ে এল।' (জনৈক কাপুরুষের কাহিনী)

(খ) 'চোরের মত পা টিপিয়া প্রকাশ সিড়ি দিয়া উঠিল অনেক রাত্রে।'

(অমীমাংসিত)

(গ) 'ধরণীধর গাঙ্গুলীর উচ্চহাসি বাইরের ঘর থেকেই শোনা গেল।'

(সিদ্ধকল্প)

এবার আসা যাক সমাপ্তির আলোচনায়। নাটকীয়, আকস্মিক পরিবর্তন-সমন্বিত সমাপ্তিকে রথীন্দ্রনাথ রায় তাঁর গ্রন্থে 'বক্রোক্তি-জীবিত' এবং কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে জীবনবোধে সমাপ্তিতে 'ব্যঞ্জনাগর্ভ' বলেছেন।৩১ প্রেমেন্দ্রের গল্পে দ্বিতীয় ধরণটিই বেশী। যেমন—

(ক) 'বিশাল আকাশ নক্ষত্রের আলোয় যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারি তলায় তার মনে হলে, এই মৌন সর্ব্বংসহা ধরিত্রী যে যুগযুগান্তর ধরে বারবার আশাহত, ব্যর্থ হয়েও আজও প্রতীক্ষার ধৈর্য হারায় নি।' (পুন্নাম)

এখানে নিজপুত্রের মধ্যে স্বার্থশূন্যতা দেখতে না পাওয়া, তার জন্য চুরি করার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যে তবুও স্বপ্ন দেখতে ছাড়ে না এ কথাটাই গল্পের আবেদনকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

(খ) "তাহারা পরস্পরকে আর বুঝি ছাড়িতেও পারিবে না। প্রেম নয়, তাহার চেয়ে তীব্র, তাহার চেয়ে গভীর উন্মাদনাময় বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। সে শৃঙ্খল তাহারা ছিড়িলে বাঁচিবার সম্বল কি রহিল—জীবনের আশ্রয়? পরস্পরের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকিতেও চায়।" (শৃঙ্খল)

অবক্ষয়িত মধ্যবিত্তের ভারসাম্য বজায়ের, সংকট এড়িয়ে যাওয়ার ঝোঁকটি যে লেখক সুন্দর ক'রে পাঠক হৃদয়ে সঞ্চার করে দিতে পারেন এখানে তাঁর পরিচয় মেলে।

প্রেমেন্দ্রের গল্পের শেষে নাটকীয়তা, আকস্মিকতা কম। তবু কয়েকটি সার্থক উদাহরণ দেওয়া যাক।

(ক) 'হঠাৎ ঘন্টার শব্দে জেগে উঠি।

চমকে দেখি,—

ঘুমোচ্ছিলাম……

টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলাম।'

(ভবিষ্যতের ভার)

স্কুলের শিক্ষাসংস্কারে আগ্রহী শিক্ষক অর্থনৈতিক ও স্কুল-পরিবেশের চাপে নিজেই একদিন অজান্তে ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়লেন, ধাপে ধাপে শব্দ ব্যবহারে নাটকীয় ভাবে জীবনের এই ট্র্যাজেডী বর্ণনা ক'রে লেখক নিঃসন্দেহে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

(খ) 'সাগর সংগম' গল্পে দীর্ঘ সংস্কারশাসিত দাক্ষায়ণী অনিরুদ্ধ মাতৃভাবে গণিকার মেয়ের সৎকার কালে জিজ্ঞাসিত হ'য়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন, তারপর নিজের মেয়ে বলেই পরিচয় দেবেন ঠিক করে বলেন –"সব তো মুখে বলতে নেই ! দিন লিখে দিচ্ছি।" ঠিক এখানেই গল্পটি শেষ হওয়ায় দাক্ষায়ণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফল্গুধারার মতো নাটকীয় হয়ে ওঠে।

(গ) "দাঁতে দাঁত চে.প অসীম অসহায় হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে, 'চল—' এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।"

(বিকৃতক্ষুধার ফাঁদে)

বিগতযৌবন গণিকা বেগুনের দুর্মর বাঁচার ইচ্ছাই এখানে নাটকীয় দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়ে পাঠককে স্তম্ভিত করে দেয়।

প্রধানত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হলেও প্রেমেন্দ্রের গল্পে সংলাপের বৈচিত্র্য কম নেই। দু-চারটি উদাহরণ দিই—

নিম্ন মধ্যবিত্ত বিরক্ত মাতৃকন্ঠ ঃ

(ক) চুপ কর শীগগীর, ফের চীৎকার করলে দরজা খুলে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।' (পুন্নাম)

(খ) এক দজ্জাল কর্তা ঃ 'হুঁঃ কাজ হচ্ছে। গুষ্টির শ্রাদ্ধ হচ্ছে। চোদ্দ পুরুষের পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে—গেলা হবে।' (মৃত্তিকা)

(গ) 'আমার মেথড্ হচ্ছে কি জানেন—খালি লেখা, ছেলেদের খালি লিখতে দেওয়া।'

(ভবিষ্যতের ভার)

(ঘ) "বেটা আমার কাছে এসেছিস্ কেন। ঘরে বসে বসে এক মনে ডাক গে যা আপনি হবে, আমি কি করতে পারি।" (কেশবানন্দের তিরোধান)

'গ' তে এক শিক্ষকের 'ঘ' তে এক সন্ন্যাসীর আপাত সরল কথার অন্তরালে ধূর্ততা প্রকাশ পাচ্ছে। তারা কেউই নিজ বৃত্তিতে আন্তরিক নয়।

(ঙ) 'হু শরীর ত বেজায় খারাপ ; তাই বাদলা রাতে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলি—না ? নে ছেনালি রাখ। কোথায় তোর ঘর ?' (সংসার সীমান্তে)

(চ) 'কেন যাব না, কেন ? দে আমার দু-মাসের ভাড়া দে, গাণ্ডে পিণ্ডে যে দু-মাস গিলেছিস সে খোরাকি দে। আমি খেঁদিকে এনে বসাব। ঘাটের মড়া! দু-দুমাসে একটি মিনসে ওর চৌকাঠ মাড়াল না ওর আবার রোখ!' (বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে)

'ঙ' ও 'চ' তে পাচ্ছি নীচের মহলের ভাষা—প্রথমটি এক চোরের, দ্বিতীয়টি এক বেশ্যা-বাড়িউলির।

ছ) এক দারোয়ানের হিন্দী সংলাপ : 'যো রোজ ভাড়া লেগা ওহি রোজ দেনে হোগা।' (মৃত্তিকা)

(জ) এক ছাগলচরানো বৌ : 'দুখিয়াকে ত দুরোজ ন দেখলু হম ; কাঁহা গইল বা ?' (মোট বারো) তবে প্রেমেন্দ্রের লেখায় এরকম সংলাপ বিরল।

শিক্ষাভিমানী এক শিক্ষকের ইংরাজী মিশ্রিত বাংলা সংলাপ :

(ঝ) 'কি জানেন সিগারেটের ? Have you any idea ? কলে মিনিটে হাজার হাজার তৈরী হয়ে আসছে— untouched by hand' (ভবিষ্যতের ভার)

তবে, এই উদাহরণগুলো যতটা ভাষাবাহিত হয়ে চরিত্র পরিচায়ক, ততটা গল্পের ক্ষেত্রে অনিবার্য বলা যায় না। ছোটগল্পে সংলাপের গুরুত্ব যে অনেক এ বিষয়ে তর্কের কিছু নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে গল্পগুলি প্রধানত সংলাপ-নির্ভর নয়, দ্বিতীয়ত তাতে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য অনেক কম। ব্যতিক্রম হিসেবে দু একটা উদাহরণ দিতে চাই যেখানে নির্দিষ্ট সংলাপ গল্পের বিষয়-বয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

(ক) 'না, ভয় পাব কেন ? ফাটবার হলে ও স্টোভ অনেক আগেই ফাটত।'' (স্টোভ)

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, স্টোভ এখানে দাম্পত্য সংকটের প্রতীকের হিসাবে কাজ করছে। তাই স্ত্রীর এই সংলাপ থেকে তাদের স্বামীস্ত্রী সম্পর্কের কঠিন টিঁকে থাকাটা প্রকাশ করছে এবং সেটাই গল্পের ভাব-বস্তু হওয়াতে সংলাপটি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।

(খ) 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে সাজা জামাই যখন মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—''না মাসিমা, আর পালাব না তখন' বঞ্চিত মেয়েটির অসহায়তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

(গ) 'সাগর সংগম' গল্পের প্রারম্ভে সংলাপে দাক্ষায়ণীর পরিচয় দজ্জাল গিন্নি হিসেবে, কিন্তু পরে মাতৃস্নেহের' স্ফুরণে সেই দাক্ষায়ণীর মুখেই শোনা যায়—'বলেছিলুম না, আমার হাত ছাড়িয়ে যাসনি। আর যাবি একলা!' কিংবা 'আচ্ছা, আজ যদি 'তাকে ফেলে পালিয়ে যেতুম?' মাতৃস্নেহ জাগরণের গল্পে সংলাপের এই পরিবর্তন ছিল প্রত্যাশিত।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ-ব্যতিরিক্ত বাংলা ছোটগল্পে আঙ্গিকের দিক থেকে সবচেয়ে সিদ্ধকাম শিল্পী হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র।"৩২ কিন্তু সিদ্ধির পরিমাপ হবে কি দিয়ে? গল্পে বিষয় ও, আঙ্গিকের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মেনে নিলেও, বিষয়বস্তু সর্বদাই আঙ্গিকের মর্যাদা রক্ষা করে, বিপরীতটি নয়। কিন্তু বিষয় সম্ভাবনায় যে প্রেমেন্দ্র একদিন 'বেনামী বন্দরে'র তটরেখা আমাদের দেখাতে চেয়েছিলেন, তিনিই যখন দাম্পত্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতহীন কাহিনী রচনা করে ও 'নানারঙে বোনা' কাহিনী মারফৎ পাঠকের গল্প শোনার চিরন্তন আগ্রহকেই মাত্র তৃপ্ত করেন তখন শিল্প-প্রকরণে জরুরী বাঁক নেবার সদাসতর্কতা বা আবিষ্টতার প্রয়োজন যে তিনি অনুভব করবেন না তা বলাই বাহুল্য। সে কারণে তাঁকে 'সবচেয়ে সিদ্ধকাম শিল্পী' বা 'বাংলা-সাহিত্যে ছোট গল্পের রাজা'৩৩ বললে জীবন সচেতন পাঠক সঙ্গত কারণেই বিভ্রান্ত বোধ করবেন।

পঞ্চম অধ্যায় : বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প

।। ক ।।

বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পর তাঁর দীর্ঘদিনের সুহৃদ শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু লিখেছিলেন—"তাঁর পঞ্চদশকী নিরলস সাহিত্যকর্ম এমনিই বহুবিস্তৃত এবং নিয়ত উত্তুঙ্গ, রচনা শিল্পের যাবতীয় শাখাতেই তিনি অনন্য উৎকর্ষের ··· চিরস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন "১ একথা অত্যন্ত সত্য সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে নত মস্তকে একথা স্বীকার করতেই হয় যে "অদম্য একটি জীবনবেগ ছিল তাঁর হৃদপিণ্ডে, শরীরের রক্ত চলাচলে এবং সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় মমতাই ছিল তাঁর এই জীবনবেগ ও রক্ত চলাচলের উৎস।"২ বোধহয় এ কারণেই তাঁর তরুণ বয়সে ঢাকায় যেমন তাঁকে ঘিরে জড়ো হয়েছিল সাহিত্য-প্রেমী তরুণের দল, তেমনি প্রবীণ বয়সে 'কবিতা' পত্রিকা ও কবিতাভবনে প্রবেশাধিকার ছিল তরুণ কবিদের কাছে শ্লাঘার বস্তু। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই বুদ্ধদেব-বসুর নাম "একটি সমুজ্জ্বল অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ। নন-কো অপারেশন, অসহযোগ, সত্যাগ্রহের ঢেউ এসে পৌঁছেছিল নোয়াখালি শহরেও। তেরো বছরের বুদ্ধদেব সাময়িক উত্তেজনায় খদ্দর পরেন ঘরে চরকা রাখেন ইয়ং ইণ্ডিয়া, বাংলার বাণী পড়েন, 'নবযুগের বন্দনা, দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস' নিয়ে কবিতা গল্প লেখেন। একবার শাড়ি জামার বহ্ন্যুৎসবে-ও নেমেছিলেন। কিন্তু ঢাকা চলে আসার পর এই উত্তেজনা কেটে যায়।৩ লোমান হত্যা, বিনয়বসুর ধরপাকড় ইত্যাদি নিয়ে ঢাকার ছেলেদের মধ্যেও উত্তেজনা কম নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সুকুমার কলার পরিমণ্ডলেই মগ্নবিচরণ করতে ভালোবাসতেন।

স্কুল জীবনেই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনা। খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকার পাতা বেয়ে তাঁর কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি ও ঢাকায়। 'প্রগতি' যখন বেরুলো (১ম প্রকাশ ১৩৩৪, আষাঢ়, বুদ্ধদেবের বয়স ১৯) তখনই তিনি আত্মবিশ্বাসের উচ্চ মালভূমিতে, কলকাতার 'কল্লোল' যে আত্মবিশ্বাসকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ কল্লোলে 'রজনী হল উতলা' প্রকাশ হবার আগেই এই পত্রিকায় ১৩৩২, আষাঢ় সংখ্যায় তাঁর সাহিত্য শক্তি স্বীকৃতি পায়। এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নেই।

বুদ্ধদেবের সাহিত্যজীবন উন্মেষপর্বের সুন্দর বিবরণ আছে তাঁর অপূর্ব রচনা 'আমার ছেলেবেলা'য়। দাদামশায়ের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে

অপরিসীম আনন্দের এক অন্তরঙ্গ যোগ রচিত হয়। শার্লক হোমসের গল্প, শেক্সপীয়রের নাট্যাংশ ইত্যাদি শুনতে শুনতে, ইংরাজী রোম্যান্টিক কবিতার ধারায় অবগাহন স্নান করতে করতে জেগে ওঠে স্বপ্নিল এক লেখক। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর চেতনার দ্বার প্রসারিত করে দেয় অনিবার্যভাবে। হয়ত সে কারণেই "যা কিছু নিরানন্দ, অসুন্দর, জীবনবিরোধী, সে দিক থেকে আমি যেন নিজের অজান্তেই চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম, বা চোখে দেখেও মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি নি।"৪ কিন্তু আনন্দের এই আচ্ছন্নতা কিছুটা কেটে গেলে যখন প্রভুপদ গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য বন্ধু, অধ্যাপকদের সাহায্যে তাঁর পরিচয় হল অনিংরেজ সাহিত্যের সঙ্গে—হুইটম্যান, ডুমা, টুর্গেনিভ, হ্যামসুন, বোয়ার, গোর্কী, ইবসেন প্রভৃতির সঙ্গে। এঁদের সাহিত্যের প্রভাবেই বুদ্ধদেব জোর ক'রে অসুন্দরের এবং দেহ চেতনার দিকে ঝোঁকেন। মার্ক্স, ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, প্রভৃতির নবপ্রচারিত চিন্তা নানা প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি যা নিতে চায়, হৃদয় তাকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়। এই সংকট যেখানে এসেছে, সেখানেই তাঁর শিল্পরূপ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ফ্রয়েড পড়ার কালোচিত রেয়াজ ধরা পড়েছে কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৬ এ প্রকাশিত 'অভিনয় নয়' গল্পে। তবে, বুদ্ধদেবের সাহিত্যে দেহচেতনা বা বন্দনা ফ্রয়েড বা অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকদের বিজ্ঞান অনুশীলনের নিস্পৃহ পথ বেয়ে আসে নি। বরং বলা চলে, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ও রুশসাহিত্য, হুইটম্যান এবং লরেন্সের রচনা পাঠ কল্লোলের অনেকের মত তাঁর রচনাতেও বারংবার দেহের দাবীকে ঘোষণা করে। কিন্তু বুদ্ধদেব গোষ্ঠীর জীবন অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি বা গভীরতা ছিল না। তাঁরা শুধু সাহিত্য প'ড়ে দেহচেতনাকে রূপায়িত করতে গিয়েছেন রক্ষণশীল বাংলা সমাজপাটে। ফলে নূতন সাহিত্যে দেহের দাবী নিয়ে সোরগোল উঠলো ঠিকই, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই মহৎসৃষ্টির সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বুদ্ধদেব রোম্যান্টিক লেখক সন্দেহ নেই। তাঁর রোমান্টিকতা কখনো কখনো অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছে সঙ্গতভাবেই। কিন্তু দেশজ স্পর্শের নিতান্ত অভাবে তা একেবারেই নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয়। ম্যাক্সিম গোর্কী মার্সেল প্রুস্ত ও তাঁর অনুগামীদের রচনা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা বুদ্ধদেব ও সমধর্মীদের সম্পর্কে-ও প্রযোজ্যঃ—

"Bourgeois individualistic romanticism, with its penchant for the fantastic and the mystical, does not stimulate the imagination or encourage thought. Divorced from reality, it is built not on convincingness of the image, but almost exclusively on the magic of words,"৫

ফলে, তাঁর রোমান্টিকতা সাময়িকভাবে অসহিষ্ণু ও ক্ষুব্ধ হলেও বিষণ্ণতা ও বিকৃতির শিকার হবার দুর্বলতা চিরকালই থেকে গেছে। উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচারের স্রোতে ভেসে যাবার বাসনা থেকেই তরুণ বুদ্ধদেব লিখেছিলেন—"বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,/দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর" (বন্দীর বন্দনা)। কিন্তু তাঁর জীবনাচরণ ছিল এ ভাবনার পরিপন্থী। জীবনের এক পর্বে সমাজ বিদ্রোহী লরেন্স এবং অন্যপর্বে র‍্যাবোঁ বা বোদলেয়ার-এর রচনায় অতিরিক্ত আগ্রহ তাঁর অসহিষ্ণুতা বা ক্ষোভকে প্রবলতর করতে পারে নি, জীবন বা তার তাৎপর্য অন্বেষণের তীব্র ব্যাকুলতাও তিনি তাঁদের কাছ থেকে 'ধারণ' করতে পারেন নি। শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রদেব বুদ্ধদেবের সাহিত্যে পরিবার, পিতামাতার বিরুদ্ধে, ধনীদের প্রতি শ্লেষ, সামাজিক ছক বা প্যাটার্নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলেছেন। কিন্তু ভাষার অতিরিক্ত চমৎকারিত্বের আড়ালে তা এতই ক্ষীণকণ্ঠ যে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়েও তেমন আশ্বাস যোগায় না। রণেন্দ্রবাবু ঠিকই বলেছেন—এইসব বিদ্রোহের "লক্ষ্য বিশাল সমাজ-জীবন নয়, এমনকি কোনো বিশেষ শ্রেণীও নয়। এদের (চরিত্রের) উত্তেজনা অসন্তোষ, অস্থিরতা, মধ্যবিত্ত বুদ্ধির জন্মগত দ্বিধায় দুর্বল ও স্বল্পায়ু।"৬ কালের সঙ্কটে তা উদ্দামতারহিত হ'য়ে স্থানান্তরিত হয়েছে স্বগতোক্তির স্বেচ্ছা-নির্জনতায়। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যথেষ্ট বাস্তব নয় বলে তরুণ সতীর্থদের আপত্তির সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেও ৭ আমরা দেখি তিনি আশৈশব রবীন্দ্রভক্ত। আর, রবীন্দ্র বা শরৎচন্দ্রীয় বাস্তবতাকে অতিক্রমের যোগ্যতা তাঁর ছিল না।

'প্রগতি' পত্রিকায় বুদ্ধদেবের সূচনা কবিতার সঙ্গে ধারাবাহিক উপন্যাস 'চৌরঙ্গী' দিয়ে।' তাঁর প্রথমজীবনের গল্পে চরিত্রের মনন ও ক্রিয়ার অসঙ্গতি বড়ই বেশী। চরিত্রের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সাবালক চিন্তার একান্তই অভাব। 'প্রগতি'র ১ম গল্প 'ঝুট' (ভাদ্র ১৩৩৪)-এর কবি নায়ক অজয় সংসারের হীনতা ও মানসিক দারিদ্র দেখে প্রেমিকা অরুণাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায় 'প্রাণের সন্ধানে, মুক্তির আনন্দের নেশায়।' অজয় একই সময়ে অরুণার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে বলে— 'আরে ছোঃ।' কিন্তু যক্ষ্মায় অরুণা মারা গেলে প্রেমের ইমেজ লালন করে। 'টান' এর নায়ক পার্থও কবি, বেকার, বোহেমিয়ান। প্রেমের ব্যর্থতার জ্বালায় বেশ্যার ঘরে গিয়ে তার মনে হয়—"ওর ঐ এলিয়ে দেওয়া দেহটি যেন রক্তে মাংসে গড়া নয়। ঐ চাঁদের আলোরই একটি চিলতে, জ্যোছনায় জালে বোনা একটি স্বপ্ন।' বেশ্যার মধ্যে প্রেমিকাকে আরোপ বা আবিষ্কার করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে সে ক্ষেপে যায়। 'ছায়াচিত্রে'র নায়ক ট্রেনের কামরায় যেতে যেতে স্বপ্ন দেখে প্রেমিকা পালিয়ে এসে চুমু খাচ্ছে। 'পদ্মার ঢেউ' এর

বুড়ো এম, এ, পাশ করেও টুাশন সম্বল, পরি ট্যাক্সী ড্রাইভার, পান্না চোর, বেণু প্রুফ রীডার। আর রাস্তার ভিখারী পদ্মা তাদের বারোয়ারী এজমালী রক্ষিতা। এই পদ্মা কিন্তু ভালো ইংরিজি জানে, সিগ্রেট খেতে খেতে বলে How delightful. লেখকের মধ্যবিত্ত গণ্ডীর বাইরে যাবার ব্যর্থতা এখানে স্পষ্ট। প্রগতিপর্বে প্রেম-ই তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয়।

তাঁর নায়ক নায়িকা অনেকেই কবি বা শিল্পী বা সাহিত্যের ছাত্র। এরা জীবনকে বাস্তবরহিত শিল্পের মধ্য দিয়েই পেতে চেয়েছেন। জীবনে স্বকীয়া বা পরকীয়া প্রেম তাঁদের কাছে একমাত্র মনোযোগ দাবী করে। এরা গোড়া থেকেই কলকাতার মানুষ, না হলে মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতায় এসেছে। এদের পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য কম। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয় যে, "বস্তুত ঃ তাঁর সব নায়ক চরিত্রই একটি মাত্র মুখের ছাঁচে গড়ে তোলা। সে মুখ স্বয়ং লেখকের।"*৮ ড্রইংরুম জীবনাচরণের প্রতি বুদ্ধদেবের ছিল একধরণের দুর্বলতা। এই প্রবণতা বিশেষতঃ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রজীবনের গল্পে, বিশেষ বিরক্তিকর। যেমন,—'ঝুট' গল্পের নায়িকা 'অরুণা'—লেখকের বর্ণনানুসারে নিতান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তবাড়ীর মেয়ে। সে রাত জেগে কিংবা এমনকি উনুনের আলোতেও সাহিত্য পড়ে, তবে 'ইংরেজি বেশী নয়, রাশ্যান, নরয়োয়েজিয়ান, ফ্রেঞ্চ।' লেখক বলেন নি, সে কেন এসব সাহিত্য পড়ে, এসব পড়ার প্রভাব তার ওপর কেমন হয়, তাও-বলেন নি। 'টান' গল্পের মধ্যবিত্ত বাড়ীর গৃহস্থবধূ বলে, ও কি Silly, কাঁদাকাটি হচ্ছে কেন? স্বামীকে প্রেমিক পার্থর পরিচয় দিয়ে বলে—আমার একজন old friend, এসব অবাস্তব। তৃতীয়তঃ, লেখকের কবিমন যে সক্রিয় তা চোখে পড়ে। ভাষাব্যবহারে কোথাও কোথাও সচেতনতা যেমন, তেমন দুর্বলতাও চোখে পড়ে। 'প্রগতি' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"যেসব কথা বলার আছে তা জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া সহজ নয়।" কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। বাস্তবে বলার কথা থাকলে জনসাধারণের বোধগম্য না হওয়ার কি আছে?

'কল্লোলে' প্রকাশিত 'রজনী হল উতলা' নিয়ে সেকালে আলোড়ন উঠেছিল। এক ব্যারিস্টার পরিবারে পড়তে আসা আঠারো বছর বয়সের ছেলেকে রাত্রে বিভিন্ন বয়সী

---

* ১ম গল্পগ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্য একটু রূঢ় ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন—(তাঁর গল্পে) "একটা শরচ্চন্দ্র-সুলভ সস্তামার্কা রোমান্টিসিজম আছে যার লক্ষণ হচ্ছে নায়ক বিদ্যায় সাগর পার হয়েও বুদ্ধিতে হবে হনুমান এবং নায়িকা অতি কোমলপ্রাণা হয়েও বুদ্ধিতে হবে হিমাদ্রির মত কঠিন, অভ্রভেদী।" (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮)

ব্যারিস্টার কন্যারা গোপনে শরীর নিবেদন করত। দিনের আলোয় ছেলেটি বুঝতে পারে না আগের রাত্রে কে তার কাছে গিয়েছিল, ফলে প্রত্যেককেই সন্দেহ করে। গল্পের নায়ক এই কাহিনী বলছে বৌ নীলিমাকে। সেকালের পরিবেশবিচারে আলোড়ন-যোগ্য লেখা। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন—"হালের মাপকাঠিতে হয়তো ফিকে, পানসে। কিন্তু এরই জন্যে সেদিন চারদিকে তুমুল হাহাকার পড়ে গেল—গেল, গেল, সব গেল—সমাজ গেল, সাহিত্য গেল, ধর্ম গেল, সুনীতি গেল।'৯ বুদ্ধদেব নিজেও স্বীকার করেছিলেন—"গল্পটা হয়তো মবিড।" প্রগতি পত্রিকায় (ভাদ্র ১৩৩৫) এই গল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল "এ সামান্য গল্পটাকে কেন্দ্র করে যে অসামান্য উত্তেজনার ঝড় উঠেছিল দুচার বছরের মধ্যে অমন দেখা যায় নি।' আলোচ্য গল্পটির অশ্লীলতা নিয়ে সবচেয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করেন সজনীকান্ত দাস—রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা ২৩ ফাল্গুন, ১৩৩৩-এর চিঠি ও তাঁর, মধু ও হুল' (১৩৩৫) গ্রন্থের "orion বা কালপুরুষ" নামক ব্যঙ্গনাট্যটি তার প্রমাণ। রক্ষণশীল বা বিভেদপ্রবণ গোষ্ঠীর এই উত্তেজনার কথা বাদ দিলে বোঝা যায়, গল্পলেখক এ গল্পে প্রচলিত সংস্কারককে ধাক্কা দিতে ও শরীরীপ্রসঙ্গকে অধিক গুরুত্ব দিতে চাইছেন।

তরুণ বুদ্ধদেব তাঁর অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে" প্রবন্ধে ঠিকই লিখেছিলেন—"নরনারীর সম্বন্ধের নানা জটিল সমস্যার দিকটাই এদের কল্পনাকে উত্তেজিত করেছে বেশী" যার ফলে "সম্ভোগ লিপ্সা ' এবং "হৃদয়বৃত্তির সৌন্দর্য ও মহিমা" দুইই তাঁদের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুতঃ সতীর্থদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুই এই প্রেম বা কামের একনিষ্ঠ রূপকার। , নিরুপম চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছিলেন—"যদি বলা যায় বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প ও উপন্যাসের প্রধান বস্তু হল প্রেম, তাহলে বোধহয় ভুল হবে না। প্রেমের জাগরণ, উপভোগ, বিকার, অভাব, স্মৃতি, বহুদিক থেকে প্রেমকে উপলব্ধির প্রয়াস 'সাড়া' থেকে 'যমুনাবতী' পর্যন্ত রচনাগুলিতে বিস্তৃত।"১০ বুদ্ধদেব নিজেও বলেছেন—"তাই বলি/যা কিছু লিখেছি আমি—হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব/আনন্দের বন্দনা হোক না—/যা কিছু লিখেছি, সবই ভালোবাসার কবিতা ··।"

(মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে)

আমরা পূর্বেই দেখেছি প্রগতিতে প্রকাশিত তাঁর সাহিত্য-জীবনের গোড়াকার গল্প ঝুট, টান, পদ্মার ঢেউ, ছায়াচিত্র কিংবা কল্লোলে প্রকাশিত 'রজনী হল উতলা'তে মূলতঃ প্রেম-ভাবনাই লেখককে চিন্তিত করেছে সবচেয়ে বেশী। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই এ মাটি ছাড়া প্রেম। 'অভিনয় নয়' গল্পে প্রেম চাতুর্যের ওস্তাদ প্রতুল কি করে রমাকে পেলো স্ত্রীরূপে, তা দেখানো হয়েছে। এই রমাও কম যায় না, 'মনোহরণের বিদ্যায় ও ছিল আজন্ম-

সিন্ধা।' শেষপর্যন্ত শিশির ভাদুড়ীর সীতা দেখতে গিয়ে রামের সীতার প্রতি প্রেমের শিল্প-রূপ দেখে রমা প্রতুলের প্রতি বিগলিত হয়। এ হল প্রেমের চতুরালির দিক। 'অতনু-মিত্র, সাবিত্রী বোস—আর বুলু' গল্পেও এই ছলাকলার দিকটা বর্জিত। 'নারীসান্নিধ্যের মাখন' খেতে অভ্যস্ত ছিল অতনু মিত্র। আর লাভলক প্লেসের ব্যারিস্টার কন্যা সাবিত্রী বোস—চলনে বলনে বাঙালী সমাজে যে অতুলনীয়া এই সাবিত্রীবোস ঘিরে থাকে অতনুকে কুয়াশার মতো। অতনুর জীবনে এল পনেরো বছরের কালো মেয়ে বুলু। এর চালচলনে অতনু আজ আর অভ্যস্ত নয়। তাই বুলুর প্রতি আচ্ছন্নতা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল সাবিত্রীর সান্নিধ্যের কাছে। এই গল্পগুলোকে স্পষ্টতঃ ব্যঙ্গগল্প বলা যাবে না, আবার কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্যও নেই। ফলে লেখকের অগভীর জীবনদৃষ্টি ও ড্রইংরুম দুর্বলতার উদাহরণ হয়েই থাকে।

'দাম্পত্য আলাপ' গল্পে আছে বিয়ের আগের প্রেমিকার স্মৃতিচারণ। স্ত্রী প্রশ্ন করে আর স্বামী প্রেমের আনন্দ-উচ্চারণে বিভোর হয়। গল্পের বক্তার ভাষাতেই এ প্রেম 'যেমন ভোরবেলার আধোঘুমের স্বপ্ন, তার আকার নেই, শুধু আকুলতা আছে। সে ছবি কার কেউ জানে না। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমে পড়ার অবস্থা এটা নয়, এটাকে বলতে পারো প্রেমের সঙ্গে প্রেমেপড়া।' একটি কি দুটি পাখী' গল্পের অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জী প্রৌঢ় বয়সে পুনরায় প্রেমিকার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তার লঘু একটি স্পর্শে মুহূর্তের জন্য তার সতেরো বছরের তারুণ্য ফিরে এলো। অনিরুদ্ধর বন্ধু এ কাহিনী শুনে বলে, "আসলে আমরা ভালবাসাকেই ভালোবাসি, এই উপলক্ষ্যগুলি কিছু নয়।"

'দু একটা স্বর' গল্পের নায়ক সাহিত্যিক শিবপ্রসাদ দত্ত। তার জীবন বিপুল খ্যাতিতে পূর্ণ। স্ত্রী আভা ক্লান্তিহীন যত্নে ভরিয়ে রাখে তার জীবন, কিন্তু তবু তার হৃদয়ে রয়ে গেছে শূন্যতা। একদিন প্রেয়সীর কাছ থেকে সে পেয়েছিলো কবিতার প্রেরণা এবং পরে প্রত্যাখ্যান। টেলিফোনে শিবপ্রসাদের সেই পুরনো প্রেমকে ফিরে পাওয়ার আকুলতা আলোচ্য গল্পে চমৎকার ফুটেছে। 'আমরা তিনজন' গল্পে বয়ঃসন্ধি কালের প্রেমচেতনা সুন্দর ফুটেছে। 'নবকৈশোরের প্রথম নারীচেতনা নিয়ে অমর আশ্চর্য-সুন্দর গল্প বাংলা-সাহিত্যে আর লেখা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।' —সমালোচকের এ মন্তব্য যথার্থ।১১ তিন বন্ধু অসিত, হিতাংশু আর বিকাশ। প্রেমে পড়েছিলো অন্তরা-র। তারপর আস্তে আস্তে পরিচয়, পারিবারিক আবহাওয়ায়। অন্তরা হয় মোনালিসা। অন্তরার টাইফয়েড হলে আপ্রাণ পরিশ্রম, সেবা শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে এই তিনবন্ধুর প্রেম বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্তরার বিয়ে ঠিক হলে এরা পরিশ্রম করে, বাড়ীর লোকের থেকেও বেশী। তিনটি হৃদয়ের আন্দোলন অস্ফুট থেকে যায়। শেষে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অন্তরা মারা যায়।

এই গল্পে একের পর এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে ; সারা গল্পটাই সেই প্রেমের শান্ত সুন্দরতার আবেশে ভরপুর. গল্পের বক্তার কাছে 'সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে একটু হাওয়া'র মতো।

যদি-ও এই স্বপ্নমন্থিত প্রেম কিংবা প্রেমের সঙ্গে প্রেমে পড়ার গল্পই বুদ্ধদেবের রচনায় বেশী তথাপি প্রেমের উন্মাদনার হিংস্র আবেগ ফুটে উঠেছে অন্তত একটি গল্পে— 'এমিলিয়ার প্রেম'-এ। এ গল্পের নায়ক ভাস্কর চিত্রশিল্পী, যারো বছর সে ইউরোপে কাটিয়ে এসেছে। এমিলিয়া এক দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রি-কন্যা, জন্ম তার ইটালীতে। এক বিলাতী হোটেলের নাচের আসরে দুজনের প্রথম সাক্ষাৎই তাদের দুজনার মনে জাগিয়ে তোলে প্রেমের হিংস্র উন্মাদনা। দিনের পর দিন শারীরিক উষ্ণতায় তারা বিভোর হয়ে থাকে। কিন্তু এমিলিয়ারও ছিল পূর্ব জীবন ও পূর্ব প্রণয়ী। তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়াতে ভাস্করের মনে জাগে ঈর্ষা, সন্দেহ। মিলনের এক তুঙ্গ মুহূর্তে শান্তির দ্বীপের মতো এমিলিয়ার আচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে ভাস্করের মনে হলো 'এই তো চরম, এই তো চরম মুহূর্ত।' এই মুহূর্তকে চিরন্তন করে রাখার দুরন্ত ইচ্ছায় 'ভাস্করের দুই হাত এমিলিয়ার গলার উপর নামল।' নিষ্পন্দ এমিলিয়ার সুন্দর শরীর আর হাঁ-খোলা স্তব্ধ মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাস্কর ভাবলো আর ভয় নেই। এখন সে চিরকাল আমার।' খুব সম্ভবতঃ এই গল্প প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"দেখালে প্রবল ভালবাসার আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের মধ্যেই অনিবার্য হিংস্রতা, যুগ্ম জ্যোতিষ্কের পরস্পর আকর্ষণের মধ্যে যে দূরত্ব থাকলে তাদের যুগলযাত্রা নিরাপদ হতো, আবেগের দুর্দমতায় সেইটে কমে গিয়ে আসন্ন প্রলয়সংঘাতের আশঙ্কা উগ্র হয়ে উঠল।' (বিচিত্রা, অগ্রহাঃ ১৩৪২)

এসব গল্পের ভিত্তিতে বলা যায়, বুদ্ধদেব প্রেমের ভিত্তিমূলে কামকে স্বীকার করতে কুন্ঠিত নন, তবে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে মনে রেখে যৌন সম্পর্কের বিশ্লেষণ অপেক্ষা স্থানিক কালিক চিহ্নমুক্ত যৌনআবেগ ও তার প্রতিক্রিয়াকে রূপ দানেই তাঁর প্রবণতা বেশী। দেশের আবহাওয়া যখন রক্ষণশীল, তখন সাহিত্যে প্রেমের এই অবাধ উচ্চারণ সোরগোল তুলবেই। কিন্তু চোখের সামনে সব পথ অবরুদ্ধ হতে দেখে, হয়ত এই পথেই কল্লোলীয় লেখকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সামাজিকও বাস্তবজীবনপটে এই বিদ্রোহের শিকড় না থাকায় অচিরেই তা দেশকালাতীত রোমান্টিক রোমন্থনে পরিণত হয়।

বুদ্ধদেববসুর রোমান্টিকতার মধ্যে এসে গিয়েছে প্রচলিত আদর্শবাদের প্রতি এক-ধরণের শ্রদ্ধা (যদিও সামাজিক বিকারের প্রতি সে তুলনায় ঘৃণা নেই)। জীবন যখন প্রতিকূল তখন কচিৎ কখনও তিনি আদর্শবাদের প্রতি ঝুঁকতে চান। লেখকের ১৯৫২ সালের একটি মন্তব্য এই কথাই প্রকাশ করে : "জীবনের মূল্যবোধ যখন বিপর্যস্ত, তখন

তাকে বাঁচিয়ে রাখা, জাগিয়ে তোলাই তো শিল্পীর কর্তব্য—সেই সব বড়ো বড়ো পুরোনো মূল্য, যা মানব সভ্যতার সমবয়সী বলেই কোনোদিন পুরোনো হয় না, মানুষের সকল শুভকর্মের যা উৎপত্তিস্থল।"১২ (কিন্তু এ ক্ষণিকের, এ বিবেকবোধ স্থায়ী হয় না) যা হোক্, কয়েকটি ছোটগল্প থেকে লেখকের এই প্রবণতার পরিচয় নেওয়া যাক।

'মাস্টার মশাই' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন আজকের দিনে স্কুল কলেজে শিক্ষার নামে ব্যবসা ও দুর্নীতি কিভাবে সৎ-প্রচেষ্টার অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে। সতীশংকর জ্ঞানতপস্বী। তাঁর প্রাক্তন ছাত্র সরোজ তাঁকে তার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ক'রে নিয়ে এলো সত্যিকারের একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলার ইচ্ছায়। দুর্নীতিচক্রের চাপেও চক্রান্তে কলেজ হয়ে উঠল—মিথ্যার, প্রবঞ্চনার, ইতরতার আশ্রয়স্থল। শেষ পর্যন্ত সতীশংকরকে বিদায় নিতে হলো। সরোজের চরম শূন্যতাবোধের মধ্যে লেখক গল্প শেষ করলেও শুভকর্মৈষণার প্রতি লেখকের আকর্ষণ সহজেই ধরা পড়ে। 'সুপ্রতিম মিত্র' নামের গল্পে জীবনের তথাকথিত সাফল্যের শীর্ষে আরোহণকারী মহিম তালুকদারের বৈপরীত্যে রাখা হয়েছে সুপ্রতিমকে যে ওর কলেজ জীবনের জিনিয়াস বন্ধু। সত্যিকারের শিল্পী মনের অধিকারী সুপ্রতিম তিন-চারটি ইউরোপীয় ভাষা, সংস্কৃত, বিজ্ঞান আর নাটকে বিশেষ আগ্রহী। কিন্তু সে একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ানোর চাকরী ছেড়ে দেয়। কারণ 'এ আমার কাজ নয়।' নৈনিতালে থাকতে ইতালিয়ান শিখেছিলো মূল দান্তে পড়বার জন্য, এবার পড়া শুরু করবে ভাবে। সুপ্রতিমকে বিয়ে করার সময় ইলা ভেবেছিল, সে জিনিয়াস-গোছের জীব। কিন্তু ধীরে ধীরে ইলা দেখলো অভিজাত সমাজের প্রচল আচরণে তার একান্ত নিস্পৃহতা—সে ব্রিজ জানে না, টেনিস জানে না, ঘোড়দৌড়ে যায় না, পাখী শিকারেও না। আস্তে আস্তে মোহভঙ্গে ইলা চলে গেলো কাঞ্চনের সঙ্গে। তারপর সুপ্রতিম দার্জিলিং-এ—সেখানে ইলার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ—সে একটা ঘর নিয়ে আছে। আগে একটা উপন্যাস শেষ করেছে, তাছাড়াও অনেক লিখেছে। মহিম বন্ধুর অনড় আদর্শপরায়ণতায় বিস্মিত হলো—'ওর জীর্ণ ঘরের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে ও সব ছেড়েছে, কিন্তু ওর রাজত্ব ছাড়েনি; নিজেকে একদিনের জন্যও ভাড়া খাটায়নি, রাজা হয়েই জীবন কাটিয়েছে—শেষ পর্যন্ত; ওর ধর্ম থেকে মুহূর্তের জন্যও ভ্রষ্ট হয় নি।' 'একটি জীবন' গল্পটিও এই নিজধর্মে অবিচলিত থাকার কাহিনী। হেড পণ্ডিত গুরুদাস ভট্টাচার্যি একদিন পড়াতে পড়াতে অনুভব করলেন সজীব, পরিবর্তনশীল বাংলা ভাষার উপযুক্ত অভিধান নেই। গরীব মাস্টার মশাই জমি বিক্রি করে সেই টাকায় বইপত্র কিনে অভিধান রচনায় ব্রতী হলেন। কাজ কিছুটা এগুলো। কিন্তু প্রকাশক পাওয়া যায় না। পেলে-ও বই বিক্রী হয় না। ৪৭-এর টালমাটালে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হলো

রেফিউজী কলোনীতে। পথে ক্যাম্পে কলেরায় মারা গেল স্ত্রী হরিমোহিনী। একছেলে সুরকির কলে কাজ নিলো, আর একছেলে বখে গেলো। গুরুদাস কিন্তু এতসবেও কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি। অবশেষে 'বৃহৎবঙ্গীয় অভিধান' যখন তিরিশ বছরের পরিশ্রমে বাহান্ন খণ্ডে সমাপ্ত হল তখন তিনি মুমূর্ষু। ইতিমধ্যে কলকাতার এই অভিধানের কথাটা রাষ্ট্র হল। যাঁরা কিনলেন তাঁরা ভালো বললেন, যাঁরা কিনলেন না তাঁরা আরো বেশি।' এইভাবে বিখ্যাত হলে সরকার ঠিক করলেন তাঁকে পুরস্কার দেবেন। কর্তা ব্যক্তিরা সব এলেন সদলবলে, রেফিউজী কলোনীতে। অভ্যাগতরা বিছানার ধার থেকে একটু সরে যেতে গুরুপদ ছেলে ভবানীকে বললেন, "আমাকে পাশ ফিরিয়ে দে। বড়ো হাসি পাচ্ছে আমার, আমি হেসে ফেললে এঁদের অসম্মান হবে। আমাকে মুখ ফিরিয়ে দে।' আদর্শবাদী জীবনের দুর্গম এই তপশ্চর্যা ও প্রচল সমাজপ্রবাহে উদাসীনতা বিরল হলেও লেখককে যে আকৃষ্ট করেছে তাতে সন্দেহ নেই।*

এই ধরণের আর একটি গল্প—'ওস্তাদজী'। হোসেন খাঁ পুরোনো দিনের পরিশ্রমে-উত্তীর্ণ ওস্তাদ গায়ক, কিন্তু তার ছেলে আসমান সস্তা প্রলোভনের শিকার। সে যশ চায়, রাগসঙ্গীত ছেড়ে ফিল্মসঙ্গীত চর্চা করে অর্থ অর্জন করতে চায়। বড়লোক উকীলের সহায়তায় সে ফিল্মে প্লে ব্যাকের সুযোগ পেলো। বাপের সঙ্গে যোগাযোগ আগেই ছিন্ন। উকীল বাড়ীতে খবর নিতে এসে ওস্তাদ শুনলো ছেলে সেখানে সেদিন আসর বসিয়েছে। সে আসর বলাবাহুল্য হালকা গানের। ব্যাপারটা জানতে পেরেই "তাঁর দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠলো, থাবার মতো দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো—দাঁতে দাঁত চেপে তিনি দুবার বললেন, 'আসমান! আসমান!' কথাটা শোনালো ঠিক কেউটে সাপের ছোবল মারার শব্দের মতো—"সবেগে ঢুকে গেলেন বাড়ীর ভেতরে। ওপরে উঠলেন। তারপর 'শালা উল্লুক'। বাঁ হাতটি প্রসারিত করে হোসেন খাঁ এক চড় মারলেন আসমানের গালে।' তারপর 'সবার সামনে দিয়ে কানধরে বয়সী ছেলেকে নিয়ে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে নেমে গেলেন।' 'একটি জীবন' বা 'মাস্টার মশাই' গল্পের থেকে 'ওস্তাদজী' গল্পের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, এই গল্পেই আদর্শবাদের উৎসার বিক্ষুব্ধতায় ফেটে পড়েছে বুদ্ধদেবের রচনায় যা সহজলভ্য নয়।

*'একটি জীবন' গল্পটি বোধ হয় লেখকের একটি প্রিয় গল্প। ১৯৫১, ১৩ই ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক থেকে তিনি জ্যোতির্ময় দত্তকে লিখছেন: "যাই হোক, কথা হচ্ছে আমার সেই 'একটি জীবন' গল্পটার অনুবাদে কি হাত দেবে এবার?..... কাজের কাজ হবে যদি ঐ গল্পটা অনুবাদ করে পাঠাও।......কিছু দিয়ে যেতে চাই এদের হাতে..." কবিতা, বর্ষ ২৫, সংখ্যা ৩, পৃঃ ১৪৪।

জীবন অভিজ্ঞতার স্বল্পতা ও বৈচিত্র্যের অভাব তাঁকে স্বভাবতঃই বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খতায় ঘটনা অপেক্ষা মনোবিশ্লেষণের দিকে, 'নাটকীয়তা অপেক্ষা স্বগতোক্তির দিকে', ঘটনার গতিচাঞ্চল্য অপেক্ষা 'মুড' সৃষ্টির দিকেই বেশী করে টেনে নিয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর কিছু গল্প আছে, যা একেবারে কাহিনীর ভারবর্জিত। সেক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ধরণের কাব্যময় ভাষা ও বর্ণনা নৈপুন্য মিলে মিশে বিশেষ একটি স্বাদ এনে দিয়েছে। 'প্লট প্রধান' উপন্যাস বা গল্পের প্রতি বুদ্ধদেবের আকর্ষণ ছিল কম। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের একটা বড়ো অংশের প্রতিপত্তির কারণ হিসেবে কবিত্বগুণের কথা বলেছেন তিনি।১৩ একথা তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কেও সত্য। দু একটি গল্প থেকে এর পরিচয় নেওয়া যাক। যেমন—'জ্বর'। অধ্যাপক রমাকান্ত বসু বন্ধুদের বাসায় আড্ডা দিতে গিয়ে বুঝতে পারলো জ্বর আসছে। বাড়ী ফিরে অসহ্য যন্ত্রণায় সে অসংলগ্ন এবং অস্বাভাবিক চিন্তার আবর্তের দ্বারা তাড়িত হয়। হঠাৎ মনে হয় সে মারা গেছে, শ্মশানে চলেছে। মনে হয় সে দেওঘরে প্রেমিকা সুধার [এখন যে তার স্ত্রী] সঙ্গে, এমন সময় নন্দন পাহাড়ের চূড়ায় এক অতিকায় দানবতুল্য লোক কণ্ঠস্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বারংবার বলিতেছে The Name of a town in Northern India. The name of a ....' (এটা আড্ডায় বন্ধু দ্বিজেনের উক্তি ছিল) আবার মনে হয় সে মারা গেছে। কিন্তু 'সুধা এখন কত বিচ্ছিন্ন, কতপর। সে মরিয়া গিয়াছে, তবু সুধা চওড়া-পাড় শাড়ি পরে, পান খাইয়া ঠোঁট লাল করে। .... ক্ষোভে দুঃখে তাহার কান্না পাইল।' পরের দিন জ্বর ছেড়ে গেল। বোতলে সুধার হাত কেটে গিয়েছে গত দিন। শুনে বলল, তাই নাকি? খুব বড়ো ঘা হয়নি তো? ডাক্তারবাবু এলে দেখিয়ো।' কিন্তু পরক্ষণেই সে ব্যাপারটা ভুলিয়া গেল। তাহার শরীর পাখীর মতো হালকা হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে বোধহয় এখন আকাশে উড়িতে পারে। মেঝের উপর লুটাইয়া-পড়া রৌদ্ররেখার প্রতি তাকাইয়া হাসিমুখে সে চায়ের পেয়ালাটি মুখে তুলিল।' 'রোদ' গল্পেও তেমন কোনো গল্প নেই। সুরথ একদিন সকাল বেলার ঘাসের গন্ধে শৈশবের পরিচিত অনুষঙ্গগুলো ফিরে পেলো। তরুণ বয়সের বারণ না মানা জীবনের মধ্যে সে ফিরে যেতে চায়, স্বাস্থ্য বিধিকে উপেক্ষা করে অনুপমের বাড়ী যায়। হাঁটতে আজ ভালো লাগলো সুরথের, নতুন লাগলো, যেন তার পায়ের পাতা সুখের ঢেউ:য়র তালে তালে পড়ছে।' দুপুর বেলায় বেরিয়ে পড়ে বাড়ী ফেরার উদ্দেশ্যে। তখনো 'সকাল বেলার অহেতুক ফুর্তির গুণ-গুনানি মনে।' কিন্তু প্রচণ্ড রোদ্দুরে কষ্ট হয়। 'পিচ গলছে পায়ের তলায়, সারা গায়ে পিন ফুটছে, নোংরা ঘাম ঠোঁটের উপর নোন্তা, চোখের ভিতর ঝাপসা, মেরুদণ্ডে পোকার মতো কিলবিলে।' বাড়ী ফিরে স্নাত স্নিগ্ধ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে

সুরথের রাগ হলো, জুতো জামা একটানে ছুঁড়ে ফেলে চিৎপাত শুয়ে পড়লো খাটের উপর। 'একা গল্পের মেজাজও অনুরূপ। এখানে স্বগতোক্তির ভূমিকা আর একটু বেশী। এই গল্পের বক্তা 'সে'। একটু আগে অফিস থেকে ছুটি পেয়ে কী করবে ভেবে পায় না। চৌরঙ্গীর এধার ওধার হাঁটতে থাকে। 'কুচো কেরানী' সে। সাধ্যমত টাকা জমানোর চেষ্টা করে। হাজার টাকা জমলেই বিয়ে করবে। বৌ-এর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়, স্বগতোক্তির ও কল্পনার তরঙ্গ ওঠে ভাবীসংসারের কথা ভেবে। আর একাকীত্বের বোধটা আরো তীব্র হয়, কথা বলার তেষ্টায় বুক যেন ফেটে যায়। চৌরঙ্গী পাড়ার কম আলোর একগলি থেকে একটা ফিরিঙ্গী মেয়ে Hullo dearie বলে ডাক দেয়। একটি মেয়ে তাকে ডেকেছে। এই কথা ভেবে সে 'অন্ধ হয়ে গেলো, অন্ধ, চেতনাহীন।' তার সঙ্গে এগিয়ে যায়। তারপর একসময় সম্বিত ফিরে আসে, আর কোনোদিকে না তাকিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বাসে উঠে পড়ে। ভাবতে থাকে তার কল্পনার স্ত্রীর সেই স্নিগ্ধরূপের কথা, 'কেমন একটা অসহায় হেরে যাওয়া কান্নার ভাব সারা শরীরে' ছড়িয়ে পড়ে।

এইসব গল্পে কাহিনীর ভার একেবারেই বর্জিত, কিন্তু বুদ্ধদেবের আরও কিছু গল্পে বর্ণনার পুঙ্খানু-পুঙ্খতা ঘটনার আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। যেমন, 'রাধারানীর নিজের বাড়ী'। সাধারণ চাকুরের বৌ রাধারানী আস্তে আস্তে প্রত্যাশার শিখরে উঠেছে, বালিগঞ্জে বাড়ী করেছে, কিন্তু তার সন্তান বাঁচে না—গল্পের কাহিনী সূত্র এই সবের ওপরে নির্ভর করে এগিয়েছে বর্ণনার পর বর্ণনায়—কখনো বস্তু, কখনো মনোভাবের। অবশ্য তা গল্পের গতি বা কৌতূহল সৃষ্টিতে ভূমিকা নেয় নি। 'একটি লাল গোলাপ' গল্পটি অবশ্য এক্ষেত্রে সার্থকভাবে উত্তীর্ণ। বুদ্ধদেব বসু তাঁদের কালের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—'তত্রাচ, সেই উত্তেজনার (বাস্তবতা নিয়ে) অধ্যায়েও কল্লোল গোষ্ঠীর প্রত্যেক রচনাই বাস্তব শিল্পের অবিকল উদাহরণ হয় নি—কেননা কোনো লেখক বা গোষ্ঠীর ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কখনই সম্পূর্ণ মেলে না—আর মেলেনা বলেই বাঁচোয়া—এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন শেষ বয়সে বুঝেছিলেন তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' বাস্তবতার গুণেই আদরণীয়, তেমনি ততদিনে নব্যলেখকরাও কেউ কেউ মেনেছিলেন যে নিছক বাস্তববাদে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি নেই। ১৪ এই উক্তি পঞ্চম দশকের। বুদ্ধদেব 'নিছক বাস্তববাদ কি তার ব্যাখ্যা না করলেও তাঁদের কালের সব রচনাই যে বাস্তবশিল্পের অবিকল উদাহরণ হয় নি একথা মেনেছেন, বাস্তববাদে যে শেষপর্যন্ত তৃপ্তি নেই একথা বলে নিজের প্রবণতাকে স্পষ্ট করেছেন। অন্যত্র লিখেছেন—'Specially now that our political freedom has been attained, there is every reason to look forward to a time when our literature, released from the obliga-

tions of public service, freed from froth, cured of sobs and bravado, will become adult, fully mature.' ১৫ এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, তিনি সাহিত্যকে জনসেবার দায়িত্ব থেকে জোর করে মুক্ত করতে চান। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সাহিত্যে ছিল, তাঁর মতে জন সেবার দায়িত্ব, অগভীর ফেনিলতা আর ফোঁপানি কান্না ও নানাই বড়াইয়ের প্রকাশ। এখন সাহিত্য হবে "adult, fully mature." এই উক্তির মুল-অসঙ্গতির কথা ছেড়ে দিলেও তিনি যে জনগণের জীবনের সঙ্গে বেশী জড়িয়ে পড়া সাহিত্যকে 'বয়ঃপ্রাপ্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত' সাহিত্য বলে মানেন না, তা বোঝা যায়। এই রচনার অন্যত্র বলেছেন : "I will hazard the remark that Saratchandra's all but inescapable influence had induced our later novelists an excessive reliance on what is vaguely known as 'experience' or 'life'. '১৬ "অথচ কথাসাহিত্যের অন্যতম শর্তই হোল—তা অর্জিত জীবন অভিজ্ঞতাকেই সাহিত্য করে তুলতে চায়। বুদ্ধদেব বলেছেন—"কথাসাহিত্যে দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল ; তা ভূগোল নির্ভর, ইতিহাসে বিন্যস্ত।"১৭ কিন্তু জীবনাচরণে ও রচনায় একথা স্থায়ীভাবে মানতে তিনি একান্তই নারাজ। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 'প্রগতি পত্রিকা' বার করার সময় থেকেই বুদ্ধদেব শিল্পের জন্য শিল্প নীতিতে বিশ্বাসী। সুধীন্দ্রনাথের কথায় এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে : "আভিজাতিক শুচিবায়ুর বিরুদ্ধে কৈশোরিক বিদ্রোহ সত্ত্বেও তিনি আজীবন কলাকৈবল্যের সাধক।" ১৮

অবশ্য, 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতিতে আজীবন বিশ্বাসী থাকলেও শিল্পের প্রতি অংশত সততার কারনেই তাঁর পক্ষে রচনায় সমাজ-জীবনের প্রসঙ্গ একেবারে অনুল্লিখিত রাখা সম্ভব হয় নি। তিনি যখন 'প্রগতি'তে গল্প লেখা শুরু করেন, তখন গল্পের পটভূমিতে অনেক ক্ষেত্রেই 'নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের দারিদ্রের বিড়ম্বনা' ছায়া ফেলেছে। 'ঝুট', 'টান' প্রভৃতি গল্প তার প্রমাণ। 'রেখাচিত্র' গল্পে দেখানো হয়েছে বাস্তবের কঠোর আঘাতে কি ভাবে তারুণ্যের স্বপ্ন ভেঙে যায়। পাশের বাড়ীতে ননদ-বৌদির কুৎসিত ঝগড়া, তার বিপরীতে আছে স্বপ্ন-কামনা। 'একা' গল্পের নায়ক চল্লিশ টাকার 'কুচো কেরাণী' মানুষ হয়েছে দূর সম্পর্কের মামার বাড়ীতে অনাদরের অন্ন খেয়ে। তারপর আর্থিক অনটনের চূড়ান্ত অবস্থায় চাকরী জুটে যায়। সে ভাবে ' না এমন কিছু মন্দ নেই সে, যখন ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলেরা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' চল্লিশ টাকার কেরাণীর এই পরিতৃপ্তির ছবি অবশ্য বাস্তব জীবনের সঙ্গে মেলে না। 'মা ভাই বোন' গল্পে ছোটবেলার উষ্ণ দৃঢ় সম্পর্কগুলো কিভাবে সংসারের ঘূর্ণিতে চূর্ণ হয়ে গেলো তারই চিত্র। এ গল্পের বারীণ বাঁচতে চায় জানোয়ারের মতো নয়, ভিখিরির মতো নয়, মানুষের মতো। কিন্তু মানুষের

মতো বাঁচা কি ভাবে সম্ভব, সে পথের অন্তরায় কোথায় এটা বারীণ ভাবে নি, তার অসহায়তাই ফলে প্রকট হয়েছে। 'মাস্টার মশাই' গল্পে কলকাতায় বোমার হিড়িকের সঙ্গে সংগে মফঃস্বলে অজস্র কলেজ গজিয়ে ওঠার—শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা শুরুর কথা আছে। 'অসমাপ্ত গল্প' এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। গল্পের আমি —অধ্যাপক। গ্রামের ছেলে গণেশ তার বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়ে। স্ত্রী সরমা প্রথমে গণেশের প্রতি বিরক্ত হলেও শেষে সরমার প্রভাবে সে বদলে যায়, নাগরিকতার বদগুণগুলো অর্জন করে। তারপর স্বদেশী ঝোঁকে দেশপ্রীতির বহিরংগে মাতে সুরমার সংগে। খবর এল গণেশের মা গ্রামে মৃত্যুশয্যায় কিন্তু তাতে সে ভ্রূক্ষেপহীন, দেশের কাজে ব্যস্ত। বক্তা আর সামলাতে না পেরে সবার সামনে কঠোর ভাবে তাকে বাড়ী যেতে আদেশ করে। কিন্তু গণেশের দলের ছেলেরা তাকে 'দেশদ্রোহী' বানিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দেয়, তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। সমকালীন অহিংস-রাজনীতির প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যংগ এ গল্পে চমৎকার প্রকাশিত। তাঁর স্বনির্বাচিত গল্প সংকলনের (রচনাকাল ১৯৪৪-৪৬) ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "এই গল্পগুলিতে পাওয়া যাবে ···· যুদ্ধকালীন বাংলার, ভারতের, হয়তো জগতের আবহাওয়া···" কিন্তু গল্পগুলিতে যুদ্ধকালীন বাংলার প্রসংগ দুচার ক্ষেত্রে ছায়াপাত করলেও ভারতের কিংবা আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার প্রকাশ চোখে পড়ে না। 'হাওয়া বদল' গল্পে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশে ব্যবসা করে হঠাৎ বড়লোক হওয়া ও তাদের ভাগ্যের ভালো মন্দের হাওয়া বদলের প্রসঙ্গ আছে। 'ওস্তাদজি' গল্পে আছে সমকালীন রুচি পরিবর্ত্তনের—রাগসঙ্গীত অপেক্ষা চটুল লঘু সঙ্গীতের দিকে প্রবণতার কথা। 'লজ্জা' গল্পে চাকুরে স্বামী স্ত্রীর ছোট্ট পরিবারে স্বামীবন্ধুর আবির্ভাবে স্থান সঙ্কুলান ও সামঞ্জস্য স্থাপনের সমস্যার কথা। 'সুন্দরের জন্ম' গল্পের সূচনায় যে কোনো সাধারণ জিনিষকে কেন্দ্র করেও যুদ্ধের আতঙ্ক এবং গুজবের নাগরিক জীবনে প্রভাব সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'একটি লাল গোলাপ' গল্পে আছে প্রাসঙ্গিকভাবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের আজগুবি দামের কথা। 'একটি জীবন' গল্পে প্রকৃত অধ্যবসায় যে কালের পরিবর্তনে কি ভাবে অবহেলিত থাকে তার কথা। 'রক্তের স্রোত বয়ে গেলো ভারতে, তারপর দেশ স্বাধীন হলো।' এর মধ্যে শিক্ষক গুরুদাস এ বংগে আসেন সর্বস্বান্ত হয়ে। 'বৃষ্টি। রোদ। ধুলো। বিষ্ঠা। মাছি। আর দলে-দলে অসহায় মানুষ। রাণাঘাট স্টেশনে ভিড়ের চাপে দুটো শিশু থেঁতলে মরে গেলো। ..... শেয়ালদা স্টেশনে মুড়ি খেয়ে সাতদিন কাটলো, তারপর লরি বোঝাই হয়ে চালান হলেন বনগাঁর ক্যাম্পে। সেখানে রোজ বেলা দুটোর সময় চাল-ডাল-মেশানো একটা মণ্ডের মতো পদার্থ দিয়ে যায়।' তারপর ক্যাম্পে কলেরায় স্ত্রীর মৃত্যু প্রসংগ। মৃতদেহ নিজেরা সৎকার করা গেলো না, সরকারী লোক এসে পাইকেরী হিসেবে কালো-

রঙের মোটর গাড়ীতে তুলে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার পঞ্চম বর্ষে সংবাদ পত্রে গুরুদাসের অভিধান রচনায় অধ্যবসায়ের কাহিনী বেরোয়। সরকারী পুরস্কার ঘোষণা, লোক দেখানো উদাহরণ সৃষ্টির জন্য সরকারী কর্তাদের রেফিউজী কলোনীতে এসে পুরস্কার দেওয়া ইত্যাদি ঘটে।

এইসব উদাহরণ থেকে মনে হয় বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য জীবনের প্রথমার্ধে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তজীবন অবলম্বিত এবং উচ্চবিত্তজীবন ব্যঙ্গাশ্রিত হলেও অভিজ্ঞতার স্বল্পতায় সর্বত্র সঙ্গত হয় নি, দৃষ্টিভঙ্গির আবিলতায় যথার্থ আবেদন গ্রাহী ও তাৎপর্য পূর্ণ হয় নি। যেমন—নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ীর মেয়ে বলে ওঠে, ও কি Silly কাঁদাকাঁটি হচ্ছে কেন? উনুনের আলোয় এই মেয়েটির নিরর্থক রাশ্যান, নরওয়েজিয়ান, ফ্রেঞ্চ উপন্যাসপড়া দৃষ্টিকটু। সম্ভবতঃ নিজ জীবনের হতাশা ও দারিদ্র্য, বন্ধুদের জীবনের অর্থাভাব ও বেকারী শৈলজানন্দ, মনীশ ঘটক প্রভৃতির জীবনমুখী লেখা তাঁকে বিষয়ের দিক থেকেও কিছুটা স্বভাবভ্রষ্ট করেছিল। অর্থাৎ তিনি দরিদ্র পরিবেশ নিয়ে গল্প লিখেছেন। কিন্তু এ পরিবেশে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন তা পাঠকের অজানা নয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন লেখায় অবশ্য সামাজিক চাপ এড়াতে পারেন নি, ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সম্মেলনে যোগদান এবং 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' পুস্তিকা রচনা সেই বিব্রত হওয়ারই ফল। তবে অচিরেই তাঁর সাহিত্য সমকালীন সমাজ ও ভাবনার প্রধান সড়ককে এড়িয়ে চলেছে। সে রচনা যে পরিমাণে অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত, সে পরিমাণে দেশকাল সমাজ সচেতনতায় ভাবিত নয়।

বুদ্ধদেব বসু প্রগতির প্রথম সংখ্যায় বলেছিলেন—'তাঁরা সমাজের চেয়ে ব্যক্তিকেই বড় বলে বিশ্বাস করেন।' নিজেদের সাহিত্যকে তিনি 'বিদ্রোহের সাহিত্য' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তির বিদ্রোহ তাঁর লেখায় বিরল। সামাজিক প্রতিকূলতায় ব্যক্তি বিদ্রোহ করতে পারছেনা সেটাই সহজদৃষ্ট। সে যেন বলে—'অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর তলে, ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা।' 'বোন' গল্পের প্রিটিকে সংযমচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়ে লিলির দিদি তার নামে চীৎকার করে অপবাদ দেয়। কিন্তু এই অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদই সে করতে পারে না। এই অসহায়তা অন্যভাবে এসেছে 'প্রশ্ন' গল্পে। নিম্নমধ্যবিত্ত ভবকুমার ছেলেকে আরোগ্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারেনা। অথচ কত সামান্য অসুস্থতায় ধনীব্যক্তিদের কত অজস্র টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু এই অসঙ্গতির জন্য তার মনে প্রশ্ন জ্বলন্ত, তীব্র হয়ে ওঠে না। সে শুধু ভাবে "পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য—অযাচিত, বিনামূল্যে বিতারিত এত সৌন্দর্য, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। আর এই শান্তি আর সৌন্দর্যের মধ্যে সানু, তার ছেলে সানু,

মরছে।' (জীবনের অসঙ্গতির কারণ খোঁজার থেকে সৌন্দর্যের জন্য একধরণের ভাবালুতা বুদ্ধদেব বসুর অনেক গল্পেই লক্ষ্য করা যাবে।) 'একা' গল্পের কেরানী যদিও বলে মন্দ নেই সে, তবুও বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন এবং নিঃসঙ্গতা তার মধ্যে আছে। চৌরঙ্গী পাড়ার বেশ্যার ডাকে সাময়িক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে সে এগিয়ে গেলেও পরে ছুটে এসে বাসে ওঠে। অন্যদিকে দৃষ্টির আবিলতাবশতঃ তরুণ বয়সে 'কল্লোল' পত্রিকায় তিনি বলে বসেছিলেন—"বলতে গেলে আমাদের দেশের প্রলেটারিয়েটের কোন সমস্যা নেই—অন্ততঃ কোনো সমস্যা তত নিদারুণ হয়ে ওঠে নি।" (চৈত্র, ১৩৩৪) এই মানসিকতা কিন্তু প্রবীণ বয়সেও থেকে গেছে। ৪৭-পূর্ব ও পূর্ববর্তী বাঙালী জীবনের ক্রমবর্ধমান সংকটে তিনি প্রায় নির্বিকার। যুগযন্ত্রণা বা সংকটকে পাশ কাটিয়ে তাঁর নায়ক নায়িকারা এক সৌন্দর্যের জগতে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। এই পথে চলতে চলতে বাস্তবতাসৃজনের নামে তিনি যখন স্মৃতিজীবী বিকারের বর্ণনায় গিয়ে পড়েন (পাতাল থেকে আলাপ ইত্যাদি) তখনও তিনি বুঝতে পারেন না, কলাকৈবল্যবাদের চর্চায় এযুগে আমরা কত ক্ষয়িত, পঙ্গু এবং অসামাজিক হয়ে যাই।

তবু-ও বুদ্ধদেব বসুকেও কিছুতেই সুযোগসন্ধানী শিল্পী বলা যাবে না। তিনি কখনও তাঁর সাহিত্যাদর্শ গোপন ক'রে সমকালীন সেজে বাহবা পেতে চান নি। তাঁর মতো "নিবিষ্টচিত্ত পাঠক", অফুরন্তভাবে সৃজনশীল শিল্পী", শব্দসজ্জায় বিস্ময়কর ভাবে সতর্ক এবং সাহিত্যবোদ্ধা সম্পাদক রবীন্দ্র পরবর্তীকালে বিরল। জীবনসায়াহ্নেও আত্মস্মৃতিমূলক অপূর্ব দুটি গ্রন্থ রচনা। (আমার ছেলেবেলা, আমার যৌবন) এবং মহাকাব্য পরিক্রমা (মহাভারতের কথা) প্রমাণ করে যৌবনকে বয়সের দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। এই সক্রিয়তা ও নিষ্ঠা আমাদের অনেক কিছু শেখাতে পারে, অনেক ব্যাপারে সচেতনও করতে পারে।

॥ খ ॥

কল্লোল পর্বের গল্পকারদের মধ্যে সবচেয়ে শব্দসচেতন দুজন শিল্পী হলেন বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। গল্পের আঙ্গিক যে নিরন্তর পরিশ্রম-লব্ধ, এটা সহজেই চোখে পড়ে। এই নিরন্তর অধ্যবসায়ের ফল তাঁর গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অভিনয়, অভিনয় নয়' (১৯৩০) সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্য বলেছিলেন: "ভাষায় ও গল্প লেখবার রীতিতে তাঁর দখল অসামান্য।" একালের সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"লেখার ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতেও মানুষ হতে পারে। ······বানানে, শব্দচয়নে, যতিচিহ্নে মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ।"১৯ স্বয়ং বুদ্ধদেব নিজের

লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "সব সময় ভালো গল্প লিখতে না পারলেও সব সময় ভালো লেখা লেখবার দিকে আমার আত্মসচেতন মনের যে অধ্যবসায় ছিলো সেটা আমার একটা মস্ত শিক্ষা হয়েছে।" বুদ্ধদেব একসময় চাইতেন মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠুক, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই "শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, মাত্রা ও ধ্বনিজ্ঞান। প্রথম জীবনে অবশ্য তা অনায়ত্ত থেকেছে। বরং শত অধ্যবসায় সত্ত্বেও প্লটের কথা চিন্তা না করেই ভাষাচয়ন বা রচন ব্যাপারে তাঁর এক ধরণের আসক্তি অনেক ক্ষেত্রে অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। তাঁর এই দুর্বলতা প্রমথ চৌধুরীর সতর্ক দৃষ্টিতে এড়িয়ে যায় নি। তিনি লিখেছিলেন ঃ "বুদ্ধদেবের গল্পের ভাষার ও ভাবের অন্তরে ইংরাজিতে যাকে বলে forced তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত।"২১ শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর উপন্যাস প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। গল্পের ক্ষেত্রে কথাটি প্রযোজ্য হবে।

বুদ্ধদেব বসুর গল্প যে উদ্ভাবনী শক্তির বিচারে দুর্বল তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। নিজের লেখার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন—"ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকেই ঝোঁকটা বেশী।"২২ প্রথমাবধি কবিতাচর্চায় নিরত বলেই গীতিকবির প্রবণতা তাকে ঘটনা অপেক্ষা বর্ণনার দিকে আকৃষ্ট করেছে বেশী—বর্ণনা ভাব বা পরিবেশগত যাই হোক না কেন। দ্বিতীয়তঃ, জীবনের বহুবিচিত্রতা ও বিবর্তন তাঁর নেই, ফলে বর্ণনার দিকে ঝোঁকটা স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ, শিল্পের জন্য শিল্পনীতিতে বিশ্বাস ঘটনাকে সুনির্দিষ্ট মোড় ঘোরানোর দিকে না নিয়ে গিয়ে বরং কোনো একটা পরিবেশ বা মুহূর্ত বা ভাবনাকে নিয়ে তন্ময় থাকতেই বেশী পছন্দ করে। 'রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে প্লট প্রধান উপন্যাস অপেক্ষা, বক্তব্যপ্রধান, ভাবনির্ভর, কাহিনীর দিকেই তাঁর আগ্রহকে বুদ্ধদেব গোপন রাখেননি। এমন কি যে গল্প 'অতিকথনে ভারাক্রান্ত' বা দুর্বল হলেও কবিত্বশক্তির জোরে উত্তীর্ণ হয়ে যায় সেদিকে তাঁর পক্ষপাতকে অস্পষ্ট রাখেন নি। দু একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ১৯২৪-এ 'জ্বর' গল্পে জ্বরে আক্রান্ত রমাপতির বর্ণনা, তারপর বন্ধুদের আড্ডায় বিভিন্ন অধ্যাপকদের আলোচনা, বাড়ী ফিরে জ্বরের ঘোরে মনের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা—শেষে জ্বর মুক্তির বর্ণনার মধ্যে গল্প সমাপ্ত। লেখক বিভিন্ন মুডগুলোই ধরতে চেয়েছেন। ১৯৩৩-এ 'তুলসীগন্ধ' গল্পের মধ্যেও এই বর্ণনা প্রবণতা আরও তীব্রতর ভাবে মোহময়। গল্পের শুরু মিহির কুমার সোমের ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি সময়ের মনের নড়াচড়া নিয়ে। দীর্ঘ বর্ণনা প্রস্তের রচনা মনে করায়। দুপুরে ঢাকার পথে স্ত্রী কমলা পূর্বস্মৃতির সুরভিতাড়িত হয়ে হারিয়ে যাওয়া অতীতকে টেনে নিয়ে আসে ম্লান বর্তমানের মধ্যে। তার প্রেমিকের বাড়ী, সেখানকার তুলসীগন্ধের স্মৃতি জেগে ওঠে বেশী করে। বর্ণনা অপর্যাপ্ত, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা

প্রবল সংহতিতে দৃঢ়তা পায় না, তেমনি দুর্বার হয়ে ওঠে না। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্পে দীর্ঘ দুই অনুচ্ছেদে 'জ্যোতির্ময়' সকালের প্রয়োজনীয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাব্য-প্রেমিক একটি যুবক যে টেবিলে বসে আনমনে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সেটাই বলা হয়েছে। এদিক থেকে চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় 'একটি লাল গোলাপ' গল্পে। অফিসের সাধারণ চাকুরে প্রতাপ মায়া-বৌদির জন্মদিনের নিমন্ত্রণে অসংখ্য সংকোচ আর ইচ্ছারদ্বন্দ্বে আবর্তিত হতে হতে দামী একটা গোলাপ নিয়ে গিয়েও শেষপর্যন্ত দরজার কাছে পৌঁছে গোলাপটা ফেলে দেয়, যদি এই সামান্য উপহারে কেউ কিছু বলে। নিমন্ত্রণসভার সমাপ্তিতে গণ্যমান্য অতিথিদের পায়ে লাগে সে ফুল, প্রশংসা হয়, মায়ার বোন ছায়া খোঁপায় তুলে নেয়, আর প্রতাপ নিঃশব্দে সরে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বর্ণনার অতিরেক এ গল্পে আশ্চর্য সার্থকতা পেয়েছে। প্রতাপের ভীরুতা অভ্যাগতদের প্রবণতা, বর্ণনা এবং মধ্যে মধ্যে একটি দুটি সংলাপের মধ্য দিয়ে সুন্দর ফুটেছে। গল্পের সূচনা ঃ 'প্রথমে কোট খুললো, তারপর নেকটাই শার্ট, তারপর মোজা পাৎলুন। আয়নার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, দাঁড়িয়ে ধুতিটা পরে নিলো তাড়াতাড়ি—তাড়া থাকলেই দেরি হয় তার, একবার কোঁচা ছোটো, একবার কাছা আঁটো, পাঁচ সাত মিনিট লেগে যায় এক-এক সময়, ঘেমে যায়, কান্না পায়—কিন্তু মনে মনে যদি-ও ভয় করেছিলো, কী আশ্চর্য যে সে-রকম কিছুই হলো না, একটুও কষ্ট দিলো না ধুতিটা, একবারও অবাধ্যতা করলো না, ঠিকঠাক পরা হয়ে গেলো একেবারেই।—সুলক্ষণ!' দ্বিতীয় বাক্যটির সচেতন দীর্ঘতাও লক্ষণীয়। লেখক যে খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে এগোবেন সূচনা থেকেই সে প্রবণতা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে ঘটনার চেয়ে বর্ণনার ঝোঁকটা বুদ্ধদেব বসুর রচনায় প্রথমাবধি বিদ্যমান। বলা যেতে পারে আঙ্গিকের এই বিশিষ্ট রীতি তাঁর আঙ্গিকচেতনার প্রধান দিক। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি 'প্রগতি' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু মার্সেল প্রুস্তের উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ অনুবাদ প্রকাশিত করেন। সেখানে ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, "আধুনিকতম ইউরোপীয় সাহিত্যে একটা গভীর অন্তর্মুখীনতা এসেছে। ·· প্রুস্ত কোনো গল্প বলেন না, তাঁর কোনো প্লট নেই সুনির্দিষ্ট কোনো আরম্ভ বা শেষ নেই। ····· প্রুস্ত-এর চরিত্র আত্মপ্রকাশের জন্য কোনো বিরাট ঘটনার অপেক্ষা রাখে না ···· ।" প্রুস্ত-এর চরিত্রধর্মের সঙ্গে বুদ্ধদেবের মিল ছিল না, তাঁর A la recherche du temps perdu-র মতো কোনো উপন্যাস রচনার চেষ্টা বুদ্ধদেব করেন নি, কিন্তু প্রুস্ত যে তাঁর শিল্পী-মানসকে অংশতঃ আনুকূল্য দান করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য অনুযায়ী নাটকীয়তার চেয়ে স্বগতোক্তির দিকেই তার ঝোঁক

বেশী।২৩ ঘটনাধর্মী গল্পে নাটকীয়তার সুযোগ অনেক বেশী, তা স্বাভাবিকও হয়। সে নাটকীয়তা গল্পের অন্তঃস্থলে কাহিনীর মোড় পরিবর্তনে সহায়তা করে, সমাপ্তিতে আকস্মিক পরিবর্তনে বা ঘোষণায় গল্প নূতন তাৎপর্য পেয়ে যায়। বুদ্ধদেব বসু সাধারণতঃ সে পথে যান নি। 'প্রথম ও শেষ' গল্পে পারস্পরিক পত্র মাধ্যমে এই স্বগতোক্তি ব্যবহারের চমৎকার উদাহরণ আছে। 'প্রশ্ন' গল্পে ভবকুমারের ছেলেকে বাঁচানোর সঙ্গতির অভাবের বর্ণনায় এই স্বগতোক্তি চমৎকার। 'একটি লাল গোলাপ' গল্পে প্রতাপের অজস্র স্বগতোক্তি তার সংকোচপূর্ণ চরিত্রকে ফোটাতে সহায়তা করে। আকস্মিকতাকে লেখক কয়েকটি গল্পে ব্যবহার করেছেন গল্পের সমাপ্তিতে, যা মোপাসাঁ বা ও-হেনরী সুলভ। যেমন, 'বিরূপাক্ষ দেবের কাহিনী' গল্পে। সমাপ্তিতে, আত্ম-পরিচয় দিয়ে চলে যাবার মধ্য দিয়ে অর্থের তৃষ্ণা কিভাবে সাহিত্যিক-সততার অপমৃত্যু ঘটায়, সে বেদনা প্রকাশিত। 'রাধারাণীর নিজের বাড়ী' গল্পের সমাপ্তিতে রাধারাণীর শিশু পুত্রের মৃত্যু তার বাড়ীবানানোর ছেলে নিয়ে সুখ-শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টির প্রবল বাসনাকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে গেলো। 'অসমাপ্ত গল্প'-এর সমাপ্তিতে অধ্যাপককে গণেশের দলের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাও আকস্মিক। তবে লক্ষণীয়, শেষ দুটি গল্পে আকস্মিক ঝাঁকি থাকলেও পরে লেখক দীর্ঘ বর্ণনার লোভ সামলাতে পারেন নি। ফলে 'আকস্মিকতা র বিস্ময় পাঠকের মনে ঝিমিয়ে আসে।

লেখক বলেছেন তাঁর লেখায় 'উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে'ই ঝোঁক আছে। বর্ণনাপ্রবণতা তাঁর লেখায় দুভাবে কাজ করেছে, তার মধ্যে একটা হলো পাত্র ও পাত্রীর মনের কথাকে অনর্গল বাইরে টেনে আনা, কিংবা বর্ণনা মারফৎ তাদের নানা দিক তুলে ধরা। 'এমিলিয়ার প্রেম' গল্পটা নেওয়া যাক। শিল্পী ভাস্কর রায় ভালোবাসে এমিলিয়াকে। সে ভালোবাসা 'হিংস্রআবেগে' উন্মত্ত। ঘটনাচক্রে ভাস্কর একদিন জানতে পারলো এমিলিয়ার প্রেম ছিল প্রদোষ ঘোষের সঙ্গে। তখন, "বাইরে, শীতের হলদে রোদ্দুর ভাস্করের মনে হলো যেন কালির আঁচড়, কালো। তার চোখের পাতা উঠলো পড়লো কয়েকবার। 'ঈশ্বর' মনে মনে সে বললো 'ঈশ্বর'। যেন বিশাল অন্ধকারের কেন্দ্রে সে দাঁড়িয়ে : কঠিন নিষ্ঠুর অন্ধকার। কালো, কিন্তু মাঝে মাঝে লাল, রক্তের মতো। উজ্জ্বল-লাল, লাল-আপেলের মতো রঙের, বাসনার সেই চিরন্তন ফল—রক্তের মতো উজ্জ্বল। কঠিন, নিষ্ঠুর, উত্তপ্ত ঘৃণা। অন্ধ হয়ে গেল ভাস্কর, অন্ধভাবে উঠে বসলো ট্যাক্সিতে।" লেখক এখানে ভাস্করের মনের উত্তালতার এক অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। কিংবা ওই গল্পের শেষে প্রেমকে চিরন্তন করার ভয়াক্ত আগ্রহে ভাস্কর যখন আচ্ছন্ন এমিলিয়াকে গলা টিপে হত্যা করলো সে বর্ণনাও অসাধারণ। "আস্তে আস্তে' অতি

গভীর প্রেমে, ভাস্করের জোরালো আঙুল গভীর হয়ে বসে গেলো এমিলিয়ার গলায়। ফুলে উঠলো নীলশিরা। এতক্ষণে, এতক্ষণে পরিপূর্ণতা! এমিলি, আর কি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে তুমি? এখন চিরকাল তুমি আমার, চিরকালের মধ্যে তুমি আমার। তোমার জীবন আমার দু-হাতের মধ্যে পেয়েছি; আ— এতক্ষণে সম্পূর্ণ করে পেয়েছি, দুই হাতের মধ্যে পেয়েছি তোমাকে এতক্ষণে। এখন আর আমাকে ছেড়ে কোথাও তুমি যাবে না।" ভাবোচ্ছ্বাসময় স্বগতোক্তির এই বর্ণনায় ভাস্করের উদ্দাম-আবেগ স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। এই দিক থেকে 'তারা তিনজন' গল্পেরও উল্লেখ করা যায়। তিন যুবক অসিত, হিতাংশু আর বিকাশ ভালোবেসেছিলো অন্তরাকে যে ছিলো তাদের মোনালিসা। সে ভালোবাসার মধ্যে ভালোলাগার ভাগটাই হয়ত বেশী ছিল। অন্তরার বিয়ের দিন কবিপ্রাণ বিকাশের মানসিকতার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক : "বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলেই মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষরাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিল তখন— মোনালিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু একটু করে আলোর বেরিয়ে আসা দেখতে দেখতে যে আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এল আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, শানাইয়ের সুরে চোখ ভরে উঠলো জলে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে, শুনতে পেলাম বিয়ে-বাড়ির সাড়াশব্দ, শাঁখের ফুঁ;—কাছে গেলাম। মনে হলো একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভোর—এই আশ্চর্য অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না— গায়ে হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমিতো তাকে দেখতে পাবো না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরকার চলাফেরা কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরলো, আমার চোখের সামনে কাঁপতে কাঁপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেলো, ফুটে উঠলো মাঠে মাঠে গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর একবার ভোর হোল।" সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন —"অভিজ্ঞতার অবিকল অভিব্যক্তি কী উপায়ে সম্পাদ্য, তার সন্ধান মেলে বুদ্ধদেবের গল্পে ও প্রবন্ধে। ২৪ অন্ততঃ পূর্বোক্ত ধরণের অজস্র বর্ণনার ক্ষেত্রে এ মন্তব্য সুপ্রযোজ্য বলেই মনে হয়।

কবিত্বের কুশলতা তাঁর গদ্যে ওতপ্রোত। বস্তুতঃ গদ্য ও পদ্যের ভঙ্গিমাকে অনিবার্য ভাবে সমীপবর্তী করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁর দক্ষতাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই স্বীকৃতি জানিয়ে গিয়েছেন—"এই তোমার গল্প না-বলা গল্পটিকে তুমি যে এমন করে দাঁড়

করাতে পেরেছ সে তোমার কবিত্বের প্রভাবে।" (বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৪২) 'দময়ন্তী' কাব্যের ১ম সংস্করণের শেষে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন—"গদ্যের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাব্যের আবেগসঞ্চারী স্বভাবের মিলন ঘটাতে চেয়েছি।" একথা তাঁর গদ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই কথার সমর্থনে দুই একটি উদাহরণ দিই ঃ—

(ক) "দিন আরম্ভ হয়ে গেলো, কাজের উৎকণ্ঠায়, বিরক্তিতে, অশান্তিতে ভরা দিন ঃ পড়ে রইলো স্বপ্ন, মিলিয়ে গেলো তন্দ্রার অন্তর্লীন প্রেত-সংগীত।" (তুলসীগন্ধ) (খ) "আকাশে তারা। ফুলের মতো তারা ফুটেছে আকাশে। রাশি রাশি তারা ঝরছে। আকাশ থেকে, শূন্য থেকে। কিছু না থেকে। সীমাহীন সময়হীন মহাশূন্য একটি ফুল হয়ে ফুটছে, একটি তারা হয়ে জ্বলছে।" (অর্কেস্ট্রা)

বুদ্ধদেবের অধিকাংশ গল্পেই কম বেশী এ ধরণের বর্ণনা পাওয়া যাবে। যা তাঁর বিশেষ এই প্রবণতার পরিচয় বহন করছে।

বুদ্ধদেব বসুর বর্ণনাকুশলতা থেকেই সংক্ষিপ্ত রেখার টানে চরিত্রচিত্রণের সামর্থ্য এসেছে। বলাবাহুল্য, অতিবাহুল্যময় বাংলা সাহিত্যিক-ঐতিহ্যে তা উল্লেখযোগ্য অবশ্যই। ক) "তখন ওর বয়স—কত আর? চৌদ্দ কি পনেরো। সেই থেকে—বলা যায়—মেয়েরা ওকে মাথায় তুলে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই থেকে নারী সান্নিধ্যের মাখন খেয়ে অভ্যেস ওর।" (অতনু মিত্র সাবিত্রী বোস আর বুলু) (খ) "ছেলেটি নিতান্তই উপন্যাসের নায়ক—ছবি আঁকে-বাঁশি-বাজায়-গোছের।" (আকাশে যখন সাত তারা ফুটলো) (গ) "দক্ষিণের ঘরটায় পাহাড়ের মতো উঁচু ও মাঠের মতো বিস্তৃত একটি খাটে অগুনতি বালিশে শরীরটাকে আশ্রিত করে এককালীন প্রতাপশালী জমিদার, এককালীন বঙ্গবিখ্যাত মদ্যপ ও কৌমার্যহর জগদ্বন্ধু সরকার শায়িত।" (প্রশ্ন) (গ) "তবু যে চাকরিটা আমারই কাছে এলো শেষ পর্যন্ত, তা বলতে হয় নেহাৎই বরাত জোরে—মানে ভ্রমরের বরাত-জোরে, যে তখন পিতৃগৃহে পিয়ার্সের সাবান, ওটিন ক্রীম, গানের ওস্তাদ, শরৎবাবুর নভেল, মাসে দুটো ফিল্ম, এই সবের সাহায্যে আমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো।" (ঘরেতে ভ্রমর এলো)

এই অল্প-শব্দ ব্যবহারে চরিত্র বর্ণনার পাশে চকিত ব্যঙ্গের দীপ্তিও তাঁর লেখাকে আরও বর্ণবন্ত করে তুলতে সহায়তা করেছে। যেমন ঃ

. ক) "আমরা পুরোনো জমিদার। গেরিলার মতো আমাদের অবস্থা আজকাল ঃ রাশিয়ার নয়, আফ্রিকার গেরিলা।" (মাস্টারমশাই) (খ) "ওকে যারা শুধুই রমনীমোহন বলে জানে, তারা ওর কথা কিছুই জানে না। সুবিধে পেলে ও রামকৃষ্ণ মিশনে ঢুকে, দু চারবার আমেরিকায় গিয়ে বত্রিশ বছরে মরতে পারতো।" (অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস-

আর বুলু) (গ) ফিল্মের গানে মল্লিকা পাগল-পাগল করে—একটা ফিল্মও বাদ দিতে পারে না সে। এমনকি রেডিওতে 'আধুনিক' নামধারী সংগীত যখন রবীন্দ্রনাথের উপর পাশবিক বলাৎকার চালাতে থাকে, তখনো সে মন দিয়ে শোনে।" (ওস্তাদজি) (ঘ) "তা ছাড়া, সংসারে চলাফেরা করতে গেলে হয় ঠকতে, নয়ত ঠকাতে হয়; এবং ঠকানোটা যখন খুব বড়ো মাপে করা হয়, তখন সেটাই খুব সম্ভ্রান্ত ব্যাপার হয়ে ওঠে। ছিঁচকে চোরের জেল হয়, বড়ো চোর খেতাব লাভ করেন।" (বিরূপাক্ষ দেবের কাহিনী) এক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর তির্যক বাকভঙ্গী স্মরণীয়।

এর পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুর গল্পে কখনো কখনো শাণিত বুদ্ধি-উজ্জ্বল বিতর্কের প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। যেমন :— (ক) 'অভিনয় নয়' গল্পে বিজন, প্রতুল আর্ট ও জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা করছে। (খ) 'অতনু মিত্র, সাবিত্রী বোস—আর বুলু' গল্পে সাবিত্রী ও অতনুর কথোপকথনে সাহিত্য, প্রেম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তর্ক আছে। (গ) 'স্বর' গল্পে অধ্যাপকীয় আড্ডায়, নানান বিষয়ের আলোচনা আছে। লক্ষণীয়, এসব বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রেই উপরিতলশায়ী, গল্পে এর ভূমিকা গৌণ। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের কথা এক্ষেত্রে মনে পড়া স্বাভাবিক। তাঁর ছোটগল্প যথার্থই "প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের এক বিচিত্র বর্ণ সংকর।"* ২৫ 'ছোটগল্প', 'গল্প লেখা', 'ফর মায়েসী গল্প, প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'নীললোহিতের আদি প্রেম' ও 'ঘোষালের ত্রিকথা' গ্রন্থের অনেক গল্পেই দীর্ঘ প্রস্তাবনায় বৈঠকী তর্ক বিতর্কের ও শেষে প্রমাণ হিসেবে বা বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে একটি গল্পের উপস্থাপনার রীতি দেখা যায়। তবে এ ভঙ্গি আবার বুদ্ধদেবে বিরল। (যেমন— অভিনয় নয়)

বুদ্ধদেব বসুর ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্যের আর একটি দিক হলো তিনি মাঝে মাঝে পারম্পর্যরহিত ভাবনার ধারাবাহিকতা রচনা করেছেন যা নির্দ্বিধায় যথেষ্ট সাহিত্যিক নূতনত্ব সৃজনের প্রয়াস বলা চলে। (হয়ত প্রুস্ত ভার্জিনিয়া উলফ বা জেমস জয়েস এর অনুপ্রেরণা।) একটি উদাহরণই এক্ষেত্রে উপস্থিত করছি : 'একটি লাল গোলাপ' গল্পে মায়া—বৌদির বাড়ীতে অতিথিদের কথোপকথনের বর্ণনা : "এত হাসির খোরাক যোগাচ্ছিলেন সুরেশ্বর বাড়ুয্যে, থিয়েটারের পুরোনো অ্যাকটরদের মুদ্রাদোষ নকল করে; এক ফাঁকে সমী-দা বললেন, 'তা যা-ই বলো, ওঁদের মতো আর হলো না এখনো। শিশির ভাদুড়ীর সেই সীতা ডাক—' অনঙ্গ নাগ বললেন, হতে পারতো তপনকিরণ,—যদি বেঁচে থাকতো।' 'সত্যি।' অনুরাধা দেবী পাখীর মতো গলায় বলে উঠলেন, 'কী

---

* প্রসঙ্গত স্মরণীয় : 'লেখার ইস্কুল' এবং 'প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য' প্রবন্ধে তিনি প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি অনুসরণে বাংলা গল্প লেখকদের মুক্তির কথা বলেছেন।

রকম হঠাৎ মরে গেলো আর কী অল্প বয়সে।' 'ছাব্বিশ।' 'না তো, অমর মিত্র প্রতিবাদ করলেন 'উনতিরিশ'। এ নিয়ে তর্ক চললো খানিকক্ষণ, তারপর আটাশে মীমাংসা হলো। ক্যামেরাম্যান কথা বলেন কম, এতক্ষণে আওয়াজ দিলেন, 'এই সেদিনও দেখলাম, তপনকিরণকে—' একলা আপসোসের আওয়াজ করলেন দু-ঠোঁট দিয়ে—'আর কাল তার দাদার সঙ্গে দেখা হলো। চেহারার এমন মিল যে যদি কলকাতার রাস্তা আর দিন-দুপুর না হতো, তা হলে নিশ্চয়ই ভাবতুম ভূত।' 'কলকাতায় দিন-দুপুরে বুঝি ভূত বেরোয় না?' বলে উঠলেন ইন্দু দাশ, 'তাহলে শুনুন—' 'না, না' সুনন্দা দেবী দু-হাত তুলে চিঁ-চিঁ করলেন, 'রক্ষে করুন ইন্দু বাবু, ভূতের গল্প বলবেন না।' এই উৎসাহ পেয়ে ইন্দু দাশ বেশ গুছিয়ে আরম্ভ করলেন ভূতের গল্প, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমলোনা দেখে গল্পকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন গবেষণায়, পেত্নি আর শাঁকচুন্নিতে তফাৎ কী, জানোয়ার মরলেও কি ভূত হয়, না শুধু মানুষই। মামাবাবু হঠাৎ বললেন, 'একটা আশ্চর্য ঘটনা কি জানেন আপনারা? নাইন্টিন টোয়েনটি সিক্স-এ অরোরা নামে এক ঘোড়া ভাইসরয়জ্ কাপের বাজি জিতেছিলো।' বলেই চুপ করলেন। দু-তিনজন বলে উঠলো, 'আশ্চর্য কেন?' 'অরোরা মারা গিয়েছিলো সেদিনই সকালে।' ··· এ থেকে ঘোড় দৌড়ের গল্প উঠলো, লতিকা দেবী যোগ দিলেন তাতে, সুনন্দা দেবী-ও, কিন্তু এই প্রসঙ্গটিতে সকলের উপর টেক্কা দিলেন তাঁর স্বামী, অর্থাৎ সাহিত্যিক অমর মিত্র।'' একটা উচ্ছ্বলিত তরঙ্গের মতো এই সংলাপের পর সংলাপ বয়ে চ'লে। শেষপর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতারই সৃষ্টি করেছে যাকে চেতনা প্রবাহ রীতি বলা চলে। এই রীতির বৈশিষ্ট্য, অনুচ্চারিত আত্মকথন, মনোবিশ্লেষণ, তথাকথিত বহির্জাগতিক বাস্তবতার পরিবর্তে অন্তর্মুখিনতা, কোমল, স্বপ্নিল গীতিকবিতার ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহার, একটি দুটি চরিত্রের মনোজগৎ মারফৎ জগৎকে দেখার চেষ্টা ইত্যাদি। হেনরী জেমস, জয়েস ও প্রুস্তের রচনায় এই রীতির সার্থক উদাহরণ আছে। বুদ্ধদেব এ ব্যাপারে সামান্য পরীক্ষা চালিয়েছিলেন (যেমন, লালমেঘ, তিথিডোর উপন্যাসে)।

কল্লোলযুগের লেখকদের ভাষা ব্যবহারের একটা বৈশিষ্ট্য হল—বাক্যে ইংরাজী ভাষারীতি ব্যবহায়ের সচেতন প্রয়াস। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। ''তাঁর গোড়ার দিকের রচনায় শব্দ ব্যবহারে আঞ্চলিক প্রভাব এবং ইংরেজী শব্দ ও অন্বয়ের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর গদ্যে আঞ্চলিক-তাকে পরিহার করেছেন, ইংরেজি শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করেছেন, যদিও বহু ইংরেজি শব্দ বা বাগধারাকে বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন।''২৬ বুদ্ধদেবও স্বীকার করেছেন তাঁর সেকালের ''গদ্য ছিলো ইংরেজি বকনি-মেশানো, নড়বড়ে।''২৭ কয়েকটি উদাহরণ

দেওয়া যাক ঃ— (ক) "বাজে কথা হচ্ছে—ওর মতে—দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ।" (বোন) (খ) "সাতদিন তালিম দিলাম—ভাত খাওয়া অবধি।" (ঐ) (গ) "স্বচ্ছন্দ মধ্যবিত্ততার মধ্যে এই জীর্ণগৃহ একটা অশোভনতা, ঔদ্ধত্য।" (তুলসী গন্ধ) (ঘ) "তবে, এটা ঠিক— সুকুমার বলে—যে ও-দুটো শব্দের মানে ও জানে।" (ঐ) (ঙ) "অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে অমলা বললো···" (বোন)। এখানে দেখি ইংরাজী খণ্ডবাক্য ও বাক্যাংশের প্রয়োগ রীতি। অনেকে কল্লোলীয়দের ইংরাজী ভাষারীতির ব্যবহারকে সমালোচনা করলেও বাংলা-ভাষায় এই ধরণের প্রয়োগ কিন্তু ভাষার বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর গল্পমালায় অজস্র নূতন শব্দ নির্মাণের ও নূতনভাবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখিয়েছেন। কখনও প্রত্যয় যোগে, কখনও তৎসম শব্দের সঙ্গে ভিন্ন শব্দের একত্র ব্যবহারে তা প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, নবনির্মিত শব্দ বা বাক্যাংশ যখন গল্পের সঙ্গে, তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছে সেখানেই পরিশ্রমের সিদ্ধি। কয়েকটি উদাহরণ ঃ— ওদের নবিশি, অগণ্য মৃতাশী জীবাণুর বাসা, পা-টিতে শুরু হয়েছে পরমাণুর মুক্তি-নৃত্য, উন্নতির লৌহ-মুষ্টি, শরীরের স-লীল লঘুতা, ঘরদোরের নিরাসবাব অবস্থার, দোস্তালি পাতিয়েই, পৌশাকিক এক-আধটু পার্থক্য, সেরা পাশিয়েরা, নির্ভান উৎসাহে, মিরকুট্টে অস্টিন ইত্যাদি। এ ব্যাপারে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের আগ্রহ-ও স্মরণীয়।

গল্পগুচ্ছে বিশেষণ ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য একাধিক বিশেষণের সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ হেনরী জেমসের অনুরূপ ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।২৮ বিশেষণের এই স্তূপীকৃত ব্যবহার বুদ্ধদেবের রচনাতেও দুর্লক্ষ্য নয় ঃ— (ক) একটা চাপা, বোবা বুক-ভাঙা কণ্ঠ (খ) এই বাস্তব, জীবন্ত, প্রাণময়ী, উপস্থিত প্রতিমা (গ) ঐ নীরস নীরক্ত নিষ্প্রাণ নির্জীব মনুষ্যাকৃতি জড় পদার্থের কাছে ········ (ঘ) সেই বোমা-ভাঙা, ধোঁয়া-ঢাকা, ধোঁয়া-ওঠা ঠাণ্ডা ইংলণ্ডে? (ঙ) ক্ষুধার, অজ্ঞতার, লুব্ধতার, হিংস্রতার বীভৎস অকথ্য কাহিনী (চ) ঢলে পড়লো ঘন আচ্ছন্ন, অচেতন ঘুমে, মাতাল ঘুমে। বিশেষণ ব্যবহারের দিক থেকে-ও অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর সঙ্গে তুলনীয়। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—"গল্পগুচ্ছের বিশেষণে প্রায়ই এই রকমের স্বচ্ছতা দেখা যায়, যে বলে এবং যার উদ্দেশে বলা হয় দু-জনের পক্ষেই আয়নার মতো কাজ করে।"২৯ বুদ্ধদেব তাঁর গল্পে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোথাও কোথাও সার্থক।

দীর্ঘকাল প্রবাহিত সাহিত্যিক জীবনে লেখকের গল্পধারায় আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। তিনি যেমন বলেছেন—"এমন গল্প কিছু কিছু লিখেছি যাকে গল্পাকারে প্রবন্ধ বললে দোষ হয় না।"৩০ যেমন 'অভিনয় নয়'। এই ধরণের গল্পরচনার পেছনে

প্রমথ চৌধুরীর গল্পরীতির পরোক্ষ প্রভাব আছে অনুমান হয়। (খ) পত্রধর্মী ঃ প্রথম ও শেষ ঃ নীলা ও লীলার ৮টি চিঠি বিনিময় গল্পের পরিসর রচনা করেছে। গল্পের শেষে অবশ্য লেখকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এইভাবে ঃ "কিন্তু তার জীবনের চরম পরিপূর্ণতার কাহিনী আপনারা এখনো শোনেন নি। সেকথা বলবার ভার আমার নিজেরই নিতে হচ্ছে বলে আপনারা অপরাধ গ্রহণ করবেন না।" (গ) মিশ্র নাট্যধর্মী ঃ 'আকাশে যখন সাত তারা ফুটলো।' এই গল্পের প্রথমাংশে 'আমি' গল্পটি বর্ণনা করছে, কিন্তু শেষে ৫এর অধ্যায়ে বলা হোল ঃ 'বাকিটা নিয়ে একটা ছোটো-খাটো নাটক হয়। যেমন ঃ বলে লেখক বজ্রধর ও শর্বরীর সংলাপ নাটকের মতো সাজিয়েছেন। 'সুখের ঘর' পরিপূর্ণ নাট্যধর্মী, নাটকের মতো চারটি দৃশ্য ও ব্র্যাকটে চরিত্রের আচরণ নির্দেশিত আছে। 'প্রেমের বিচিত্রগতি'ও তাই। (ঘ) বৈপরীত্যে কথাবস্তু (Theme) প্রকাশের চেষ্টা : 'রেখাচিত্র' গল্পে বাস্তবজীবনের রুক্ষতা ও স্বপ্নের দুই পৃথক পরিবেশ উপস্থাপিত হয়েছে। 'প্রশ্ন' গল্পে নিম্ন মধ্যবিত্ত ভবতারণ তার মুমূর্ষু শিশুপুত্রকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যেতে পারেনা অর্থের অভাবে অথচ এককালের প্রতাপশালী জমিদার, মাতাল ও লম্পট জগদ্বন্ধু সাধারণ অসুস্থতাতেও অনায়াসে বাইরে যেতে পারে—পরের পর, পরের বর্ণিত হয়েছে। (ঙ) বর্ণনাপ্রধান—তুলসী গন্ধ রাধারাণীর নিজের বাড়ী, একটি লাল গোলাপ, বিরূপাক্ষদেবের কাহিনী (স্বগতোক্তিপ্রধান) (চ) ঘটনাপ্রধান—বোন, চোর। চোর।, ফেরিওলা, সবিতাদেবী, অসমাপ্তগল্প, একটি জীবন।

বুদ্ধদেব বসুর ১৯৩১-এ প্রকাশিত 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের গল্প 'জ্বর', 'মেজাজ' সাধুভাষায় লেখা। পরবর্তী গল্পগ্রন্থ থেকে চলিতভাষার প্রয়োগ। তাঁর প্রথম দিকের লেখায় দেখা যায় চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার বিষয়ে ও তিনি কিছুটা অস্থির। যেমন ঃ "ঘোলা জল চিরে স্টিমার সামনের দিকে চলছে ; তার দু পাশের জল উঠছে, পড়চে, দুলচে—তারপর ফেনা হয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, .." (রজনীহল উতলা) এখানে একই সঙ্গে 'চলছে' ও উঠচে'র ব্যবহার যা পরে আর মেলে না। এই অস্থিরতা থেকেই আসছে জন্য-র পরিবর্তে তরে-র কাবিক প্রয়োগ। যেমন ঃ "নারী-সুলভ লজ্জায় ক্ষণিকের তরে ও আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি।" (অভিনয়, অভিনয় নয়) বা, স্বরভক্তির প্রয়োগ "জোছ্‌নার মতো ম্লান বরণা।" (ঐ)

বুদ্ধদেবের ভাষা নাগরিক শব্দ ব্যবহারে বা প্রসঙ্গ উপস্থাপনায় উজ্জ্বল। এটা তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে ভাষাব্যবহারগত অতিরিক্ত পারিপাট্যবশতঃ কোথাও কোথাও ব্যাকরণধর্মে চলিত ভাষা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েও প্রকৃতপক্ষে এভাষা একধরণের অচলিত চলিত বলা চলে। এটা বিশেষ করে বর্ণনা অংশে লক্ষ্য হয়। তবে তাঁর শব্দনির্বাচন

এবং সামগ্রিক বাক্যরচনার মধ্যে ধ্বনিমাধুর্যসৃষ্টি লেখকের পরিশ্রমেরই স্বীকৃতি বহন করে। প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধদেবের ভাষায় লক্ষ্য করেছেন—'গতি ও প্রাণ'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বুদ্ধদেবকে বলেছেন—'সাবলীল লেখক।' তাঁর 'নির্বিকার স্বাচ্ছন্দ্যে'র আড়ালে দেখেছেন 'নিরন্তর পরিণতি।'৩১ তাঁর গদ্য সম্পর্কে একালের এক সমালোচকের মত প্রনিধান যোগ্য ঃ "প্রথম যুগে তিনি চেয়েছিলেন শুধু আধুনিক গদ্য লিখতে (তখনো তাঁর আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ যুক্ত হয়নি), তারপর ছন্দস্পন্দিত গদ্য' এবং সবশেষে লক্ষ হলো স্পন্দনময়তার সঙ্গে সংহতি। মধ্যপর্বে তিনি ছিলেন শব্দের সম্মোহে আবিষ্ট—শব্দ নির্বাচনে পাই অসামান্য ধ্বনিজ্ঞান, বর্ণনায় পারিপাট্য। কিন্তু তখনও সংহতি নয়, সৌন্দর্যই ছিলো তাঁর অভিপ্রেত।"৩২

ভাষা ও আঙ্গিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী দুজনেই বুদ্ধদেবের প্রেরণাস্থল বলে মনে হয়। তাঁর গল্পে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, কোথাও প্রবন্ধধর্মিতা, বর্ণনায় উইট-এর দীপ্তি অনেকক্ষেত্রে প্রমথ চোধুরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে আবেগের উৎসার, অবাধবর্ণনার প্রবাহরচনা, এমনকি (প্রথম দিকে) সাধারণ বাক্যবিন্যাসে, রবীন্দ্ররচনা তাঁকে যে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ করেছে তাতে সন্দেহ থাকে না। এই প্রসঙ্গেই আমরা স্মরণ করব ঃ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর মতোই বুদ্ধদেব বসু-ও কবি, গল্পলেখক এবং প্রাবন্ধিক।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ জগদীশগুপ্তের ছোটগল্প

॥ ক ॥

অতিতারুণ্যের উচ্চকন্ঠের ভিড়ে বয়সে বড় জগদীশচন্দ্র গুপ্ত এসে মিশেছিলেন তরুণ সাহিত্যধর্মের সঙ্গে মানসিক সাযুজ্যে। তরুণ বয়সে কবিতা রচনায় তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনা। জানা যায়, কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রভাবে তাঁর কবিতা "অভ্রান্ত নারী-তৃষ্ণার ক্লেশাকুতিতে" ভরপুর ছিল।১ কবিতা রচনার অভ্যাস তিনি আমৃত্যু রক্ষা করে গেছেন। ছাত্রজীবনে সিটি কলেজিয়েট স্কুল ও রিপণ কলেজের আবহাওয়া থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন তরুণ মানসিকতার তথা দেশীয় পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ আদালতের টাইপিস্ট হিসেবে। এই চাকুরীসূত্রেই সিউড়ী, সম্বলপুর, কটক, পাটনা, বোলপুর আদালতে তাঁর আনাগোনা চলে। ত্রিশবছরের চাকরী জীবনের ফাঁকে ফাঁকে এসরাজ, বেহালা বাজানো, বন্ধুসঙ্গ ছাড়াও সাহিত্য-সাধনা করবার সুযোগ ক'রে নিয়েছেন। কালি তৈরীর ব্যবসা, 'গুপ্তের গল্প' নামক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি স্বভাবধর্মবিরোধী কাজেও কখনো কখনো তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলির মতো তিনিও মফঃস্বল নিবাসী।

জগদীশগুপ্তের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত বিলম্বে হলেও "যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে" এর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন। তাঁর ১ম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' 'বিজলী' পত্রিকার ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী, উত্তরা, বঙ্গবাণী প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনে এবং প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তাঁর একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়। এসব গল্পের বিষয় বস্তুতে ও প্রকরণে এমন স্বাতন্ত্র্য ছিল যে পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর সাহিত্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু মফঃস্বলনিষ্ঠ, সহর ও নাগরিকতা-বিমুখ, অন্তরালপ্রিয় ছিলেন বলেই সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি স্বীকৃতি পান নি। তাঁর জীবন দর্শনের অসুস্থ এবং তিক্ত মনোভঙ্গি-ও ব্যাপক পাঠক-পাঠিকার পক্ষে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

জগদীশগুপ্ত তরুণ লেখকদের সহযাত্রী হলেও সোচ্চার বিদ্রোহী নন। কিন্তু, তবু তিনি যথার্থই বিদ্রোহী লেখক। 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' তাঁর রচনায় নেই। কিন্তু দরিদ্রের প্রতি দরদকে পাওয়া যাবে নীচের তলার পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশ নির্বাচনে। মিথুন প্রবৃত্তি তাঁর অন্যতম বিষয় হলেও কল্লোলীয়দের মতো প্রেমতৃষ্ণায় কাতর নন, উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন। শরীরীয়ানা তাঁর কাছে রোমান্টিক যতটা, তার থেকেও অনেক বেশী

গদ্যগন্ধী দুর্নিবার্য ব্যাপার। যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেবের পরিবেশে গোবিন্দ দাস ভক্ত জগদীশ ছিলেন "দেহ সম্পর্কে সকল শুচিবাই মুক্ত", তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি "প্রবৃত্তিতে ...... পাশবিক", "তাদের অস্তিত্ব একান্তভাবেই দেহসর্বস্ব।"২ তবে, প্রেমের গল্পে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি আঁতের কথা বার করে দেখানোয় যত্নবান হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়লেও এ প্রয়াস প্রশংসনীয়।

জগদীশগুপ্তের মানসে আর দু-একটি বিষয়ের উপস্থিতি যে কোন সতর্ক পাঠকের চোখে পড়ে। তাহল—নিয়তিবাদ ও দুঃখবাদ। জগদীশগুপ্ত বিশ্বাস করেন এ জগতে সর্ববিধ মানসিক প্রচেষ্টার অপমৃত্যু অনিবার্য। তাই তাঁর চরিত্রগুলির যাবতীয় আকাঙ্খা, সদিচ্ছা ও কর্মপ্রবণতার পরিণাম বিপর্যয়ের মধ্যে, এক ক্রুর রহস্যময় শক্তি যার নাম নিয়তি, যেন তাদের তাড়া করে ফেরে। তারা কর্মফলবিশ্বাসী, অভিশাপ বা ব্যাখ্যাতীত ঘটনা তাদের নিত্যসহচর। বলাবাহুল্য, এ চিন্তা চূড়ান্তভাবে অনাধুনিক। অন্যদিকে তাঁর "গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তায়।"৩ শোপেনহাওয়ার, নীটশে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের দ্বারা প্রচারিত দুঃখবাদ তাঁকে গোবিন্দ দাস ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতোই আকৃষ্ট করে তোলে তাই জীবনের সুখ সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতায় তিনি উদাসীন, দুঃখ, কুশ্রীতা, মালিন্যকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন। চিরন্তন দুঃখের মধ্যে 'অশ্রুর কমলে' 'দুঃখ-সরস্বতী'কে পূজার কথা যখন বলেন তখন তা কথার কথা থাকে না।৪ তবে দেহবাদী মোহিতলাল বা দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত ধর্মভাবুকতায় পৌঁছে পরিত্রাণ পেয়েছেন, কিন্তু জগদীশ তা চান নি। তিনি "আগাগোড়া তিক্ত, রুক্ষ ও নৈরাশ্যবাদী। তাঁর লেখা পড়লে আমাদের মূল্য বোধগুলি প্রকাণ্ড ভাবে নাড়া খায় এবং আমরা স্বভাবতই অস্বস্তিবোধ করি।"৫ আজীবন এই ভঙ্গিতে তিনি মানবমনের অন্ধকার গোলকধাঁধায় আলো ফেলার চেষ্টা করেছেন। হাস্যোজ্জ্বল পরিস্থিতি তাঁর রচনায় বিরল। এক একটি গল্পে তা সামান্য পরিমাণে আসে (যেমন, জগন্নাথের যন্ত্রণা, মারে কেষ্ট রাখে কে, কামাখ্যার কর্মদোষে, আঠারো কলার একটি প্রভৃতি), কিন্তু তার আগে বা পরে উপস্থিত "পাপ ও দুর্নীতির এক নীরন্ধ্র জগৎ"৬ যেখানে জীবন নিরন্তর হতাশার উৎস।

জগদীশগুপ্ত জীবন সম্পর্কে উচ্ছ্বাসপ্রবণ নন, এবং জীবন বিষয়ে অনভিজ্ঞ নন। অভিজ্ঞতার পরিসর সংক্ষিপ্ত এবং অভিনবত্বহীন হলেও অনুভূতি বিন্যাসের গুণে তা অসাধারণ জীবনবোধ সঞ্চার করে পাঠকের মনে। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ জগদীশ গুপ্তের 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"জগদীশ শরৎ চন্দ্রেরই গোত্রজ, তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো 'কামনা বাসনার পাঁকে .... পদ্ম ফুটিয়ে তোলবার', মিথ্যা ও অসুন্দরের মধ্য থেকে 'সত্য ও সুন্দরকে' প্রকাশিত করার চেষ্টা মোটেই

জগদীশ গুপ্তের রচনায় নেই। বরং বলা যায়, জগদীশ গুপ্ত তাঁর 'শরৎচন্দ্র' (কালি-কলম ভাদ্র ১৩৩৪) প্রবন্ধে শরৎসাহিত্যে যে সত্যনিষ্ঠা, দরদ, স্পষ্ট সত্যকে "নিম্নতম স্তর পর্যন্ত যেন শূলের আঘাতে ওলটপালট করিয়া তাহাকে সূর্যের প্রখর আলোকের মাঝখানে" টেনে আনার ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, তা শরৎসাহিত্যে যতটা প্রাপ্তব্য হোক আর নাই হোক, জগদীশের নিজের রচনায় মেলে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এইখানে যে দুজনেই গ্রাম বাংলার সমস্যা ও যন্ত্রণার রূপকার, গ্রামের সাধারণ দীন, চরিত্রের মানসপট উন্মোচনে আগ্রহী। সমাজ-অধ্যয়নে জগদীশও কম নিষ্ঠাবান নন। কিন্তু শরৎচন্দ্র জীবনের মহত্ত্বে সদা-বিশ্বাসী থেকে শিল্প কায়া নির্মাণ করেন, কিন্তু জগদীশ তা করেন না। কিছুটা ব্যক্তিগত এবং কিছুটা পরিবেশগত তিক্ততায় জগদীশের কাছে জীবন দুঃখময়, সংশয় ও অবিশ্বাসে পূর্ণ। "অভাব দুঃখ হিংসা দ্বেষ হননেচ্ছা অনুচিত আসক্তি ও অনাচারে থৈ থৈ করা" ৭ যে জগত দর্শন করানোয় তাঁর ইচ্ছা, ঘোষণা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র তা পারেননি বা করেননি। জগদীশ গুপ্ত বাস্তব জগৎ নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখলেও সমকালের নৈরাশ্যকে দেশকালের পটে অনুধাবন করতে শেখেন নি। ('মহেশ' গল্পে গোফুরের কলে কাজ করতে যেতে বাধ্য হওয়াকে 'দৈবাগত ঘটনা' বলার মধ্যেও তা স্পষ্ট হয়।)৮ তাই পাশব ও অন্যান্য প্রবৃত্তির বর্ণনায় বিস্ময়কর সততা ও দক্ষতা দেখালেও লেখক চরিত্রের দুঃখজনক সীমাবদ্ধতার উদাহরণ হয়ে রইল। এই সূত্রেই মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলতে পারে। মানিকবাবুর মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ-এর গল্পগুলির মতো জগদীশচন্দ্রের অনেক গল্পের আকর্ষণ, বিশেষ মানসিক জটিলতার স্বরূপ পরিচয়ে, তার শিল্পিত রূপায়ণে নয়। জগদীশের 'চার পয়সায় এক আনা,' 'উর্মিলার মন', মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল, মানিক-ধর্মী রচনা, 'কলঙ্কিত সম্পর্ক', 'ফাঁসি' গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের এক সাধারণ প্রবণতা হিসাবে A. C. Ward এর একথা মানতেই হবে যে—'No previous generation had shown so close an interest in mental and spiritual disturbance as to create a growing assumption that most men and women are cases to be diagnosed, that the world is a vast clinic, and that nothing but abnormality is normal." ৯ জগদীশ ও মানিক দুজনেই এই যুগবৈশিষ্ট্যের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। একজন আধুনিক লেখকের মতোই তাঁদের আকর্ষণ মানসরহস্যের দিকে, তাঁদের আগ্রহ মানসিক স্তর পরম্পরাকে চিত্রিত করার দিকে। তবে অনেক সময় দুজনেই শিল্পিত বিন্যাসে উদাসীন। জগদীশ গুপ্ত গল্পের ঘনঘটায় বিশ্বাসী নন, পরিবেশ রচনার অভিনবত্বে তাঁর আকর্ষণ নেই, তবুও মাঝে

মাঝে আকস্মিক সংস্থান রচনা ক'রে তিনি পাঠককে চম্‌কে দেওয়ার লোভ ছাড়তে পারেন না। এক্ষেত্রে দুজনেরই একটা ভঙ্গি হল মানসিক স্তর রচনায় অনেক সময় কয়েকটি প্রয়োজনীয় স্তর বাদ দিয়ে যান বলে পাঠকদের অসুবিধেয় পড়তে হয়। একে 'ত্রুটি' বলা যাবে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। একথা অনস্বীকার্য যে জগদীশ গুপ্ত অপেক্ষা "জীবনরহস্য অনুসন্ধানে মানিক আরো গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রও যেমন প্রশস্ততর, তেমনি জিজ্ঞাসাও তীক্ষ্ণতর।" ১০ কিন্তু তবু সাহিত্যসাধনায় অগ্রসর হতে হতে দুজনের পথ আলাদা হয়ে গেল। একজন অন্ধ অদৃষ্টের বৃত্তেবদ্ধ হলেন, অন্যজন পৌঁছে গেলেন চড়া আলোর রাজপথে। শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই লেখকের মনোভঙ্গির বিচারে সুন্দরভাবে বলেছেন যে—"জগদীশবাবুর বিষয় হল মানুষের নিঃসহায়ত্ব, আর যাত্রারম্ভের মুহূর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিল মানুষের নিরুপায়ত্ব।······দুইই মানুষের নৈঃসঙ্গ চেতনার দু-পিঠ। আর মানিকবাবু জগদীশগুপ্তের অপেক্ষা অগ্রসর এই কারণে যে, তাঁর চরিত্রেরা এই নিরুপায় বোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, হেরে গেলেও করে না।"১১

ত্রিশ বৎসরাধিক সাহিত্যে সক্রিয় থাকলেও জগদীশ-গুপ্ত সামাজিক রাজনৈতিক তরঙ্গভঙ্গে সচেতনভাবে উদাসীন। সে কারণেই তিনি বুঝতে পারেননি পৃথিবীতে এত অনাচার, বিকার ও দৈব বা নিয়তিবিশ্বাসের উৎস কোথায়, বুঝতে পারেননি একে অতিক্রমের সাধনতত্ত্ব ও প্রক্রিয়া। (সে কারণেই বাস্তবতার চিত্রণে তিনি যতই শক্তিশালী হোন তাঁকে মোপাসাঁ ও জোলার সঙ্গে তুলনা সঙ্গত নয়।১২) অপরপক্ষে মানিকবাবু তা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর চরিত্রেরা একদা জাগতিক সমস্যার সংকটমুক্তি দেখেছে সাম্যবাদী চেতনায়। ফলে, জগদীশগুপ্তের রচনায় দুঃখবাদ, নিয়তিবাদ, হতাশা আর বিকারের স্থায়ী রাজত্ব। সেখানে সমাজ যে পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে এর সামান্যতম ইঙ্গিতও নেই। পরিবর্তে তাঁর গল্পে অভিশাপ সত্য হয়ে যায় (হাড়), সন্ধ্যেবেলা এলোচুলে খোলাবারান্দায় শোয়া ও বেড়ালের ডাক অশুভ হয়ে ওঠে (শত্রু), যাত্রাপথে শঙ্খচিল না দেখায় নানা বাধা আসে (কার্যকারণ)। এদিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে অনাধুনিক। তবে কি তিনি শুধুই নিন্দাযোগ্য, বর্জনীয়? তা বলা ঠিক হবে না। জীবন সম্পর্কে বক্রদৃষ্টিতে, পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতায়, মনোবিশ্লেষণের পটুত্বে, চরিত্ররচনায় ঘটনার ঘনঘটার ওপর থেকে গুরুত্ব সরিয়ে 'আঁতের কথা'র দিকে নজর দেওয়ায়, সর্বোপরি ঋজুকঠিন প্রকাশ ভঙ্গিতে তিনি তো স্পষ্টতঃ আধুনিক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প—'পেয়িং গেস্ট' বিষয় ও বিন্যাসে কল্লোলীয়দের মত নয়, বরং বিদেশী গল্পের ধাঁচ মনে পড়ে। বিয়ের পর গল্পের 'আমি' কাজের সন্ধানে কলকাতায় এসে বন্ধু-

ননীর বাসায় পেয়িংগেস্ট হয়েছিল। প্রথম দিকের আদরের আতিশয্য কেটে গিয়ে এক-সময় অবহেলা শুরু হয়ে গেল। একদিন অধৈর্য হ'য়ে এই 'আমি' একটা হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বাজারে ছড়ানোর ব্যবস্থা করে। তাতে লেখা ছিল, মাছের মাথা খেলে নানা রোগ হয়, এটা এক জার্মাণ ডাক্তার প্রমাণ করেছেন। ননী এই হ্যাণ্ডবিল পড়ায়, 'আমি'র পাতে সেদিন মাছের মাথা পড়ে কিন্তু বাড়ীতে মাথা আনা বন্ধ হয়। একটা অন্তর্গূঢ় নিষ্ঠুরতা ও কিছুটা কৌতুক মেশানো এই গল্পে লেখকের নিজস্ব তা তেমন কিছু ফোটে নি। 'দৈবধন' বরপ্রার্থনা ও পুরাণনির্ভর কাহিনী, মনস্তত্ত্ব ও অলৌকিকতার সংমিশ্রণে পরিবেশিত। এটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে রচিত বলা আছে। তবে এরকম উল্লেখ আর চোখে পড়ে না। তাঁর প্রথম যুগের গল্প 'বিজলী'তে প্রকাশিত (২০ কার্তিক ১৩৩২) 'পল্লী শ্মশান'-এ দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ এক মানুষের মৃতদেহ সৎকারে ব্যর্থতায় মানবীয় প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, 'অভাগীর স্বর্গ'-ধরণে অমানবিক নীচতা ও সংকীর্ণতা এবং এক রহস্যময় নিষ্ঠুর শক্তির সক্রিয়তা। তাঁর কল্লোল ও কালিকলমের একাধিক রচনায় এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য প্রতি-ফলিত। 'ঘেন্নার কথা'য় (আষাঢ় ১৩৩৩) জীবনে যৌনতার সুপ্রাধান্য এবং অর্থলোভ ও সংকীর্ণতার কথা এসেছে। অশ্বিনী ভেদবমিতে মরলে তার শালা কেতু ভগিনীপতিকে বড়লোক প্রচার করে নিজের মর্যাদা-বৃদ্ধির চেষ্টা করে। টাকার লোভে বিধবা বোন ফুলির কাছে হাজির হয়ে শোনে ভাসুর কোদাল কুপিয়ে ঘর থেকে লুকানো টাকা নিয়ে নিয়েছে (যদিও সেটা বোনের বানানো গল্প)। কেতু এসব শুনে আপশোষ করে। ভাসুর তারিণী টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করে। তারপর গল্পটি আকস্মিকভাবে শেষ হয় অপ্রত্যাশিতের চমকসৃষ্টি ক'রে—"সেই দিন রাত্রি দেড়-প্রহরের সময় ফুলির ঘরের পেছন দিকটার বেড়ায় অতি সাবধানে তিনটি টোকা পড়ল। ফুলি চাপা গলায় বলল, কে? আমি। ফুলি উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল, বাইরের লোকটা ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাস করলো, কেতু চলে গেছে? হ্যাঁ, খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করে দিয়েছি। তোমায় নিয়ে গেল না যে? টাকাগুলো দিলেনা তা নেবে কি। তারিণী ফুলির থুৎনিটা দু-আঙুল দিয়ে নেড়ে দিয়ে বলল, ক্ষেপী।" এখানে যে অবৈধ লালসা উদ্ঘাটিত হয়েছে, তার নায়ক যে তারিণী, একেবারে শেষ পংক্তিতে তার নামের উল্লেখে অপূর্ব নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছে। 'যে যার কাজে'-তে লেখক বোধহয় দেখাতে চান এ সমাজে যে যার কাজ করছে, অবস্থান, বৃত্তি স্বভাব ও পরিবেশের প্রভাবে। একটি বেশ্যা মেয়ে নিজ-দুঃখের কথা বলে গৃহস্থের কাছে শাড়ী আদায় করে। রাতের দেহ-ব্যবসা দিনের কাজে শৈথিল্য আনে। একদিন মত্ত অবস্থায় কাজে এলে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। সে নিরুপায় হয়ে বেশ্যা-পাড়ায় ঘর নেয়। পূর্বোক্ত গৃহের কর্তার সঙ্গে বেশ্যাপাড়ার মুখে দেখা হলে

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে—"বাবু এদিকে কোথায় গেছলেন ?" হয়তো এই প্রশ্নে কর্তার চরিত্র-দোষের ইঙ্গিত রইল, কিন্তু স্পষ্ট হল না। 'জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি' গল্পের বিষয় ভিন্ন। গরীব কবিরাজ হরিহরের 'জ্বরশনি' নামের ওষুধের বিক্রী বাড়াবার জন্য এক ছাত্র বিজ্ঞাপনে কিছুটা অসত্যের আশ্রয় নিয়েছিল। এতে বিলেত ফেরত ডাক্তার নীলমণি রেগে গেলেও তার মেয়ে যখন 'জ্বরশনি' খেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে তখন সে এই ওষুধ বিক্রীর দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নেয়। গল্পের শেষে হরিহরের ভাগ্য পরিবর্তনে লেখক বলেন— "কিন্তু ললাট লিপির এই আকস্মিক পাঠ-পরিবর্তনের রহস্যটা আজিও তাঁর অজ্ঞাত।" অর্থাৎ, লেখক ললাট লিপির তাৎপর্য প্রমাণ করতে চান। তারাশঙ্কর প্রায় একই ধরণের প্লটকে 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসে ব্যবহার ক'রে কবিরাজ ও অ্যালোপাথ ডাক্তারের দ্বন্দ্বকে প্রবীণ ও নবীণ, ব্যক্তি ও যুগের পরিবর্তমানতার দ্বন্দ্বে উন্নীত করেছেন। কিন্তু জগদীশ তা করেননি বলে, এটা নেহাৎই 'গল্প' শোনানোর দায়িত্ব মিটিয়েছে। 'ক্ষিদের খোরাক' গল্পে আছে জমিদারী লালসায় এক গরীব মেয়ের অপমৃত্যুর কথা। জমিদার বজরা থেকে মালিনীকে দেখে তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে। মেয়ের মা রাজী হলে তাদের বাড়ী পাকা ক'রে দিয়ে বিয়ের দিন ঠিক ক'রে মালপত্র আনার জন্য কলকাতায় যায়, কিন্ত ফিরে আসে না। গ্রামের লোকের প্রচণ্ড বিদ্রূপে গর্ভবতী মালিনী জলে ডুবে আত্মহত্যা করে আর তার মা পথে পথে ঘোরে। এ গল্পে কিন্তু ব্যঙ্গ নেই, ভাগ্যহতা মালিনীর প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে। এই গল্পটিই পরে 'কড়ির দামে' নামে প্রকাশিত হয়। নামকরণ থেকে অনুমান হয়, প্রথমে লালসার গ্রাসের কথা লেখককে আকৃষ্ট করলেও পরে অর্থও প্রতিপত্তিশালীর কাছে অর্থহীনের বঞ্চনার সামাজিক প্রসঙ্গও বেশী গুরুত্ব মনে হয়েছে। 'বিনোদিনীর ব্রজ' উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু লেখক-মানসের ব্যতিক্রমী উদাহরণ। রায়তহিতৈষিণী সভাশেষে সস্ত্রীক বাড়ী ফেরার পথে নায়ক সদ্যজাগ্রত সহানুভূতিবশতঃ বোঝে শুধু মধ্যবিত্তের নয় বঞ্চিত, নির্যাতিতদের জন্য-ও স্বরাজ প্রয়োজন। কিন্তু দুরাচারী জমিদারদের জন্য প্রয়োজন ধ্বংস। এই চিন্তায় উত্তেজিত নায়ক বঞ্চিতদের সঙ্গে সহাবস্থানের ঝোঁকে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ওঠে। কিন্তু দেখা গেল কামরার যাত্রীরা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার স্ত্রীর দিকে। বসবার জন্য লাফাতে হল, কিন্তু কেউ পা তুলল না, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে গান ধরল, বারণ করলে মাত্রা ছাড়াল। শেষপর্যন্ত নায়ক কামরাবদল করতে বাধ্য হল। বিনোদিনী এরপর আর স্বরাজ লোভে অন্তঃপুরের বাইরে আসে নি। এ গল্পে উচ্চবিত্ত ও দরিদ্রের পারস্পরিক অবজ্ঞা ঘৃণা চাপা ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তবে গল্পটিকে ব্যতিক্রম ধ'রে বলা যায়, জগদীশ গুপ্তের গল্পে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সযত্নে নির্বাসিত, যদিও সেকাল

প্রবল রাজনৈতিক তরঙ্গভঙ্গের কাল। 'একটি দুটি' গল্পে ঘটনার অবিশ্বাস্য পুনরাবৃত্তি এবং অভিশাপের সত্যতা ফিরে এসেছে। এক প্রৌঢ় ডাক্তারের ভুল ওষুধ ও গাফিলতিতে এক কাফিরিস্তানীর চোখটা নষ্ট হলে সে প্রতিশোধ নেবে বলে যায়। ত্রিশবছর পরে অনুরূপ রোগে এই ডাক্তারের বাম চোখটা নষ্ট হয়ে যায়। কাকতলীয় ঘটনা এখানে অভিশাপের কার্যকারিতায় আমাদেরকে পিছন দিকে টেনেছে। লেখক যে এসব বিশ্বাস করেন তা 'হাড়' গল্প মারফৎ-ও প্রমাণিত হয়। রসি-কে সবাই মন্ত্রসিদ্ধ ডাইনি বলে বিশ্বাস করত। পাড়ার একটি বউয়ের মৃত্যুতে তা পুনঃপ্রচারিত হয়। স্বামীর সঙ্গে তার নিত্যকলহ হোত। একদিন মাছ মারতে যাবার সময় কোঁচ তুলে রসিকে মারতে গেলে সে অভিশাপ দেয়—"তুই মাছ মারতে চলেছিস—ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে।" তারপর রাতে সনাতন আর তার ছেলে যখন নিজ হাতে ধরা চিতল মাছের ঝোল খায় তখন গলা থেকে রক্ত উঠে দেহ বেঁকে চুরে গোঁ-গোঁ শব্দ ক'রে সনাতন মারা যায়। লেখক এই মৃত্যুর একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ দিলেও তা সার্থক হয় নি, লেখকের অভিপ্রায়ও তা নয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, অতিলৌকিকতায় বিশ্বাসী তারাশঙ্কর 'ডাইনী' গল্পে যে নিপুণ পরিবেশ রচনা ক'রে ঘটনায় ভিন্ন জগতের আভাসকে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন, তা এ গল্পে নেই। "পয়োমুখম্" গল্পে গ্রাম্য সংকীর্ণতার পরিবেশে নিষ্ঠুরতা চিত্রিত হয়েছে। ভয়ঙ্কর অর্থপিশাচ কবিরাজ পুত্র ভুতনাথের আয়ুর্বেদে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়ে তার বিয়ে দেয়, পণের টাকা আত্মসাৎ করে, পরে আরো অর্থের প্রয়োজনে ঔষুধ প্রয়োগে পুত্রবধূকে হত্যা করে নতুন জায়গায় পুত্রের বিয়ে দিয়ে পুনরায় পণের টাকা আত্মসাৎ করে। তৃতীয় হত্যার পূর্বে ভুতনাথ বুঝতে পেরে বাবার দেওয়া ঔষধটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন—"এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল না, বাবা। পারেন ত' নিজেই খেয়ে ফেলুন।" এই যে প্রতিরোধ, এটুকুও জগদীশের গল্পে কিন্তু দেখা যায় না। এ গল্পের মতো "তমসার পথে" গল্পেও লেখকের গ্রামসমাজ পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা প্রশংসনীয় মাত্রায় বিদ্যমান। সুরথের সঙ্গে যোগমায়ার বিয়ে সুখের হয় নি (তাঁর অনেক গল্পেই অসম স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ব্যবধান, স্ত্রীর নিগ্রহের কথা আছে)। স্বামীবঞ্চিত যোগমায়া ছেলেকে নিয়ে অন্যের দানের ওপর নির্ভর করে বাঁচছিল। থাকো নামে এক অসৎ মেয়ের প্ররোচনায় দামী দামী পিতল-কাঁসার বাসন সে সস্তায় বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়। তখন পুরুষেরা তার ঘরে উঁকি-ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করলেও সে ভিক্ষে করে, কিন্তু সতীত্ব ত্যাগ করে না। শেষে নিরুপায়ত্বের চরমে পৌঁছে সে পুরুষের ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু লেখক, অর্থের অভাবে পরিবেশের চাপে তমসার পথে যাবার এটুকু বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি আরও নিষ্ঠুর হলেন।

যোগমায়া পুরুষটির কাছ থেকে একটি টাকা পেয়ে দোকানে জিনিষ কিনতে গিয়ে দেখল সেটি পারামাখান ডবল পয়সা। ব্যাপারটা হাস্যকর তবে সামাজিক অবনমনের অতল-স্পর্শিতা চাপা থাকে নি।

জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্পের বই 'বিনোদিনী' (পৌষ ১৩৩৪) বোলপুরের কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে ও আর্থিক সাহায্যে ছাপানো হয় কিন্তু বইটির যথাযোগ্য সমাদর হয়নি, অধিকাংশ "প্যাকিং বাক্সের ভিতর রহিয়া গেল, পরে কীটে খাইল।"১৩ তবে, এনিয়ে বেদনাবোধ বাহুল্য, কারণ উপযুক্ত বিজ্ঞাপন এবং ঘটনাচক্র ছাড়া আমাদের দেশে কজন শক্তিমান লেখক যথাসময়ে যোগ্য সমাদর পেয়েছেন? 'বিনোদিনী'র পল্লীশ্মশান, পয়োমুখম, গল্পের আলোচনা আগেই করেছি। বাদবাকী গল্পের মধ্যে 'দিবসের শেষে'-তে দেখানো হয়েছে ছোট ছেলের 'মা আজ আমায় কুমীরে নেবে' কথাটি কিভাবে সত্য হয়ে দেখা দিল। যে নদীতে কোনোদিনই কুমীর দেখা যায় নি, নির্মম নিয়তির কার্যকারিতায় লেখকের বিশ্বাসবশতঃই সেখানে কুমীর এসে ছেলে ধরে নিয়ে গেল। এ ব্যাপারে লেখক যেমন আন্তরিক, তেমনি নিষ্ঠুর বোঝা যায়, যখন শুধু কুমীরে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন না, জানান,—"যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনরায় দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে নিশ্চল।...... পাঁচুর মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের উপর সূর্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল...... সূর্যকে ভাগ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।' এর পাশে 'তৃষিত আত্মা' গল্পে পাই অশরীরীর প্রভাবের কথা। সীতাপতির আকস্মিক মৃত্যুর পর তার পুত্রবধুর মনে হয় কে যেন গলা বাড়িয়ে উঁকি মারছে ঘরের চৌকাঠ পার হবার চেষ্টা করছে। চোখ বুজলেই মনে হয় "কে যেন ঘরের সহস্র ছিদ্রপথে অসংখ্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কি যেন টানিয়া টানিয়া লইতেছে।" সে আতঙ্কে ঘুমোতে পারে না। তার ছেলেটা যেন শ্বশুরের তৃষিত প্রেতাত্মার শোষণে শুকিয়ে বিকৃত হয়ে মারা যায়। জগদীশবাবু এখানে অশরীরী জগৎকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আমাদের আতঙ্কিত করার জন্যেই। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকে তাঁর ঝোঁক নেই, ব্যাপারটার অযৌক্তিকতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন তোলেন না। এই যেমন একটা দিক, তেমনি অন্যদিকে ঘটনাবিন্যাসের আকস্মিকতায় বা জগৎ-উপলব্ধিতে একটা নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে। 'ভরাসুখে' গল্পের গৃহিণী হরিমোহিনী জ্বরে প'ড়ে পুত্র, পুত্রবধু, পৌত্র-পৌত্রীদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। কবিরাজী ওষুধে বিপদ কাটলে পথ্যের ব্যাপক আয়োজন করা হল। কিন্তু তার মুখেভাত দিতে গিয়ে দেখা গেল সে মরে গেছে। 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পের যাজক ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বর স্ত্রীর শ্রাদ্ধের খরচের জন্য শিষ্যদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে যে সাতশত টাকা সংগ্রহ করেছিলেন ফেরার পথে সে টাকা ডাকাতের পরিবর্তে তার বহুদিনের বিশ্বস্ত চাকর নব

ছোরা দেখিয়ে কেড়ে নিল। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' নামক কবিতায় যে মানব-মহত্ত্বের পরিচয় মেলে জগদীশচন্দ্রের গল্পে পাই তার বিপরীত। তাঁর জগতে সেবা-শুশ্রূষা, মৃত্যুতে কান্না, অর্থের লোভে অর্থহীন হয়ে যায়, বিশ্বস্ততা নেহাৎই কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী' ও 'এইবার লোকে ঠিক বলে' প্রবঞ্চনার গল্প। প্রথম গল্পের লম্পট ব্যবসায়ী সদুখাঁ পাট কেনা বেচার ফাঁকে সুন্দরী যুবতী বৌকে দেখে নিজের বোনের সঙ্গে মিলের কথা ব'লে কান্নাকাটি ক'রে উপহার দিয়ে শেষে বাড়ীতে বিয়ের নিমন্ত্রণের ছলে ডেকে এনে আটকে রাখে। অর্জুন লাঠিয়ালের দল সদুর দলবলকে হটিয়ে দেয়। (লড়াইয়ের পূর্বে মন্ত্রোদ্বুদ্ধ অর্জুন প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশক্তি' গল্পের ঈশ্বর পাটনীর সঙ্গে তুলনীয়) কিন্তু এত কাণ্ডের পর জসিমের বৌ-ই ফিরে আসতে চায় না। সামাজিক অবস্থাটা তুলে ধরাই লেখকের অভিপ্রেত কি না গল্পের নামকরণের মত তা স্পষ্ট হয় না। 'এইবার লোকে ঠিক বলে' গল্পের সুখী শিবপ্রিয় সন্ন্যাসীর কাছে সোনা করা শিখবার জন্য গৃহত্যাগ করে। ছ-মাসেও তার পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। (এইসব অংশে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পের 'মৃত্যুঞ্জয়' তুলনীয়) সন্ন্যাসীর দল তাকে অজ্ঞান ক'রে তার দশটি টাকা নিয়েও পালায়। বাড়ী ফিরে দেখে বৌ মিথ্যে কলঙ্কের অপবাদ নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। উপর্যুপরি শোকে দুঃখে সে মাকে নিয়ে শহরে যায়। তার পোষাক ভয়ঙ্কর সন্ন্যাসীর, মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে যা বলে তার অর্থ—বেছে বেছে আমার শত্রু নিপাত কর। মায়ের শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় বালির পিণ্ড দান ক'রে ভাবে মা পিণ্ড গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দুটি খোট্টা ছেলের হাতে সেই পিণ্ড দেখে রাগে তাদের তাড়া করে। তারপর তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। একটি পত্রে লেখক বলেছেন—' প্রেম নয়, ত্যাগ নয়, শুধু সুবর্ণের লোভের ভিতর দিয়া সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি যতটা সম্ভব ফুটিতে পারে তাহা ফুটিয়াছে।" কিন্তু 'গুপ্তধন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ অবরুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ের বর্ণনা দিয়ে মৃত্তিকাশ্রয়ী জীবনমমতার যে আকুতি ফুটিয়ে তুলেছেন তা এ গল্পে নেই। শিবপ্রিয়কে পাগল ক'রে দিলে 'সামান্য' ঘটনার আবেদন 'সামান্য' হতে বাধ্য। "শিবপ্রিয়র উপরে কিভাবে অদৃষ্টদত্ত আঘাত কাজ করিয়াছে তাহারই একটা চিত্র ফুটিলেই গল্পের গল্পত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে" ব'লে লেখক উন্নত শিল্পীসত্তার পরিচয় দেন নি। সে যাই হোক 'বিনোদিনী' নাম হ'লেও বইটি বিনোদনের উদ্দেশে জীবনপ্রসন্নতার চিত্র নয়। গল্পগুলি পড়লে মনে হয় "এ-জগতের যে নিয়ন্তা সে মানুষের সুখ দেখিতে পারে না, নানাভাবে মানুষকে যন্ত্রণা দিয়াই তাহার আনন্দ, মানুষের মধ্যেও যে সব প্রবৃত্তি আছে তাহা ঐ নিয়ন্তারই অনুরূপ।"১৪

তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'রূপের বাহিরে' (১ম সং ১৯২৯) সম্পর্কেও কথাগুলি

প্রযোজ্য। 'নিঠুর গরজী' গল্পে মদ্যপ স্বামীর প্রহারে কচি ছেলে নিয়ে এক তরুণী বউয়ের গৃহস্থ বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া, তারপর কিছুদিন পর এবটি লোকের সঙ্গে ছেলে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়ার মারফৎ লেখক বোধ হয় দেখাতে চেয়ে ছন যৌবনধর্মের নিষ্ঠুর গরজের কথা। তবে কাহিনী বয়নে অসঙ্গতি ও অতিরিক্ত আ ক্স্মিকতা এই বক্তব্যকে শিথিল করে তুলতে পারে নি। 'জহর' গল্পেও এই চিন্তনের পুনঃ বৃত্তি। সম্পত্তির লোভে বিয়ে করে হর, তারপর বউকে ফেলে আরেক মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করে, তারপর তাকে ফেলে বিদেশে পালায়। ফিরে এসে সে যখন শান্ত গৃহস্থ, তখন বাল্যবন্ধু বলাই তার কাছে ব্যবসার পরামর্শে আসে। কিন্তু বলাই-এর প্রতি বৌ-এর আকর্ষণ হয়। সে স্বামীর অন্যাসক্তি ভুলতে ও ঈর্ষা জাগাতে আরো বেশীভাবে জড়িয়ে পড়ে। (এই দুটি গল্পে স্ত্রীলোকের চরিত্রবিকারই প্রাধান্য পেয়েছে) "আদিকথার একটি" বিকৃত যৌনাকাঙ্খার গল্প। তবে, একটি গল্পের সঙ্গে আর একটি গল্প জুড়ে সবসময় বক্তব্যকে গভীরতর করা সম্ভব নয় এটা তিনি ভুলেছেন। যা হোক, ১ম অংশে দেখা যায়, বদরাগী বেণীর সঙ্গে ঝগড়ায় আঁটতে না পেরে পাড়ার লোক রাতের বেলা তার বৌ এর নাম ধরে ডেকে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। বেণী তা শুনে বৌ এর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তাকে খুন করে। সম্পর্কহীন দ্বিতীয় অংশে দেখা যায়, ওই গ্রামে গোপালের মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী বৌ কাঞ্চন ও তার পাঁচ বছরের মেয়েকে সাহায্যের নামে এগিয়ে, সুবল উভয়ের প্রতি যৌনাকাঙ্ক্ষায় বাচ্ছা মেয়েটাকে বিয়ে করে। একদিন তেলমালিশের সময় সুবল কাঞ্চনের হাত ধরে টান মারলে সে তাকে ধাক্কা মারে, ফলে রাত্রে সুবল ছোট্ট বৌকে লাথি মারে। এই সূত্রে ঝগড়ার পর কাঞ্চন ও তার মেয়ে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু কাঞ্চনের দেহে মনে রোমাঞ্চলাগা সুবলের দৃষ্টি এড়ায় না। সন্ধানী সুবল একদিন একাকী, অসুস্থ, আদুরগায়ে কাঞ্চনের ঘরে ঢুকে শারীরিক অত্যাচার করে। এই সব বিষয় লেখকের প্রিয় হলেও "কিন্তু সুবলের পশুত্ব তখন ক্ষিপ্রতায় চরমস্তরে উঠিয়া গেছে" এই একটি বাক্যে প্রসঙ্গ সমাপ্ত করে লেখক আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। 'লঘুগুরু' উপন্যাসের সমালোচনা সূত্রে রবীন্দ্রমন্তব্য, এ গল্পটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য—"এই উপাখ্যানের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে তবু ও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই।"১৫ এরপর গল্পটি অবশ্য সমাপ্ত করা হয়েছে কাঞ্চনের গর্ভবতী হওয়া, সমাজপতি বামনদাসের খড়মপেটা খেয়ে রক্তাক্ত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত দুটো ঘরই ভেঙে দিয়ে তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে। এই অংশটুকু গল্পে অনাবশ্যক, লেখকেরই নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি, পীড়নপ্রিয় মানসিকতার পরিচয় বহন করে। "অরূপের রাস" গল্পে দুটি চরিত্রের অনুভব যে পথে যায়, তা অবরুদ্ধ যৌনকামনাপ্রসূত।

ভিন্ন জাতিত্বের জন্য রাণু ও কানুর বিয়ে হয় নি। অনেককাল পরে সাক্ষাতে রানুর ছেলেকে স্পর্শ ক'রে কানু রানুকে অনুভব ক'রে রোমাঞ্চিত হয়। আবার রানু কানুর স্ত্রী ইন্দিরাকে স্ত্রীর মত ব্যবহার করেছে শুনে কানু তৃপ্ত হয়, কারণ "ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে।" এইসূত্রে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ওমিল নাইন' গল্পটি স্মরনীয়। সেখানে কেশ তৈলের সুবাস মারফৎ নায়ক তার পূর্ব প্রণয়নীর সান্নিধ্য অনুভব করেছে। "অঞ্জন শলাকা" গল্পের ভাববস্তু দুটি—বিধবা সতীনকন্যার উপস্থিতিতে নববধূর স্বামীর সঙ্গে আনন্দ করায় বাধা, তার থেকে মনোবিকার এবং স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিধবা বড় মেয়ে অসিতা বর্ত্তমানে ও দু একটি চুলে পাক ধরায়, দ্বিতীয়বার বিয়েতে বিপ্রদাসের আপত্তি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সরোজকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনল। অসিতা তার সঙ্গে মেয়ের মতই ব্যবহার করলেও সরোজ কিছুতেই সহজ হতে পারে না। তার মনে হয় এই বৈধব্যের উপস্থিতিতে আনন্দ করা, মাছ মাংস খাওয়া অন্যায় হবে। ক্রমশঃ গ্লানিবোধের তীব্রতায় স্বামীর প্রতি ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়, সরোজ অসিতার ঘরের দরজায় শুয়ে থাকে। আর একদিন বিপ্রদাসকে দরজার বাইরে থেকে জানিয়েই সে ঘরে শুতে যায়। বিপ্রদাস ডাকতে গেলে সরোজ রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে—তুমি জাননা যে, আমাকে এমন করে অপমান করবার অধিকার তোমার নেই। স্বামীর দাবীর কোথায় শেষ হয়েছে তা' তোমায় বুঝিয়ে দেবার অধিকার আমার আছে, কিন্তু তুমি নির্বোধ, সে চেষ্টা আমার বৃথা হবে।" এই বলে সে বাড়ী ছাড়ে। সরোজের এই উক্তি রবীন্দ্রনথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল বা 'পয়লা নম্বর' গল্পের অনিলা-র উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। জগদীশ চন্দ্রের গল্পে নারীত্বের এই বিরল বিদ্রোহটা তাৎপর্যপূর্ণ, এই সূত্রেই তাঁর 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের কিশোরীর কথা মনে পড়ে। তবে, দুটি চরিত্রই কিভাবে সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যেও এমন স্বতন্ত্র বিদ্রোহী চিন্তার অধিকারী হয়ে উঠল, সেদিকে লেখক দৃষ্টি দেন নি। "চন্দ্রসূর্য যতদিন" গল্পে সতীনসমস্যা স্থূল জৈব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। দুই বোন ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল দীনতারণের সঙ্গে। প্রথমে তাদের সম্পর্ক ঠিক থাকলেও আস্তে আস্তে দেখা গেল পরস্পর পরস্পরকে স্বামীশয্যায় কল্পনা ক'রে লজ্জিত ও আড়ষ্ট হয়। বড় বোন ক্ষণপ্রভা ছেলেকে নিয়ে একাকীত্ব বোধ করে। একদিন স্বামীর সাগ্রহ দৃষ্টি থেকে বোঝা গেল, তিনি শুধু প্রফুল্লের যৌবনেই আকৃষ্ট নন, তাকে সন্তানবতী দেখতে চান। এই আবিষ্কারে ক্ষণপ্রভার একাকীত্ব আরও বেড়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের মনোবিকার ও যৌনবিকার জগদীশের গল্পে বারে বারে ঘুরে আসছে। 'শ্রীমতী' গল্পগ্রন্থও (আষাঢ় ১৩৩৭) তার ব্যতিক্রম নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা

অন্ধবিশ্বাস। তবে, অন্দরমহল ছেড়ে এখানে গল্প মাঝে মাঝে সামাজিক প্রাঙ্গনে এসেছে। যেমন, 'কার্যকারণ, গল্পে। কলেজে ভর্তি হতে যাবার পথে সুমঙ্গল চিহ্ন হিসাবে শঙ্খচিল দেখেছিল বলে সুরপতি কেরানীকে ঘুষ দিয়ে হোস্টেলে জায়গা করে নিতে পারে। কিন্তু সাঁইমশাই এর ছেলে ঘনশ্যাম তা দেখেনি বলে অসুস্থ হয়ে পড়ে, হোস্টেলে জায়গা পায় না, বাবা রাগ করে। আবার একবার গ্রাম থেকে পড়তে গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে ফিরে আসে। তারপর দুপাশে দুটো শঙ্খচিল আঁকা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে গ্রামে ডাক্তার হয়ে বসে। জগদীশবাবু যদি কলেজে স্থানাভাবের সামাজিক কারণকে অস্বীকার ক'রে শঙ্খচিল দেখা না দেখার ওপর হোস্টেলে জায়গা পাওয়াকে কার্যকারণ হিসেবে উপস্থিত করতে চান তবে সেটা বিংশ-শতাব্দীর তৃতীয়দশকে অনাধুনিকতার পরিচয়ই বহন করবে। (যদিও সমাজে এসব বিশ্বাস যে আজও বহুল বিদ্যমান, তা অস্বীকার করা চলে না।) এই সংস্কার গ্রাস করেছে 'শত্রু' গল্পকেও। সন্তানসম্ভবা বিনু সন্ধেবেলা এলোচুলে খোলাবারান্দায় শুয়ে ছিল। সে সময় বেড়াল ডেকে যায়। শেষে যখন মৃত সন্তান প্রসব হয়, তখন বিনুর মা আর্তনাদ করে ওঠে আর বিনুর অন্তর ককিয়ে ওঠে। সে বলে—"আমি আর হাসব না মা।. আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও।" গল্পে সৎছেলে রাধানাথের জন্য ও নিজের ছেলের জন্য বিনুর বাৎসল্যের বর্ণনা সুন্দর। 'অবাক জ্যোৎস্না' যৌন জড়তার উদ্ভব ও পরিস্থিতি নিয়ে ভালো গল্প। মায়ের অতিকঠোর শাসনে দাম্পত্যকলহে জ্যোৎস্না হয়ে উঠেছিল সদাশঙ্কিত। এক হাকিমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, কিন্তু দাম্পত্য ব্যাপারে সে এমনি শঙ্কায় অভ্যস্ত হয়েছিল যে স্বামীর সঙ্গে প্রেমালাপে চূড়ান্ত আড়ষ্টবোধ করে, 'কিন্তু ননদদের কাছে নয়। বহুচেষ্টায় ব্যর্থ স্বামী বিরক্ত হ'য়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথা জানালে আত্ম-রক্ষার তাগিদে জ্যোৎস্না ছুটে আসে, স্বামী রাগ করেছে কিনা জেনে লজ্জায় পালায়। 'আহুতি' গল্পে পুরাতন সমাজে মেয়েদের হাতে মেয়েদের নিগ্রহ, পুরুষের দাপট বেশ ফুটেছে। এক বিধবাকে আক্রমণের জন্য সাতকড়ির জেল হয়। দেড়বছর পরে ফিরে দেখে বাড়ীর সবাইয়ের রাগ কমেছে, কিন্তু বউয়ের মনে জেগেছে বাড়তি ভয়। নির্বিকার সাতকড়ির ঘরে বৌকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হলে সে কিছুতেই স্বামীর কাছে যেতে চায় না, স্বামী এগিয়ে এলে বিদ্রোহ ক'রে বলে—"আমায় ছুঁয়ো না। ভাল হবে না।" সাতকড়ি মাকে বলে বৌ তাকে মারতে চায়। মা তখন বৌকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ীর বাইরে বার করে দেয়।

"পাইক শ্রী মিহির প্রামানিক" (১৯২৯) গল্পগ্রন্থে মনোবিকারের দিকে ঝোঁক যে নেই তা নয়, তবে অন্যধরণের গল্প-ও আছে। উর্মিলার মন' এই ধরণের গল্প। গর্ভবতী উর্মিলার স্বামী মারা যায়। মৃত সন্তান প্রসব করায় তার ধারণা হয়, স্বামীর সঙ্গে

সত্যকারের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। সখী ললিতার ছেলে মারা গেলে সে কাঁদে বটে কিন্তু ভাবে তার তো স্বামী বর্তমান, অতএব পুত্রশোক একদিন ভুলে যাবে। এই ঈর্ষা থেকেই সে ললিতার কাছে তার পুত্রের কথা বারবার তুলে তার শোকদাহকে তীব্র করে তোলে। অতৃপ্ত যৌনকামনাজনিত মনোবিকারের উদাহরণ হিসেবে চরিত্রের উপস্থাপনা ছাড়া এ গল্পের অন্য কোনো আকর্ষণ নেই। "মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল" নামক অনাবশ্যক দীর্ঘ গল্পে দাম্পত্যজীবনে অতৃপ্ত স্ত্রী কিভাবে প্রেম পরিতৃপ্ত জীবন দেখে নিজেদের জীবনকে তুলনা করতে পারে তার বিবরণ আছে। যখন হরেন্দ্রদের পাড়ায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অন্যের সধবাকে নিয়ে বাসা নিল, তখন সে ভাবল—তার নিজের ভালোবাসাতেও স্বার্থপরতার খাদ মিশে আছে। তাই তা উপভোগ্য, চির আকাঙ্ক্ষিত রূপ লাভ করতে পারে নি। কিন্তু অন্যের সুখের বিস্তৃত গল্পও শুনতে ভালো লাগে না। এদিকে এই বিরক্তি দেখে, তার বৌ ভাবে—হরেন্দ্র কেবল ভালোবাসার ভান করে এসেছে, ভালো-বাসেনি। বিষয়টি বেশ আধুনিক, কিন্তু লেখক তা তাৎপর্যমণ্ডিত করতে পারেন নি। "পাইক শ্রী মিহির প্রামানিক" গল্পটিতে জগদীশের যে সব প্রবণতার সঙ্গে আমরা এতক্ষণ পরিচিত হয়েছি, তা যেন অনেকাংশে অনুপস্থিত। মিহির পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় অলস এবং ব্যক্তিত্ববিহীন; দাপটপূর্ণ পাইকের কাজের একেবারেই অনুপযুক্ত। কিন্তু জমিদারী খেয়ালে সে পাইক নিযুক্ত হয়। পাগড়ী আর চাপরাসের মর্যাদা সে তখন বুঝতে পারে যখন ভূপতি—যে তার অর্থ আত্মসাৎ করেছিল—তার সঙ্গে সম্ভ্রমে কথা বলে। লাঠিতে তেল মাখিয়ে তেঁতুল দিয়ে চাপরাস মেজে পাগড়ী পরিষ্কার ক'রে সে যখন কাছারীতে ফিরে এল, তখন সেই অলস, শান্ত মিহির নিজের রক্তে একটা উত্তাপের ঢেউ অনুভব করতে থাকে।গল্পের থীম সুন্দর, উপস্থাপনাও খারাপ নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভয়ঙ্কর" গল্পেও মিহিরের অনুরূপ চরিত্র প্রসাদ ঝড়ের মধ্যে পড়ে ফিরে পেয়েছিল তার ব্যক্তিত্ব। তবে মিহির অপেক্ষা প্রসাদের পরিস্থিতি ও পরিবেশ ছিল অনেক জটিল। "আঠারো কলার একটি" ঈষৎ ব্যঙ্গমধুর গল্প। চাষী বেণুকর স্বাস্থ্যবতী, কর্মনিপুণা বৌ পেয়েও মাত্র চার বছরের বিবাহিত জীবনেই অসুখী। সে চায় "স্ত্রীর পক্ষ হতে মানসিক একটা সৃজন লীলা" অর্থাৎ ছলাকলার ভঙ্গিমা। বৌ তা দেখাতে রাজী হয়। একদিন লাঙল দিতে দিতে মাটির মধ্য থেকে একটা বড় মাগুর মাছ পেয়ে আনন্দে বেণুকর বাড়ী এসে সেটার ঝোল করতে ব'লে আবার চাষে ফিরে যায়। দুপুর বেলা মাঠ থেকে ফিরে ভাত খেতে বসে মাছের ঝোল না পেয়ে সে অবাক হয়। বৌ মাছের কথা অস্বীকার করে। বেণু রেগে গিয়ে বৌকে মারতে যেতেই সে এমন চীৎকার করে ওঠে যে পাড়ার লোকে ছুটে আসে। বৌ এর মুখে সব শুনে লোকে ভাবে প্রচণ্ড গরমে বেণুর মাথা খারাপ হয়ে

গেছে। তার মাছ পাওয়ার গল্প কেউ বিশ্বাস করে না। লোকজন চলে গেলে বৌ হেসে বলে—"আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না! এ তারই একটি।" তারপর স্বামীর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে মাছের ঝোল বার ক'রে আনে। চাষীর ঘরে কলাভঙ্গিমার এই মধ্যবিত্ত আকুতিকে এখানে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন তা বোঝা যায়। তবে ব্যঙ্গ তীব্রতায় রূপান্তরিত হয়ে মাধুর্যকে লুপ্ত করে দেয় নি। "পারাপার" গল্পে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন সামাজিক অবস্থানজনিত অহমিকা কিভাবে কালে কালে হাস্যকর হয়ে ওঠে। ভূধর চাটুয্যের স্ত্রী সুভাষিণী ছিলেন জাত্যাভিমানিনী, কুলগর্বিণী, নীচ জাতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ-কারিণী। বাড়ীর ঝি, জাতিতে ডোম রাধাসতী ভূধরের জুতো পায়ে করে ঠেলেছিল বলে সুভাষিণী তাকে প্রচণ্ড তিরস্কার করেছিল। কিন্তু রাত্রে দেখা গেল সেই ঝির ঘরে ভূধরের আবির্ভাব হয়েছে, তার সাজা তামাক খাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত হাঁটুর ওপর পা তুলে নিয়ে তার পায়ে কাঁটা ফুটেছে কি না দেখছে। অত্যন্ত নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে দুটি দৃশ্যের বৈপরীত্য প্রদর্শন করে লেখক কোনো কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃসারশূন্যতা নির্মমভাবে তুলে ধরেন। "আমি দেবরাজের স্ত্রী" গল্পের আমি অর্থাৎ গল্পের বক্তা পড়াশুনা, সৌন্দর্য ও বেশভূষায় নিরন্তর গর্ববোধ করে। 'আঠারো কলার একটি' গল্পের বেণুর মত সে দাম্পত্যজীবনে অতৃপ্ত, কারণ স্ত্রীর "দীর্ঘ অচঞ্চলতা অর্থাৎ ধরা দিয়েই চির জীবনের জন্য তার বন্দিনী হয়ে থাকা।" এইরকম মানসিক অবস্থায় তার বন্ধু মুদীর দোকানী দেবরাজের বিয়েতে সে যায় না, কারণ মর্যাদার অহঙ্কার। একদিন বৌ দেখার নিমন্ত্রণে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে অনেক সাজসজ্জা ক'রে একখণ্ড গীতাঞ্জলি নিয়ে উপস্থিত হয়। তার ভয় ছিল পাছে দেবরাজের বৌ সুন্দরী হয়, কিন্তু তাকে মোটেই সুন্দরী নয় দেখে সে খুবই আশ্বস্ত হয়।

উদয়লেখা (১৯৩২) গল্পগ্রন্থের পেয়িংগেস্ট, দৈবধন, জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি গল্পের আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। বাদবাকী গল্পগুলিতে 'ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঘটনা এবং পরিণতি'র লঘু ও কৌতুকের দিকটাই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্প বলার দিকেই ঝোঁকটা এখানে বেশী। 'জগন্নাথের যন্ত্রণা' গল্পে দেখি ডিটেকটিভ বই পড়ায় মশগুল জগন্নাথ হঠাৎ পা বাড়িয়ে দেওয়ায় চোর ধরা পড়ে। রায়বাহাদুর খুশী হ'য়ে তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু কি জামা-কাপড় পরে যাবে এই চিন্তায় সে এমনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা জামা কাপড় পরে সে-বাড়িতে উপস্থিত হয়েও তার মনে হয় সবাই বুঝি তার পোষাক দেখে হাসছে। শেষপর্যন্ত রায়বাহাদুর আসছে শুনে আর সহ্য করতে না পেরে দ্রুত চেয়ার ছেড়ে ঘরের বাইরে এসে গেট পার হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। জগন্নাথের inferiority complex-এর বর্ণনায় লেখকের

নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। অন্যদিকে 'জ্যাঠা নন্দ' গল্পের নন্দ অতিরিক্ত আদরে জ্যাঠামো ক'রে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলত। নিজের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে সে ঘড়ি কেনার টাকা পাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখা হচ্ছে না জেনে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মরার ভয় দেখিয়ে বাড়ীর লোকদের বিস্তর সন্ধান ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। পরে গাছের ডাল থেকে তাকে পেয়ে দাদু কলকাতায় ঘড়ির অডার দেয়। 'কামাখ্যার কর্মদোষে' গল্পের কৌতুক বেশ উপভোগ্য। মফঃস্বল বোর্ডিং স্কুলে কামাখ্যাবাবু হিপনোটিসজম দেখাতে এসে গোবিন্দ নামের একটি ছেলেকে হেডপণ্ডিত বানান, কিন্তু পূর্বাবস্থায় ফেরাতে গিয়ে গোবিন্দের হাতে চড় খান। গোবিন্দকে যখন কিছুতেই স্বাভাবিক করা গেল না তখন তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু রাতে বন্ধুদের ও এক শিক্ষকের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে যে এতদিন সে অভিনয় ক'রে এসেছে। 'মারে কেষ্ট রাখে কে' গল্পেও কৌতুক স্পষ্ট। স্বভাব দোষে চোর পঞ্চানন ভালো পোষাক প'রে এক বোর্ডিং-এ গিয়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঘরের দুই বাসিন্দা এসে গেলে তার আর বেরুনো হয় না। তাদের আলাপ আলোচনা বাধ্য হ'য়ে শুনতে শুনতে এবং ছারপোকা ও মশার কামড় খেতে খেতে সে একসময় তক্তোপোষের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা লোকের চোখে পড়লে-ও দয়া ক'রে তাকে ছেড়ে দেয়। 'রানীশান্তমণি' গল্পে বিড়াল শান্তমণি সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। বিড়াল হারানো, বকশিসের লোভ ও বিড়াল ফিরে পাওয়ার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নেহাৎ-ই তাৎপর্যহীন গল্পবলার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। 'অধ্রুবম্ নষ্টমেব হি' গল্পে উকিল অখিলবাবু স্ত্রীর অনুরোধে মক্কেলের কাছ থেকে গরু ও বাছুর এনে কিভাবে নাজেহাল হল ও গরু ফেরৎ দিয়ে হাঁফ ছাড়ল তার বিবরণ থেকে নিছক গল্প বলা ছাড়া নূতনত্ব কিছুই চোখে পড়ে না। বরং 'ব্যস্তবাগীশ' গল্পে এক গরীব ভদ্রলোকের বাজারে যাওয়া ও বাড়ী আসার চিত্ররচনায় শুধুই একক সংলাপ ব্যবহারে পরীক্ষা প্রবণতার পরিচয় মেলে।

"উপায়ন" (১ম সং ১৩৪১) গল্পগ্রন্থে ও সামাজিক বিশেষতঃ পারিবারিক মূল্য-বোধের সংকট ও মনোবিকার এ দুয়েরই উদাহরণ মেলে। "কুপুত্র" গল্পের কুলদা অর্থাভাবে, অপমানে পড়া সমাপ্ত করতে পারে না, স্কুলে সামান্য বেতনের কেরাণীর চাকরী নিতে ও তারপর মায়ের অনুরোধে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। ফলে আর্থিক সংকট অব্যাহত থাকে। সাংসারিক অনটন, কাপড়ের অভাব, ট্যুশন চলে যাওয়া, মায়ের মৃত্যু, এ কারণে স্কুলে অনুপস্থিতি ও অর্দ্ধেক বেতন কেটে নেওয়া, পরপর পাঁচটি সন্তানের জন্মদান, ধারশোধ দেবার অসামর্থ, পথের মাঝে দোকানদারের অপমান ইত্যাদি দুর্বিপাকের বিবরণ দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, দেশে যখন বারে বারে স্বদেশী

আন্দোলনের তরঙ্গ উঠছে, যখন তুচ্ছ ঘটনাও লোকের কাছে উত্তেজক হয়ে দেখা দিচ্ছে তখন সংসারের সংকীর্ণ বন্ধনে বন্দী কুন্দদার মতো ছেলেরা কি ভাবে কূপমণ্ডুক হয়ে পড়ে। প্রায় আট বছর আগে লেখা "বিনোদিনীর ব্রজ" গল্পের পর এ গল্পে স্বদেশী প্রসঙ্গ দেখা গেল, যদিও গল্পে সে প্রসঙ্গের কার্যকারিতা নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত কখনও ব্যাপ্ত পটে আকর্ষণ বোধ করেন না। তাই পুনরায় পারিবারিক সংকটের মধ্যে ফিরে আসেন "আঁধার বৃন্দাবন" ও অচেনা মেয়ে" গল্পে। প্রথমটি সপত্নী সম্পর্কের গল্প। রমাপতি সন্তান কামনায় কুঞ্জকে বিয়ে করে আনে, এদিকে প্রথমা স্ত্রী মানিনীও গর্ভবতী হয়। কুঞ্জ প্রথমে নিজের মূল্য কমার আশঙ্কায় কষ্ট পেলেও সতীনের ছেলের কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। স্বামীর মৃত্যুর পর দুজনে যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দে কাটাচ্ছিল, তখন প্রতিবেশিনী নির্মলার একটি প্রশ্নে আনন্দ হারিয়ে যায়। সে মানিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল, স্বামী কাকে বেশী ভালোবাসত। মানিনী নিজের কথাই বলে। কুঞ্জ তা শোনে। ফলে এতদিনের চেতনমনের সম্প্রীতি অবচেতনে ঈর্ষার আকস্মিক আত্মপ্রকাশে নষ্ট হয়ে যায় ও কুঞ্জ বাপের বাড়ি চলে যায়। 'অচেনা মেয়ে' গল্পে অত্যাচারিতা একটি মেয়ে এক গৃহস্থবাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের ইচ্ছে থাকলেও ব্যবসাদার গৃহকর্তা "আপন ইজ্জৎ আগে" এই স্বার্থনীতিতে অটল থেকে তাকে আশ্রয় দিয়ে নিজেকে বিপন্ন ক'রে তুলতে চাইলেন না। পরিবেশ প্রভাবিত সামাজিক হৃদয়হীনতা ও স্ত্রী অত্যাচারের প্রসঙ্গ ছাড়া এ গল্পের অন্য কোনো সার্থকতা নেই। ('নিঠুর গরজী' গল্পের প্লট বেশ খানিকটা এই রকমই) 'ত্রয়োদশীর যাত্রা' মনোবীক্ষণের গল্প। এ গল্পের ধূর্জটিকে ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ায় তার নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত হয়। শরীর ও মন ছিল যার ঈর্ষনীয়, আজ সকলের সহানুভূতির পাত্র হয়ে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ফলে, হিতৈষীদের সমবেদনা প্রকাশ, বন্ধুদের রেকর্ড বাজিয়ে মিষ্টি খাইয়ে তাকে আনন্দিত করার চেষ্টা তাকে পীড়িত করতে থাকে। নায়কের যন্ত্রণার এই তীব্র কুটিলরূপের দেখা মেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুষ্ঠরোগীর বৌ" গল্পে। কিন্তু মানিকবাবু সে গল্পে প্রধানতঃ দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্ঘাটনে একনিবিষ্ট, জগদীশ তা নন। তাছাড়া যন্ত্রনাকাতর ধূর্জটিকে আঁকতে গিয়ে তার মুখরা শাশুড়ি ও সম্পর্কিত বোন পদ্মার কলহের অবতারণা ক'রে গল্পের একলক্ষ্যকে তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন। "উপলাহত প্রবাহ"ও প্রধানতঃ মনোবীক্ষণের গল্প তবে, ঘটনার ও চরিত্রের দিকে লেখকের নজর আছে দেখা যায়। দুই ভায়রা ভাই নবীন ও কৃষ্ণলালের বিরোধ আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তখন স্ত্রীরা প্রধানতঃ ছোট বোনের মেয়ে কামুকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতি বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। উচ্চতর আদালতে মামলা পৌঁছানোর পর

নবীন ও কৃষ্ণলাল এ বিরোধ আত্মঘাতী বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিল। কিন্তু এক অসহিষ্ণু মুহূর্তে ছোটবোন বড়বোনের উদ্দেশ্যে ''আঁটকুড়ি'' বলায় বড়বোন প্রচণ্ড আঘাতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। গল্পশেষে দেখা যায় মামলা মিটে যাওয়ায় নবীন ও কৃষ্ণলাল আনন্দে মত্ত, কিন্তু মাঠের ধারে ছোটবোনের মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করে কে রেখে যায়। গল্পের ধরণটা শৈলজানন্দীয়। শেষে মনোবিকারের প্রাধান্য গল্পের আকস্মিকতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। 'দ্বিতীয়' গল্পের সূত্রপাত সাম্প্রদায়িক সমস্যায়, শেষ ভিন্ন মানসিক টানাপোড়েনে। এক বই-দোকানে 'বিধবার মুক্তি' উপন্যাসে—যাতে মুসলমান কর্তৃক হিন্দু বিধবাহরণের কাহিনী— বিক্রি হতে থাকায়, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ে, বই পোড়ানো হয়। তামাকের দোকানী সিধু এই ঘটনা দেখে, কাগজে বিধবাবিয়ের নানা কাহিনী প'ড়ে, এক তের বছরের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে আনে। কিন্তু বৌ বৈধব্যের কথা গোপন করতে চায় না। 'আঠারো কলার একটি' গল্পের বেনুর মতো বৌ-এর আড়ষ্ট মন, পুরুষস্পর্শে নারীত্বের স্বাভাবিক জাগরণের অভাবও সিধুকে পীড়িত করে। বিধবা বিয়ে দেওয়ার জন্য বাবার নিগ্রহের কথা শুনে ও পূর্ব-স্বামী এবং শ্বশুর-বাড়ীর কাহিনী সম্পর্কে স্বামীর আগ্রহ তার মানসিক যন্ত্রনাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলে। কিন্তু সিধু ভাবে, বৌ-এর কান্না তার প্রতি ভালোবাসার অভাব থেকে উৎসারিত। সে রেগে বলে— বিধবা বিয়ে করা আর রক্ষিতা রাখা সমান। এ ভাবে উপস্থিত বুদ্ধির অভাবের জন্য তুচ্ছ ব্যাপার থেকে কি ভাবে প্রবল মানসিক সংকট জন্ম নেয় লেখক দেখাতে চেয়েছেন। 'চিহ্ন' একান্তই মনোবিকারের গল্প। পুকুর থেকে সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে একজন অজ্ঞাত পুরুষ প্রীতি নামে একটি মেয়ের পিঠে ঢিল ছুড়ে মারে। পুরুষের কামনার দৃষ্টান্ত হিসাবে এ ঘটনা সে ভোলে না। প্রীতির সঙ্গে এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র উমাধনকে বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখা হয়। কিন্তু প্রীতির উদ্দামতাকে তৃপ্ত করতে সে একান্তই অনুপযুক্ত প্রমাণিত হল। এ থেকে প্রীতির মনে যে বিকারের উদ্ভব হয়, তার প্রভাবে সে বারবার সেই ঘাটে ঢিলমারার ঘটনা মনে করে। আবার অহেতুক ঈর্ষায় উমাধনের কাছে ছোটো বোনের পড়াবুঝে নেওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়। বাড়ীর লোকে স্বভাবতঃই তার আচরণের ব্যাখ্যা পায় না। প্রীতির ছেলে হলে সে প্রথমেই ছেলের পিঠ দেখতে চায় এবং আশ্চর্য হয়ে দেখে ছেলেটারও ডানহাতের ডানার ওপর একটা ছোট্ট লাল দাগ। দেখা যাচ্ছে অবরুদ্ধ যৌনকামনা ও তার প্রভাবে ভ্রান্ত দর্শনের মনস্তত্ত্ব মানিকবাবুর মত জগদীশ গুপ্তকেও বারংবার আকর্ষণ করে।

জগদীশগুপ্ত রচনাসংকলনে উদাসীন বলেই ''রতিবিরতি' গ্রন্থে 'রতিবিরতি' নামের নটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত অতিদীর্ঘ রচনার সঙ্গে (এই গল্পটি 'সবার 'শেষেগয়া' গল্পের

বিস্তৃতরূপ) 'পামর' এবং 'গতিহারা জাহ্নবী' গ্রন্থে এই নামের দীর্ঘ রচনার সঙ্গে 'কর্ণধর পালের গমন ও আগমন', 'ত্রিলোক পতির তীর্থ ভ্রমণ' এবং 'নিত্যধন চাটুজ্যের অপরাধ' এই চারটি গল্প অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'পামর' এক সৎ দায়িত্বশীল রাজকর্মচারীর দুষ্ট পুত্রের ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী। তমালকৃষ্ণ বাবার অসুস্থতার কথা ব'লে নানা জায়গায় ধার করে। বাবা জানতে পেরে তাকে বাড়ী ছাড়তে বলে. সে অন্যত্র যায় ও বাবার শ্রাদ্ধের কথা ব'লে তার সহকর্মীদের কাছে চাঁদা তোলে। পত্রিকায় এ খবর প'ড়ে বিচলিত হয়ে বাবা গৃহত্যাগ করে। 'কর্ণধর পালের গমন ও আগমন' গল্পে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে অর্থ কিভাবে মানুষের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে। সৎ ও লোকপ্রিয় কর্ণধরের বিধবা মেয়ে বাড়ী থেকে পালায়, তারপর চক্ষুলজ্জায় কর্ণধরও গ্রামত্যাগ করে। তার বাস্তুজমির ওপর দূর অঞ্চলের জমিদারের নবনির্মিত অট্টালিকায় এই বিধবা মেয়ে দেবীদাসীকে গৃহিণীরূপে দেখে লোকের সংস্কারে ঘা লাগে, প্রতিবাদ-উন্মুখ হয়। গ্রামের দুই বৃদ্ধা এই উদ্দেশেই বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু পাঁচটাকা প্রণামী দিয়ে আন্তরিক অভ্যর্থনা, দেবীদাসীর নবার্জিত রূপ ও অলঙ্কার দেখে অভিভূত হ'য়ে তাকে প্রশংসা করে যায়। বিস্তর দানধ্যান শুরু করলে গ্রামের লোকের চোখে সে দেবতা হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে লেখক এখানে একটি নির্মম সামাজিক সত্যকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'নিত্যধন চাটুয্যের অপরাধ' গল্পটিতে শরৎচন্দ্রীয় "পল্লীসমাজের" অনুবৃত্তি দেখা যায়। এক বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজের ব্যাপক আয়োজন নিয়ে ব্যক্তিত্ব হীন, লুব্ধ ব্রাহ্মণ মহলে আলোচনার অন্ত ছিল না। কিন্তু ভোজ সভায় সব রান্নাই অন্নপূর্ণা নামে এক বিধবার জেনে এক নেতাস্থানীয় ব্রাহ্মণ আসন ছাড়ে ও ভোজ পণ্ড হয়। এ গল্পে নিত্যধন চাটুয্যের উল্লেখ শেষাংশে, যেখানে তার দিকে নির্দেশ ক'রে অন্নপূর্ণাকে 'পাপিষ্ঠা' বলার মধ্যে, একটা অবৈধ সম্পর্ক অনুমান করা চলে, কিন্তু তা শুধুই চমক সৃষ্টি করে। প্রচণ্ড লুব্ধ ব্রাহ্মণদলের ভোজসভা পরিত্যাগে জাতবিচার কতটা সক্রিয় সে প্রশ্নও অনুক্ত থেকে যায়। 'ত্রিলোকপতির তীর্থ ভ্রমণ' কে গল্পহীন গল্পের নমুনা হিসাবে উপস্থিত করা চলে, যা সমকালীন বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো গল্পে মেলে। ত্রিলোকপতি তার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখল বন্ধুর বোনকে দেখতে এক ভদ্রলোক এসেছেন। এই বোনকে না দেখলেও ত্রিলোকপতি বিয়ে কি, এই মেয়েটির বিয়ে, তার সম্ভাব্য আনন্দ, স্বামীস্ত্রী সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ভাবতে শুরু করে। বিয়ের কথা পাকা হয়েছে শুনে সে হাঁফ ছাড়ে। বিয়ের দিন সকলের থেকে বেশী খেটে সে এই মানসিক আনন্দকে প্রকাশ করে।

'মেঘাবৃত অশনি' গল্পগ্রন্থেও (১ম সং, ১৩৫৪) জগদীশ গুপ্ত পূর্বানুসারী। নাম গল্পটি এক আত্মগর্বিত সাহিত্যিকের কাহিনী। তরুণ সাহিত্যিক অশনি রায় ভক্তদের

দর্শন, বাণী, উপদেশ, স্বাক্ষর, অনুজ্ঞা, অনুগ্রহ প্রার্থনায় অতিষ্ঠ হয়ে উদ্ধারণপুর নামের নির্জন স্থানে বেড়াতে গেল। সে ভেবেছিল তার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত, ভেবেছিল "অপ্রতিদ্বন্দ্বী" হ'য়ে "এক শতাব্দী রাজত্ব সে করিবেই।" কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার তাকে চিনতে না পারায় সে মনঃক্ষুন্ন হয়। তারপর সুটিং ফেরৎ চলচ্চিত্রশিল্পী ও কর্মীরাও যখন তাকে চিনল না, বরং নামের বানান নিয়ে কিছু কথাবার্তার পর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, তখন সে দুঃখ পেল। এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা অশনিকে ধাক্কা মেরে জনৈকের 'ধ্যাৎ' বলে চলে যাওয়া লেখকেরই ধাক্কা বলে পাঠকের মনে হয়। "আশা এবং আমি" গল্পের বক্তা দৈহিক আকর্ষণ বোধ করেছিল আশার প্রতি। তার মতে— "সামগ্রীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া পাওয়ার লোভ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি" এবং "নিজস্ব করিবার উদ্যমের নামই প্রেমাকাঙ্খা, নিজস্ব হইয়া থাকার নামই দাম্পত্য ধর্মপালন।" সে আশাকে নিয়ে পালাল, কিন্তু একরাত্রি দৈহিক উপভোগের পর আশা তার কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল। কিন্তু আশা তাকে ছাড়ে না। তার এই একান্ত আঁকড়ে ধরা দেখে বক্তাও সাময়িকভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়। এই দায়িত্বহীন প্রেমের গল্পের ক্ষেত্রে কল্লোলীয়দের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এইখানে যে তিনি প্রেমে দেহের প্রাধান্য স্বীকার ও প্রচার করেন, কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না, অসামাজিক প্রেমকে বারংবার উপস্থিত করেন, কিন্তু সমর্থন করেন না। বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসের কার্যকারিতা 'প্রতিক্রিয়া' গল্পের বিষয়। গ্রামের দুই গণ্যমান্য ব্যক্তির একজন রতিকান্ত চতুর, পরিশ্রমী, বলবান ও অজাতশত্রু। আর একজন হরেন্দ্র— সর্বদাই অনিষ্টকামী। হরেন্দ্র রতিকান্তকে ঈর্ষা করে। রতিকান্তের মৃত্যু হলে যখন হরেন্দ্রের নিন্দা শোনা গেল তখন হরেন্দ্র রতিকান্তের প্রেতাত্মা দেখেছে প্রচার করল: এই সূত্রেই প্রচারিত হল যে শনিবারে মৃত্যু হয়েছে বলে গতি হয় নি। রতিকান্তর বৌ তখন গ্রামে নেই, সংস্কারান্ধ লোকের মনে এই কথা দ্রুত স্থাপিত হয়ে গেল যে, রতিকান্ত সত্যিকারের পুণ্যবান হলে শনিবারে তার মৃত্যুই ঘটত না। অর্থাৎ বিচার নয় বিশ্বাসের অন্ধতা লেখকের উপজীব্য তামসিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে দুর্মর, তা "লোকনাথের তামসিকতা" গল্প আর একবার প্রমাণ করে। উকিল লোকনাথবাবু রূপবান, তার স্ত্রীর রূপ নেই। অধ্যাপক ছেলের জন্য পাত্রী খুঁজতে বেরুলে, একজন স্পষ্ট উত্তর ও অপ্রিয় প্রশ্ন করে। আর একজন খর্বকায়া, তৃতীয়জন প্রকাণ্ড দেহী। চতুর্থ মেয়েটি সুন্দরী। তাকে পছন্দ ক'রে ট্রেনে ফেরার সময় মনে হল, তার নিজের বৌ ত যথেষ্ট রূপবতী নয়, তার মনে "হঠাৎ জন্মিল জ্বালাময় ঈর্ষা।" মনে হল রূপবতী পুত্রবধূর "সেবা তিনি অবিকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।" বাড়ী এসে অপছন্দ জানিয়ে, পূর্বে দেখা একটি কালো মেয়েকে

পছন্দ করে ফেলেন। লোকনাথের ঈর্ষাকাতর মন উদ্ঘাটনে লেখকের নৈপুণ্য অস্বীকার করা চলে না। "শ্যামাচরণের অঙ্গুষ্ঠ" গল্পে মনোবীক্ষণ ও অলৌকিকত্ব মিলেমিশে আছে। দরিদ্র স্কুলমাস্টার শ্যামাচরণ প্রবাসী দাদার অর্থসাহায্যে কষ্টে চালিয়ে নিত। দাদা অক্ষমতা জানালে, স্ত্রীর গঞ্জনা, ভিখিরীর টিটকিরী, নায়েব ও দোকানীর ঋনশোধের হুমকির সামনে সে অসহায় বোধ করত। কিন্তু সে যখন মারা গেল তখন সকলকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে গেল। দেখা গেল শবের "চারিটি অঙ্গুলি দেহসংলগ্ন— কেবল অঙ্গুষ্ঠটি একটু উঠিয়া আছে..।" লেখকের পর্যবেক্ষণ ও চিত্রণ প্রশংসনীয়। এই গল্পের যে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি সেই দুটিই মেলে "কাপালিক ও মহাকালী" গল্পে। বটকৃষ্ণের ভদ্রব্যবহারে সবাই তার চায়ের দোকানে ভিড় করত, অনেকেই পয়সা দিত না। সে গাঁজা খেয়ে কালী সাধনা করত। তার স্ত্রী ভালোমানুষি বা কালী সাধনা কোনো-টাই পছন্দ করত না। ফলে আর্থিক অক্ষমতায় নির্বিকার বটকৃষ্ণ যখন বলে, "মা বলেছেন, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোলপাড় করিস নে" তখন বৌ রাগে উন্মাদ হয়ে কালী মূর্তিটা আছাড় মেরে ভেঙে ছেলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বটকৃষ্ণ ভাবত তার মূর্ত্তি জাগ্রত, তার অতিথিরা ভেবেছিল— "কালীর মূর্ত্তিটা যেন আন্দোলিত হইতেছে।" বটকৃষ্ণ এবার ঘরের ভেতর ঘাড় গুঁজে বসে থাকে, বিশ্বাস করে মা তাকে আগলে আছেন, ঘুম পাড়াচ্ছেন। তার বন্ধু একদিন নিজের বাড়ীতে বটকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে, কিন্তু পরের দিন তার চোখের সামনেই বটকৃষ্ণ ক্ষুর গলায় বসিয়ে দিয়ে বলে, "মা-ও এসেছেন ডাকতে! আমার মুণ্ড হবে তাঁর মুণ্ডমালার প্রথম মুণ্ড।" লক্ষণীয় অলৌকিক প্রসঙ্গে লেখক অধিক বর্ণনার সুযোগ নেন না, আর পাঁচটা বাস্তব বিষয়ের মতো পরমবিশ্বাসে প্রয়োজনীয় উল্লেখটুকু রাখেন। "শঙ্কিতা অভয়া" মনো-বীক্ষণের সুন্দর গল্প। অভয়া মেয়ের ব্যাপারে সদাই শঙ্কিত, কিন্তু অতুল মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ সম্পর্ক রাখে, নাচের সঙ্গে এসরাজ বাজায়, এমনকি প্লেটোনিক প্রেম নিয়েও আলোচনা করে। কিন্তু অভয়ার ভয়, এসবে মেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একদিন রাস্তায় একটি লোককে দেখে অতুলের অস্বস্তি থেকে মেয়ে শান্তির মনে প্রশ্ন জাগে, সে অনুভব করে তারা যেন নির্বাসিত, তাদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই, কোনো চিঠি আসে না। একদিন সিনেমা থেকে ফিরতে অস্বাভাবিক দেরী হলে, অভয়া ভাবে, নষ্টের বোধহয় আর কিছু বাকী নেই। বাড়ী ফিরলে মা বাবাকে ভীষণ তিরস্কার করতে থাকে। আগের মত অতুল উত্তেজিত হয় না। গভীর রাতে অভয়া শান্তিকে ঘুম থেকে তুলে তার সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। শান্তি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যায়, পরে মাকে তিরস্কার করতে থাকে। তখন—

"বাধা দিয়া অভয়া বলিল— ও তোর বাবা নয়, কেউ নয়; তোকে কোলে নিয়ে ও-র সঙ্গে

আমি কুলত্যাগ করেছিলাম .. .. ।"

সমাপ্তির এই আকস্মিকতা গল্পটিকে নাটকীয় করে তুলেছে। এটাই অভয়ার আচরণকে 'সঙ্গত' করে তোলে। মেয়েটির আচরণ সামান্যতঃ 'দিবারাত্রির কাব্যে'র আনন্দের মতো। গল্পটি আরও গভীর হত, যদি বাইরের জগতের সঙ্গে টানাপোড়েন থাকত।

মনের অভ্যন্তরে আলো ফেলে কিছুটা নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে চরিত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ মানিক ও জগদীশ দুয়েরই বেশ কিছু গল্পে মেলে। "আরোহণ ও অবরোহণ" এ ধরণের গল্প। (তাঁর অনেক গল্পেই দুই সতীন বা সহোদরার পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতির কথা আছে) মহেন্দ্রনাথ সুযোগ পেয়ে তার দুই মেয়ে সতী ও উষার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন দুই ভাই মনোরঞ্জন ও জ্ঞানরঞ্জনের সঙ্গে— তাতে খরচ ও ঝামেলা দুইই কম হয়েছিল। গুণ ও রূপে দুই বোনই প্রশংসনীয়। কিন্তু একসময় দেখা গেল— সতী ভাবছে ছোটো বোন উষা যেন সংসারে অগ্রগণ্য হয়ে যাচ্ছে। আবার উষার বর ফেল করায় বড়বোম ছোটকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করলে, সে রেগে যায়, ভাসুরের মাইনে বাড়ায় রাগের মাত্রা বাড়ে। সতীর মনে হল, একজায়গায় বাবা তাদের বিয়ে দিয়ে ভুল করেছেন। উষার মনে হল— সংসারে দিদির শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্যেষ্ঠত্ব অসহ্য! এক প্রভাতী চায়ের আসরে ভাসুরের প্রমোশনে বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন নিয়ে কথা উঠতে বিস্ফোরিত উষা ঝড়ের বেগে বাইরে চলে যায়। লেখক ধাপে ধাপে সম্পর্কের ক্রমাবনতিকে এখানে সুন্দর ফুটিয়েছেন।

এবার বোধহয় বলা চলে, আলোচিত 'বিনোদিনী' থেকে 'মেঘাবৃত অশনি' পর্যন্ত গল্পমালায় লেখকের উপলব্ধির জগতে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তাতে মনো-বিশ্লেষণ, মানসিক বিকার, জীবনের নেতিবাচকতা বা দৈহিকতার প্রাধান্য বা অর্থের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে অলৌকিকত্ব, নিয়তিবাদ, নানা অন্ধ সংস্কারের দাসত্ব। পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক পীড়নের পরিবেশে আধুনিকতার পথে লেখকের সাফল্য এইখানে, ব্যর্থতাও এইখানে। জীবনের বিষে তিনি সম্ভবতঃ নীলকণ্ঠ হয়েছেন কিন্তু নীলকণ্ঠের মঙ্গলস্পৃহা তাঁর ছিল না। তাই বিষতিক্ত সাহিত্যের শক্তিশালী স্রষ্টা হিসেবেই তিনি আমাদের মাঝে পরিচিত হয়ে রইলেন।

(খ)

'লঘু গুরু' উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তের "লেখবার ক্ষমতা" এবং "রচনা নৈপুণ্যে"র প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী অনেক

সমালোচক জগদীশবাবুর সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্র মন্তব্যের সমর্থক না হয়েও তাঁর স্বতন্ত্র রচনারীতির বলিষ্ঠতার দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি।

জগদীশগুপ্তের কিছু গল্প চলিত ভাষায় লেখা, যেমন— পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক, আঠারো কলার একটি, আমি ও দেবরাজের স্ত্রী, দ্বিতীয় ইত্যাদি। তবে সাধুভাষাতেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, কারণ অধিকাংশ গল্প উপন্যাস সাধুভাষায় লেখা। জগদীশের ভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্য— এর স্পষ্টতা ও ঋজুতা। সমকালীন তরুণ লেখকদের গদ্যে যে পেলবতা ও উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য, জগদীশগুপ্তের গদ্য যেন তার এক মূর্ত প্রতিবাদ। এই স্পষ্টতা ও ঋজুতার পথ বেয়েই অনেক সময় দুঃখবাদী লেখকের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে শ্লেষের আশ্রয়ে। যেমন— (ক) "জীবন-লাঙ্গল যে দুটি গরুতে টানিয়া অন্নোৎপাদন করিতেছে তাহাদের একটির নাম চাকরী করা, আর একটির নাম গাল খাওয়া।" (জহর) (খ) "যাহারা কন্যার পিতা তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে— কন্যার বিবাহের পর তাঁহাদের আর কৌপীন ধারণ করিতে হইবে না।" (অরূপের রাস) (গ) এ পাড়ার পুরোহিত গাঙ্গুলী মহাশয় আশীর্বাদের কুবের ভাণ্ডার, চরণামৃতের সমুদ্র এবং নির্মাল্যের অরণ্য— এত বিতরণ করেন তবু ফুরায় না। (মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল)

এ ধরনের বাক্‌ভঙ্গী লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা সূচিত করে, তেমনি বিষয়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়। এই শ্লেষাত্মক, উদ্ঘাটনমূলক সাধু গদ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ের রচনাতেও মেলে। উভয়েই আপাত সাধারণ, নিরুত্তাপ, বিবৃতিধর্মী গদ্যের মধ্যে সঞ্চার করে দিতে চেয়েছেন ভাবানুভূতিকে। বাক্যবিন্যাসের কয়েকটি দিক থেকে তিনি স্পষ্টতঃই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী। যেমন— (ক) বাক্য সমাপ্তিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :— "বেচারী জানে না, তাহার আকাশে উল্কা জ্বলিয়া উঠিল বলিয়া।" (চন্দ্রসূর্য যতদিন) (খ) দীর্ঘ বাক্যের ফাঁকে পৃথক পংক্তিতে বিশেষ একটি ক্ষুদ্রবাক্য ব্যবহার, পুনরায় দীর্ঘ বাক্যে ফিরে যাওয়া :— "রোগযন্ত্রণা তাহাকে বেশীদিন সহ্য করিতে হয় নাই; সাতদিন ভুগিয়া সে মারা গেল শুক্রবারের প্রত্যূষে —শনিবারের প্রারম্ভে। বিষন্ন হইল সবাই— কেবল হরেন্দ্রের মনে হইল, রতিকান্ত মরিয়া আজ তার বিচরণ-ক্ষেত্র অবাধ করিয়া দিয়া গেল।" (প্রতিক্রিয়া) (গ) 'না'-এর বিশেষ ব্যবহারে ছন্দের দোলা :— "পাকা চুল মাথায় থাকিলেও তার না কমিত দর, না কমিত সমাদর।" (অঞ্জন শলাকা) (ঘ) সাধুভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র ব্যবহার :—

'স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তি যেন কথা কয়— আর প্রসব করে স্বর্ণ।' 'লোকে ভাবিয়াছিল

তাই'। —'হোক স্বামী আজ অনুতপ্ত, হোক সে আজ মমতায় গদগদ... ।' —১ম টিতে 'স্বণ', ২য় টিতে 'তাই', ৩য় টিতে 'হোক' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়।

''প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী'' গল্প প্রসঙ্গে লেখক একটি পত্রে লিখেছেন— ''গল্পটিতে এমন অনেক শব্দ আছে যাহা অনেকেই বুঝিবে না। ...কিন্তু নিরুপায়।' আর একটি পত্রে লিখেছেন— ''অনেকগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছি যাহাতে আপনাদের আপত্তি আছে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সবগুলিকে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যে সমাজের গল্প সেই সমাজের atmosphere-টা গল্পে অবতীর্ণ হয় ঐরূপ কথার প্রয়োগের দ্বারাই— ইহাই আমার ধারণা ।'' মন্তব্য সঙ্গত তবে, জগদীশগুপ্ত শব্দ ব্যবহারে বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য প্রভৃতির মত অতিরিক্ত নূতনত্বের পক্ষপাতী নন, শৈলজানন্দের মত আঞ্চলিকতায় আগ্রহী নন। তবু-ও কয়েকটি উদাহরণ দিই। যেমন— মুনাসিফ্, কুস্তুরেশে, ভুজিয়া, গোঁপে বুড়িয়েছে, জোয়াইল না, খাজনা ইসরাল, আরজ, বেহেস্ত, খিৎমৎগার ইত্যাদি।

একাধিক বিশেষণ প্রয়োগে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রসঙ্গকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে চিত্রিত করার প্রবণতা জগদীশচন্দ্রের রচনায় বহুল দৃষ্ট হয়। যেমন—'শিরায় শিরায় রক্তের সেই উন্মত্ত অন্ধ নৃত্য অ জ শ্লথ, ছন্দহীন।' 'সৎকার প্রার্থী পরিত্যজ্য নীরব নিশ্চল মূল্যহীন শবদেহ— সে কারুর নয়, কেউ তার নয়।' 'দোকানদার, কুৎসিত, সেকালের বর্ব্বরতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, শীর্ণ শূণ্য যে দেবরাজ তারই বিয়ে।'

মাঝে মাঝে অনুপ্রাস প্রয়োগ ভাষার শ্রুতিমাধুর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, কিন্তু তাতে তীক্ষ্ণতা বা ব্যঙ্গের ধার কমে নি। যেমন— 'হর আমার পর নয়, পরন্তু পরম বন্ধু।' 'পথ্য দিতে আসিয়া অকথ্য অপমানিত হইয়া গেলেন।' 'কলাপ কিছুদিন রোগীর প্রলাপের মতই অসহ্য হইয়া রহিল।'

উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারেও তাঁর সামর্থ্য ও স্বকীয়তা সহজেই চোখে পড়ে। (ক) একবিন্দু পারার মত শিশুতনু। কেবলি সঙ্কটের দিকে ছোটে— (নিঠুর গরজী) (শিশুর উপমান হিসাবে পারার ব্যবহার নূতন, এই পদার্থের গতিধর্মটাই তুলনীয়) (খ) তবু কিন্তু আশার একছিটে আঁশ মনে রইলই। (কড়ির দামে) (জমিদারের সঙ্গে গরীবের মেয়ের প্রেম ও বিবাহের প্রত্যাশার ক্ষীণ অবশেষকে বোঝাতে গিয়ে 'আঁশ' এর প্রয়োগ নিঃসন্দেহে নূতন) (গ) দুই বোন্ শশী আর শ্যামা—দুই বোনে মোটে মিল নাই, যেন শিরীষ কাগজের দুপিঠ। (তুফান ও তৈল) দুই বোনের সাপে নেউলে সম্পর্ক বোঝাতে শিরীষ কাগজের উপমান ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হয়েছে।) (ঘ) রোদে এসে বসলে যেমন কনকনে শীত ক্রমশঃ কাটতে থাকে, কথাবার্ত্তায় তেমনি আমার সঙ্কোচ কেটে এসেছে । (দুই সহোদর-করুণা ও কৃপা) (ঙ) কিন্তু ঘনার মগজে কেবল

বেলে মাটি, বিদ্যের বীজ যত ছড়াই অঙ্কুর আর গজায় না। (কার্যকারণ) (চ) হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে ধাতুর যেমন দশা হয়, তেমনি মায়ের তাড়নায় জ্যোৎস্নার কোরক-মনের সমস্ত বায়ুহিল্লোল নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটা নির্জ্জীব নীরস গঠনহীন পিণ্ডের আকার ধারণ করিতেছে। (অবাক জ্যোৎস্না)

(মায়ের প্রবল তাড়নায় বাইরে বেরুনো, তাকানো বন্ধ, বয়স ও বিয়ের প্রসঙ্গে বারবার তিরস্কারে বিকারগ্রস্ত বার বছরের একটি মেয়ে জ্যোৎস্নার মানসিক অবস্থা এখানে সুন্দর ফুটেছে।)

এই কয়েকটি উদাহরণ থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়, তিনি তার মনের একাংশে স্পষ্টতঃই আধুনিক।

জগদীশগুপ্তের গল্পে সূচনা ও সমাপ্তি রচনায় বিশেষত্ব দুর্লভ নয়। প্রথমে সূচনার উদাহরণ দিই :—

(ক) ছন্দিত সংলাপ সহযোগে :

"আমাদের বেলা যত দোষ আর ওদের বেলায় ফুরুত—

আমাদের হ'লে বন্ধ হ'ত ধোপা নাপিত পুরুত॥" (ঘিয়ের ধোঁয়া) (খ) সাহস ঘটনার গতিলাভ : "বেনী একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে শুনিল, কে যেন তার ঘরের বেড়ার ওধার হইতে চুপি চুপি ডাকিতেছে—হরি ?" (আদিকথার একটি) (গ) নিতান্ত সাধারণ মন্তব্যে : "যে কষ্ট পেয়ে ছেলেটি মারা গেল তা বলবার নয়।" (কল্লোল) (ঘ) বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে : "মামা বলেন, একালের লক্ষণই এই : নিজেকে 'ইস্টাডি' করে সে লজ্জা পায় না, লজ্জা পায় কেবল সমবয়সী যে কোন ব্যক্তিকে রূপে তারুণ্যে জৌলুসে শ্রেষ্ঠতর মনে হ'য়ে। (আমিও দেবরাজের স্ত্রী) জগদীশগুপ্ত সাধারণতঃ গল্পের সূচনায় তীব্রতা পছন্দ করেন না। ফলে তাঁর বহু গল্পের সূচনাবাক্যগুলি নিতান্ত সাধারণ, অনুত্তেজিত বিবরণধর্মী। আস্তে আস্তে গল্পের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সমাপ্তি রচনাতেই তিনি বেশী মনোযোগী। তাঁর বহুগল্পের ক্লাইম্যাক্স সমাপ্তিতে। সমাপ্তি রচনায় তাঁর প্রবণতা ব্যঞ্জনাধর্মিতার দিকে নয়, বক্রোক্তি ও আকস্মিকতার দিকে। উদাহরণ :—'তারিণী ফুলির থুৎনিটা দু-আঙুল দিয়ে নেড়ে দিয়ে বলল, ক্ষেপী' (ঘেন্নার কথা) গল্প যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তাতে ফুলি ও তার সদ্যমৃত স্বামীর দাদা তারিণীর সম্পর্ক বিরোধমূলক মনে হয়েছে কিন্তু শেষ পংক্তিতে এসে বোঝা যায় তারিণী ও ফুলির গুপ্ত প্রেমের কথা। অনুরূপ আকস্মিকতা মিলবে 'উপলাহত প্রবাহ', 'ত্রয়োদশীর যাত্রা' প্রভৃতি গল্পে। তবে, আকস্মিকতাহীন নিতান্ত সাধারণ বিবরণে সমাপ্ত গল্পও অনেক আছে। যেমন— 'কিন্তু আমার চোখে তখন জল এসেছে—চল্‌বার জন্য পা বাড়িয়ে

বললাম, যাব।' (দুই সহোদর—করুণা ও কৃপা)

জগদীশগুপ্তের রচনার ভৌগোলিক পরিসর সংকীর্ণ তাই সংলাপেও বৈচিত্র্য কম। বৃত্তি বা অবস্থান অনুযায়ী সংলাপ রচনায়ও তিনি উদাসীন ছিলেন, বলা চলে। কিছু বৈচিত্র্য উল্লেখ করি :—

(ক) "নিম্ন মধ্যবিত্তের অমার্জিত শব্দ-সমন্বিত সংলাপ : "মাগীরা বিইছিলি কেন যদি সামলাতে না পারবি ?" (নিঠুর গরজী)

(খ) আঞ্চলিকতাচিহ্নিত : "হেই দিদিমণি, তোমার পায়ে পড়ি, রোষ করো না। দেরী সাধ করে' করি নাই গো ......।" (পারাপার)

(গ) উচ্চশিক্ষিত মার্জিত চরিত্র তাঁর রচনায় কম বলেই অতিরিক্ত মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ স্বল্প। যেমন—"মনে মনে হিসেব করে দেখ, ভালবাসার কেবল ভান করে' এসেছ—ভালবাসনি।" মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল) "তিনটি পাকা চুলে কখন বিয়ে আটকায় বাংলাদেশে।" (অঞ্জন শলাকা)

তিনি চাষী বা অনুরূপ শ্রেণীর মুখে শিক্ষিতের সংলাপ ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক' গল্পের গ্রাম্যনির্বোধ মিহির, 'আঠারো কলার একটি গল্পের চাষী বেণুকর, 'আদি কথার একটি' গল্পের চাষী সুবলের সংলাপ। এখানে তাদের নিজস্ব সংলাপ ব্যবহৃত হলে গল্পের বৈচিত্র্য বাড়ত বই কমত না।

শ্রী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"জগদীশবাবুর ভাষায় বিন্দুমাত্র রাবীন্দ্রিকতা নেই।"১৬ কিন্তু এই মন্তব্যে ত্রুটি থেকে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই :—

(ক) "কিন্তু পরিচয়ের ক্ষণ হইতেই সে গৌরব অশ্রুমুখী হইয়া আপনার লজ্জায় দেহ গুটাইয়া কেবলি বিবর খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।' (অঞ্জনশলাকা)

(খ) "পূর্ব পূর্ব পুরুষ কর্তৃক অনুসৃত ধর্মের দোহাই দিয়ে জমিদারের স্বার্থের দিকে টেনে যারা সাক্ষ্য দিতে গররাজি, ক্ষেত্তর তাদের ছেড়ে কথা কইত না—খাজনা আদায় হ'ত এবং সাক্ষীর অভাব হত না।" (পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক)

(গ) "উপবীত গ্রন্থনরত পিতার বিঘ্ন-উৎপাদক জনৈক নির্বোধের দুর্দশা কি ঘটিতে পারিত তাহাই কল্পনা করিয়া সুভাগিনী হাসে, আর পিতার জয়গর্বে ভারি উৎফুল্ল হয়।' (আমি ও দেবরাজের স্ত্রী)

সবুজপত্রযুগের রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চোধুরীর মতো তির্যক বাকভঙ্গীর-ও দেখা মেলে—"কিন্তু তার কল্পনা গৃহকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে যে অভিনব রূপ একদিন দিয়েছিল, সে রূপ এ গৃহের নেই; অপরিচয়ের সমস্ত কুণ্ঠা দ্বিধাই এ গৃহের আকাশ বাতাস ব্যেপে' আছে—।" (দ্বিতীয়)

"রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে যে গৃহিনীপণার অভাবের উল্লেখ করেছিলেন, জগদীশগুপ্তের রচনাতেও অনুরূপ উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।"১৭ সমালোচকের এই মন্তব্য অভ্রান্ত। শক্তিধর লেখক হয়েও তিনি রূপায়ণে মাঝে মাঝে যে দুঃসহ উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। কখনও ছোটগল্পের ব্যঞ্জনা-ধর্মিতা ক্ষুন্ন ক'রে, অনাবশ্যক উপকাহিনীর উপস্থাপনায় একমুখিনতাকে নষ্ট ক'রে, পরিণতিতে তাৎপর্যহীন আকস্মিকতা সঞ্চার ক'রে, মনোজটিলতা উপস্থিত ক'রতে গিয়ে আবশ্যক ধাপ বর্জন ক'রে, গল্পের নামকরণ বিষয়ে অবহেলা ক'রে, তিনি নিজ শিল্পী-স্বভাবের বৈরিতাই করেছিলেন। তাই "আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড়-রকমের বেগ" হওয়া সত্ত্বেও "অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তো বা অনুপস্থিত।"১৮

সপ্তম অধ্যায়ঃ শৈলজানন্দের ছোটগল্প

শৈলজানন্দের সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯২৩-এরও আগে। অবশ্য, 'কল্লোল' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাতেই তাঁর লেখা ছিল। আর 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র, মুরলীধর বসুর সঙ্গে তাঁর নামও যুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, "নতুনের নাম জারী করার" ব্যাপারেও তাঁর কিছুটা অবদান আছে অস্বীকার করা যায় না।

কল্লোল-কালিকলম প্রভৃতি আধুনিক পত্রিকাগুলির লেখকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের বিচারে শৈলজানন্দের স্থান বোধহয় প্রথম সারিতে। রাণীগঞ্জ আর বীরভূমের রূপসীপুরে কেটেছে তাঁর কৈশোরের দিনগুলি। ম্যাট্রিক পাশ করে পড়াশুনার বাঁধাসড়ক ছেড়ে তাঁকে নিতে হয় কয়লাকুঠির চাকরী, কুমারডুবী লোহার কারখানায় চাকরী। তাঁর পিতা সাপ ধরতেন, ম্যাজিক দেখাতেন, আর মা বাল্যকালেই মৃত। তাঁর মাতামহ ছিলেন জাঁদরেল রায়সাহেব। এই মাতামহের আশ্রয়ে কিশোর বয়স কাটলেও প্রথমে যৌবনে 'বাঁশরী' পত্রিকায় 'আত্মঘাতীর ডায়েরী' নামে গল্প লেখার অপরাধে তাঁকে সে আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার মেসবাসী হতে হয়। কলকাতার এক থুথুরে ভাঙা দোতলা বাড়ীর মেস, নানান জাতি ও বৃত্তির লোকের বাস, তাঁর "ধ্বংসপথের যাত্রী এরা" গল্পে এর পরিচয় কিছুটা মিলবে। ইতিমধ্যে কবিতা পরিত্যাগ করে তিনি গল্পরচনা শুরু করেছেন। কয়লাকুঠির জীবনসংক্রান্ত গল্প রচনার পর তিনি তরুণ ও অ-তরুণ সাহিত্যামোদীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন।*

---

* 'কল্লোল' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় শৈলজানন্দের "অন্তর্দৃষ্টি ও ধৈর্য", রচনার "মাধুর্য", "স্থানীয়-ভাষা"-প্রয়োগ ও ভাষাগত সংযমের সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছিল। 'প্রগতি' পত্রিকায় অতি-আধুনিক সাহিত্যের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীভৃগুকুমার গুহ লিখেছিলেন—"মানবমনের প্রবৃত্তিগুলি তো শাশ্বত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' ও শৈলজানন্দের 'অতসী' ঠিক একইভাবে আমাদের হৃদয়ে তোলপাড় তোলে না, কারণ শৈলজানন্দের চরিত্রগুলি সমাজের নিম্নতর স্তর হইতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহাদের ভিতর সেই "সার্বজনীন" বৃত্তিগুলিই অভিনবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।" (অতি আধুনিক সাহিত্যের রূপ সন্ধান, আষাঢ় ১৩৩৫) অ-তরুণ সমালোচকদের মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রাধাকমল

শৈলজানন্দের কলকাতা-জীবন ছিল সে সময় দারিদ্র-বিড়ম্বিত। ফলে তখন "সম্বলের মধ্যে লেখনী, অপার সহিষ্ণুতা আর ভগবানে বিশ্বাস।" এ অবস্থায় 'কল্লোল' পত্রিকা থেকে "শুধু শৈলজা আর নৃপেনকেই পাঁচ দশ টাকা করে দেওয়া হত, ওদের অনটনটা কষ্টকর ছিল বলে।"১ আর্থিক দুর্গতিবশতই তাঁকে এককালে থাকতে হয়েছে খোলার বস্তীতে, পানের দোকান দিতে হয়েছে ভবানীপুরে।২ অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সাক্ষ্য অনুযায়ী "অর্থের প্রয়োজন তখন অত্যন্ত" বলেই (মনামত, মতাদর্শগত বিরোধ) ১৩৩৩ বৈশাখে 'কালিকলম' পত্রিকা বার হয়, যার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন শৈলজানন্দ। কিন্তু এ পত্রিকাও সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাই পত্রিকার তৃতীয় বছরে শৈলজানন্দ সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করলেন। এরপর কল্লোল, প্রগতি, কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকা-কেন্দ্রিক সাহিত্য-উত্তেজনা স্তিমিত হলে, শৈলজানন্দ আর্থিক প্রয়োজনেই চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন ও সাহিত্যাদর্শকে জনমনোরঞ্জনের সুলভ তারল্যের কাছে বিসর্জন দিতে বাধ্য হন।

শ্রীসুকুমার সেনের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী তাঁর প্রথম দিকের গল্প ছিল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ প্রমুখের রচনার মতো রোমান্টিক। এই গল্পগুলি নজরুল ইসলামের রচনার সঙ্গে ১৩২৮ সালে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয় ও ১৩৩০ সালে "আমের মঞ্জরী" নামে সংকলিত হয়। সুকুমার সেন বলেছেন, দুটি গল্পে মুসলমান ঘরের ছবি আছে, আর গল্পগুলিতে অপরিণতির ছাপ আছে।৩ গল্পের ভাষা কথ্য, তবে তাঁর পরবর্তী বেশ কয়টি গল্পগ্রন্থের ভাষা সাধু, যদিও সংলাপ চরিত্রানুগ ও চলিত। এরপর তাঁর গল্পের বিষয়গত পরিবর্তন ঘটে। ১৩২৯-এর কার্তিক মাসিক বসুমতীতে বার হয় 'কয়লাকুঠি' আর একই বছরের ফাল্গুন প্রবাসীতে বার হয় 'রেজিং রিপোর্ট।' এই বছরই তাঁর সঙ্গে কল্লোলের অফিস ও গোকুল নাগের পরিচয় হয়। 'কল্লোল'-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাতে বার হয়—'মা'। পরে একাধিক গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 'সংহতি' পত্রিকার কর্মকর্তারা তাঁর কয়লাকুঠির গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে গল্প চেয়ে পাঠান। সেখানে 'খুনিয়ারা' নামক গল্প এবং কারখানা জীবন নিয়ে 'বাঙ্গালী ভাইয়া' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ লিখে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। সর্বোপরি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শৈলজানন্দের লেখার প্রশংসা করেন। (দ্রঃ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের পরিশিষ্ট)

তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নবযুগের বার্তাবহ সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই শৈলজানন্দের নিঃশব্দ আবির্ভাব হয়। শ্রীযুক্ত ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন ঃ "তবু সৃষ্টির প্রবণতায় তিনি কল্লোলের নয়—বহির্জীবনের ঘনিষ্ঠতায় একান্ত অন্তরঙ্গ এবং রচনাপ্রকাশ ও সম্পাদনার কর্মজগতে সহযোগী সতীর্থ হলেও শিল্পীআত্মার স্বধর্মে শৈলজানন্দ স্বতন্ত্র।'৪ কল্লোলের 'প্রবল বিরুদ্ধবাদ' ও 'বিহ্বল ভাববিলাস' কোনোটাই আতিশয্য নিয়ে তাঁর রচনায় উপস্থিত হয়নি। অপরদিকে, রবীন্দ্রকথিত 'দারিদ্রের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম'ও তাঁর রচনায় নেই। দারিদ্র বা লালসার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা তাঁর একান্তভাবে অভিজ্ঞতাসূত্রে আগত ও সংযতভাবে চিত্রিত। তাই একথা সত্য যে, "কল্লোল প্রবাহের নিকটতম প্রতিবেশী হয়েও, এমনকি বহিঃদৃষ্টিতে সেই ধারার একান্ত অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও, সুচিহ্নিত—সুচিন্তিতরূপে তিনি কল্লোলেতর। কল্লোলেতর তিনি তাঁর সর্বমোহরহিত ভারসাম্যবোধে, নিবিষ্ট প্রশান্ত জীবনানুভবের গভীরতায়,—এবং অতিশয় আত্মপ্রক্ষেপহীন অনুচ্ছ্বসিত স্বভাববর্ণনায়।"৫ পরবর্তীকালের তারাশঙ্করের সঙ্গে তাঁর মিল আছে আঞ্চলিকতা-সৃজনে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দের 'বেনামী-বন্দর ঃ জনি ও টনি' গল্প পড়ে তারাশঙ্কর সত্যবারের রক্ত-মাংসল জীবনের গল্প লেখার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তবে, অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিতে এবং আঞ্চলিক জগৎ রূপায়ণে এই দুই শিল্পীর মিল যতটা, পার্থক্য ও তার থেকে খুব কম নয়। শৈলজানন্দ অপেক্ষা তারাশঙ্কর অনেক বেশী আঞ্চলিকতানিষ্ঠ, শক্তিধর, বিচিত্রচারী, আদর্শবাদী তা অস্বীকার করা চলে না।

শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত শৈলজানন্দের সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন—"নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত জনতার তিনি প্রথম প্রতিনিধি। বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা এনেছেন। হাতির দাঁতের মিনার চূড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে।"৬ এ মন্তব্য অংশত সত্য তবে এ পর্ব বা প্রবণতা দীর্ঘস্থায়ী নয়। শৈলজানন্দে প্রধানত দ্রষ্টব্য—কয়লাকুঠির আদিম জীবনের সুখদুঃখের গল্প। এছাড়া গ্রাম ও শহরবাংলার মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির অন্তর্গত ক্ষুধা, লালসা, বঞ্চনা, ক্ষয়িষ্ণুতার নানান গল্প।

প্রথমে কয়লাকুঠির গল্পধারার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সম্ভবত ১৮২০-তে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাশিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠার প্রায় একশ বছর পর ১৩২৯ সালের কার্তিক সংখ্যা (অর্থাৎ, ১৯২২-এ) 'মাসিক বসুমতী'তে 'কয়লাকুঠি' গল্পের প্রথম

প্রকাশ দেখা যায়। 'দিনমজুর' গল্পসংকলনের ভূমিকায় লেখক নিজেই বলেছেন—"সাঁওতালদের লইয়াই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের যাত্রা শুরু করি এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমার সাঁওতালি গল্পগুলি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" অন্যত্র বলেছেন, আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লার খনি এবং চরিত্ররা সব সাঁওতাল কুলিমজুর।৭ 'কয়লাকুঠি' গল্পে দেখা যায় সূচনাতেই আছে কয়লাখনির পরিবেশ। নানকুর দুর্বলতা ছিল মাইনুর প্রতি। রথযাত্রার দিন সে স্ত্রীকে ফেলে মাইনুকে নিয়ে অন্য কয়লাখনিতে কাজ করতে যায়। নানকুর বৌ বিলাসীর দুর্বলতা ছিল রমনা খালাসীর প্রতি। সে শেষপর্যন্ত রমনার ঘরেই থাকত। একদিন খবর এল, নানকু খুন হয়েছে। তাকে দেখবার জন্য বিলাসী খাদে যায়। রমনা ইঞ্জিন চালায়, সে নামতে থাকে। গাড়ী মাঝপথে আটকে গেলে, বিলাসী গাড়ী পৌঁছে গেছে ভেবে নামতে গিয়ে পঞ্চাশফুট নীচে একটা মৃত দেহের ওপর পড়ে। সে বুঝতে পারে এ দেহ নানকুর। এই মৃতদেহ নিয়ে শোকার্ত বিলাসী হাঁটতে থাকে। মাথায় বিরাট কয়লার চাঙড় পড়ে দুজনেই চাপা পড়ে যায়। ওপরে রমনা অপেক্ষা করে থাকে। শ্রীযুক্ত অচ্যুত গোস্বামী ঠিকই বলেছেন—"শেষের দৃশ্যটির মর্মস্পর্শী বিবরণ দেওয়ার সময়েও লেখক ভাবাতিশয্যকে প্রশ্রয় দেন নি।৮ ১৩২৯ ফাল্গুন 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়—'রেজিং রিপোর্ট'। (পরবর্তীকালে 'বিচার' নামে অন্তর্ভুক্ত) শ্রীসুকুমার সেনের মতে, 'রেজিং রিপোর্ট' এবং 'বলিদান' গল্প মারফৎ তিনি কয়লাখাদের অন্ত্যজ অজ্ঞাত জীবন রূপায়ণে সাড়া জাগানোর সূত্রপাত করেন।৯ রেজিংবাবু চঞ্চলের নির্দেশে কয়লাখাদে বিপজ্জনক জায়গায় কয়লা কাটতে গিয়ে খসে-পড়া কয়লার চাঙড়ের আঘাতে টুইলা মারা যায়। এ ঘটনায় এবং ম্যানেজার টুইলার বৌকে তার স্বামীর কাছে যেতে অনুমতি না দেওয়ায় চঞ্চলের খুব খারাপ লাগে। কয়লাখাদের অন্ধকারে সে যখন এসব ভাবছিল তখন টুইলার বৌ সোহাগী তাকে টুইলা ভেবে জড়িয়ে ধরে। এটা জেমস সাহেবের চোখে পড়ে ও চঞ্চল বরখাস্ত হয়। তার শেষ মাইনের টাকাটা সোহাগীকে দিয়ে সে এ জায়গা ছেড়ে চলে যায়। চঞ্চল আপন অবস্থায় অসন্তুষ্ট, মানবদরদী, দুঃখিত (ক্ষুব্ধ নয়) কিন্তু বিভ্রান্ত, কারণ চলে আসবার সময় সে ভাবে "হা ভগবান! দাসত্বের পায়ে নিজের মনুষ্যত্বটুকু বিসর্জন দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, আমাকে সে পাপের শাস্তি দিতে তুমি কুণ্ঠিত হইও না।" বলার এই ভঙ্গিতে শরৎচন্দ্র স্মরণীয়। বিচারের প্রহসনাত্মক দিকটিই এ গল্পে লেখক দেখাতে চেয়েছেন বোঝা যায়। কাহিনীর দিক দিয়ে এর সঙ্গে পরবর্তীকালে কয়লাকুঠির জীবনাশ্রয়ী তারাশঙ্করের 'ঘাসের ফুল' গল্পের কিছুটা মিল আছে। এ গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য—কয়লাখনি সংক্রান্ত নানা তথ্য

ও পরিভাষা সম্বলিত পাদটীকা। যেমন, গল্পনামের পাদটীকায় লেখা হয়েছে—"রেজিং রিপোর্ট,—খনি হইতে কয়লা তোলার যে মোট হিসাব মালিকের কাছে পাঠাইতে হয়, তাহার নাম—রেজিং রিপোর্ট। রেজিং (Coal Raising)—কয়লা তোলা।" এরূপ ব্যবহার যে পাঠককে অনাস্বাদিতপূর্ব জগৎ ও প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সদুদ্দেশ্যেই, তা সহজেই অনুমিত হয়। 'বলিদান' গল্পে লাকু মাঝি তার ছেলেকে এক ঝোপে শুইয়ে খাদে কাজ করতে গিয়ে গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এদিকে ছেলেটাকে সাহেবের কুকুর কামড়ে মেরে ফেলে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে কুলীর দল সাহেবের বাংলো থেকে মরা ছেলেকে নিয়ে যায় কিন্তু টাকা নিতে অস্বীকার করে। সাহেবকে মারব বললেও মারে না। লাকুর ঘরের একাংশ মাটিতে বসে যাওয়ায় সে তলিয়ে যায়। সাহেবই এসব দুর্ঘটনার কারণ ভেবে দুঃখে তার বৌ মরা ছেলের নামে রাখা মুরগীটা সাহেবকে দিয়ে আসে। সাহেব এ দুঃখ বুঝতে পারে না, রোস্ট বানাবার আদেশ দেয়। গল্পের সমাপ্তিতে এই সহানুভূতিহীন দুঃখের আকস্মিকতার রূপায়ণে লেখক নিপুণতা দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। 'কল্লোল' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাতে প্রকাশিত 'মা' গল্পের পরী তার জেঠা দুখনের নির্দেশে তার পছন্দসই ছেলে টুরাকে বিয়ে করতে পারে না। টুরা পরীকে খাদের মধ্যে একদিন জোর করে টেনে নিয়ে শরীরে-মিলিত হয়। পরী গর্ভবতী হলে মনের দুঃখে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েও ভাবী ছেলেটার কথা ভেবে ফিরে আসে। গল্পের শেষে দেখা যায়, সে ছেলে কোলে টুরার ঘরেই প্রবেশ করে। "সাঁওতাল জীবনের আদিম নগ্নতা, অসামাজিক মিলনের স্থূলতা, উদ্দাম বাসনা আর বিক্ষুব্ধ আক্রোশের কূলভাঙা ঋজু প্রকাশমানতা" যে এ গল্পের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য তা অস্বীকার করা চলে না।১০ 'নারীর মন'-ও কয়লাকুঠির কাহিনী। ভুলি, তার বোন টুরণী আর ভুলির স্বামী পীরুর ত্রিভুজ প্রেমের গল্প। স্বামীর সঙ্গে বোনকে যাত্রার আসরে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে দেখে সে ক্রুদ্ধ হয়, বোনকে বাইরে ডেকে এনে এলোপাথাড়ি প্রহার করতে থাকে। তাতে তার স্বামী বাইরে এসে ভুলিকে চুলের মুঠি ধরে লাথি মারে, সকলের সামনে বন্ধ্যা বলে অপমান করে। নিস্তব্ধ ধাওড়ায় ফিরে প্রতিশোধলিপ্সু ভুলি তার এককালের প্রেমিক ভোলাকে বলে সে যদি তার স্বামীকে গায়ের জোরে হারাতে পারে, তাহলে সে তাকে 'শাঙা' করবে। পরদিন পীরু আর ভোলার লড়াইয়ে ভোলাই হেরে যাওয়ায় ভুলি স্টেশনে চলে আসে, আসাম-যাত্রী কুলির দলের সঙ্গে বোনের পরিবর্তে সে-ই রওনা হয়ে যায়। কাহিনী অংশের উপস্থাপনার দিক থেকে শ্রীভূদেব চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথের 'দুইবোন' উপন্যাসের কথা স্মরণ হয়েছে, যদিও পরিবেশ ও অন্যান্য দিকের কয়েকটি পার্থক্যের কথাও তিনি বলেছেন।১১ গল্পবিচারে বলা যায়,

কামনাবাসনার তীব্রতাকে স্থানিক চিত্রসহ শৈলজানন্দ এক্ষেত্রে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। ভুলির এই আসাম চলে গিয়ে আত্মত্যাগের মধ্যে কিছুটা মধ্যবিত্তয়ানার ছাপ পড়লেও রূপায়ণ সুন্দর হয়েছে। 'ঝুমরু' গল্পের ঝুমরু লোটন সর্দারের মেয়ে মতিকে ভালবাসে। শিয়াড়ী পাতা আনতে যাবার দিন সামান্য কারণে সে বাড়িতে মার খায়, আবার ফিরে এলে লোটনের কাছ থেকে তার মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ এলে সে আবার মার খায়। ঝুমরু তখন পালিয়ে যায়। দূর থেকে লোটন মাঝির মেয়ে মতির কলঙ্কে আক্ষেপের গান শোনা যায়। মতি বা ঝুমরুর পালিতা মায়ের কপাল-দোষের আক্ষেপ ঠিক আদিবাসী সুলভ নয়। তৎসত্ত্বেও গল্পের প্রথমাংশে সেই পরিবেশ কিছুটা ফুটে উঠেছে। তবে এর ভাববস্তুতে আদিবাসীজীবনসুলভ জীবনাগ্রহের তীব্রতা সংহতি লাভ করে নি। 'দিনমজুর' গল্পসংগ্রহের 'বনবিহগী' গল্পে কয়লাখনির রিক্রুট পুলিশের লোকের পরিচয়ে সর্দারের ছেলে সোনাকে নিয়ে যায়, তার প্রেমিকা মুকরীও সঙ্গে যায়। একদিন সাহেব মুকরীর ওপর বলপ্রয়োগ করতে গেলে সে ঘুষি মেরে চলে আসে। দুজনে অন্য বুঠিতে পালায়। সেখানে সোনা আর মুকরীর বিবাহ-উৎসবের দিনে সাহেব উপস্থিত হয়ে মুকরীকে প্রথমে চাবুক ও পরে গুলি মেরে হত্যা করে। পরের দিন সোনাও নিখোঁজ হয়ে যায়। সভ্য মানুষের হাতে স্থানীয় অসভ্য বাসিন্দাদের অসহায়তাই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পটি পরে শুধু নাম বদলেছে ('বনের হরিণ ছিল বনে') তাই নয়, সমাপ্তি অংশও পরিবর্তিত হয়েছে। মুকরি নিহত তো হয়ই না, বরং সোনা সাহেবের হাতটা মুচড়ে দেয়, সাহেব পালায়। তারপর সোমা ও মুকরি সুখে দিন কাটায়, মাঝে মাঝে সাহেবদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কথা বলে। এই পরিবর্তন থেকে, অসহায় মানুষের প্রতিরোধ-স্পৃহা প্রকাশিত হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। 'বনবিহগী' গল্পে সাঁওতাল গ্রামের চিত্র রচনায় সহজ স্বাভাবিকতা বিদ্যমান হলেও গল্পনাম থেকে অনুমান হয়, লেখকের ঝোঁক যতটা বনবিহগী মুকরীর শোচনীয় পরিণামকাহিনী রচনার দিকে, ততটা সামাজিক প্রসঙ্গের দিকে নয়, যদিও গল্পের নানাক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা ছিল। পরিবর্তিত গল্পটিতেও সে সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার হয় নি। 'বন্দী' গল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কয়লাখনির শ্রমিকদের দুঃখে সহানুভূতি জানাতে আসে কর্মী সঙ্ঘের পুরুষ ও মহিলারা। তবে সেখানে বিলাতী কাপড় বর্জনের প্রস্তাব হাস্যকর। মূলকাহিনী হল, বুড়ো সুখনের ছেলে পানটু আর মেয়ে নিশি খাদে কাজ করত। পাথর পড়ে নিশি মরলে ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য পানটুকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সুখন রেগে গেলে পানটু তার প্রেমিকা পানিকে নিয়ে টাকা ফেরৎ দিতে গেলে সাহেব রেগে গিয়ে তাদের বন্দী করে রাখে। এতে কুলীরা খাদে নামতে রাজী হয় না। বন্দী অবস্থায় অনাহারে মৃতপ্রায় হলেও পানটু

ও পানির বাসনা, মুক্তি পেলে পুলিশকে জানাবে। আরও কয়েকদিন বন্দীত্বের পর জানলার দুই পাশে দুজনের মৃত্যু হয়। "পানির মাথাটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। মাত্র একখানা হাত, গরাদের ফাঁকে পান্টুর গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পানটু তাহারই অপর পার্শ্বে শিকের গায়ে হেলান দিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল।" সে বেঁচে আছে ভেবে সাহেব তার গায়ে বুটের ঠোক্কর মারলে পানটুর মৃতদেহ মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। এ গল্পের লেখক মজুর-অসন্তোষের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকবোধে উত্থাপন করলেও তাতে গুরুত্ব আরোপ করেন নি, খনি মালিকদের প্রতি সুস্পষ্ট ঘৃণাও প্রকাশিত হয় নি। ফলে নির্যাতনের ফলে বিদ্রোহ নয়, করুণ অসহায়তাই এ গল্পের প্রধান সুর হয়েছে। 'মরণবরণ' গল্পের প্রধান বিষয় প্রেমে আত্মাহুতি ও বিত্তবানের বঞ্চনা। ভাটুলের ছয় ছেলে, বৌ খনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। বৃদ্ধবয়সে সে তরুণী রুকিকে বিয়ে করে। রুকি যৌন-অতৃপ্ত, স্বামীর একান্ত অননুগত। রুকির গর্ভজাত ফাগুর গৌরকান্তি দেখে তার পিতৃত্ব সম্পর্কে ভাটুলের সন্দেহ হয়। রুকিকে সে সঞ্চিত অর্থ ও ভিটা থেকে বঞ্চিত করার জন্য যখন দানপত্র লেখাচ্ছিল তখন কুঠির ম্যানেজার এসে দানপত্র ছিঁড়ে ভাটুলকে শাসিয়ে যায়। আহত ভাটুল সব বুঝতে পারে। তেইশ নম্বর গ্যালারীতে ডিনামাইট লাগিয়ে রুকির কাছে সে জানতে চায় তার ভালবাসার সততার কথা, দুজনেই মরতে চায় বিস্ফোরণে। কিন্তু ছেলের কথা বলে রুকি পালিয়ে গেলে ভাটুল মারা যায়। ভাটুলের এই অপমৃত্যুর চিত্র করুণ ও মর্মস্পর্শী। অন্যদিকে দিন-দশ পর সাহেব যখন বদলি হয়ে যাচ্ছে, তখন রুকি বলে— "আমাদের কোথা রেখে যাবি সাহেব— আমরাও যাব।" সাহেব তার ছেলেটাকে রসোগোল্লা খাওয়ানোর জন্য দুটো টাকা দিয়ে সশব্দে মোটর ছেড়ে দেয়। বঞ্চনার আকস্মিকতায় গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্লটের বিন্যাসে এ গল্পে শৈলজানন্দের কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। 'সাঁওতাল' গল্পে সামাজিক উপস্থাপনা গল্পের তুলনায় বেশি। অত্যাচারী নায়েব শুধু যে সাঁওতালদের ডাঙা কেটে জমি তৈরী করেছে তা-ই নয়, বরং একদিন সাঁওতালি মেয়ে টেবিকে চাপরাশীদের সাহায্যে ধরে নিয়ে যায়। মদ খেয়ে নায়েব যখন মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন গৃহিণী এসে পড়ায় সে চলে যায়, চাপরাশীরা ধর্ষণ করে। সাঁওতালরা পরদিন এসে টেবিকে নিয়ে গিয়ে বিষবাণ দিয়ে মেরে ফেলে। তারা এই মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করে যে, এ অত্যাচারের শোধ নেবে। জঙ্গলে একদিন চাপরাশী মারা পড়ে, অগত্যা নায়েবের নির্দেশে তাদের ঘর পোড়ে। এক্ষেত্রে সাঁওতালদের ক্রোধ আরও বেশী হওয়ারই কথা। যদিও এই গল্পের অন্যত্র লেখক বলেছেন—"ভারতের সেই আদিম অনার্য অধিবাসী হয়ত মিষ্টি কথার গোলাম হইতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার কাহারও চোখ রাঙানির অনুশাসন মানিয়া চলে না।"

কিন্তু নায়েবের অত্যাচারের পর ওদের সর্দার বলে—"ইখানে থেকে আর কি করবি—চল।" অগত্যা, সাঁওতালরা সবাই বিনা প্রতিবাদে চলে গেল। শুধু টেবির বৃদ্ধ বাবা থেকে যায়। শেষে নায়েবের ছয়-সাত বছরের মেয়েকে চুরি করে সে প্রতিশোধ নেয়। এই গল্পে সামাজিক ও পরিবারগত সমস্যা দুই-ই একাধারে মিলেমিশে সার্থক হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু লেখক সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। এ গল্পে সাঁওতাল সদার-এর এই নিষ্ক্রিয়তা পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের 'শেষকথা' গল্পের আদিবাসী সর্দারের নিষ্ক্রিয়তা এবং মৃত্যুকে সুন্দর আখ্যা দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ গল্পের সর্দারের আচরণের সঙ্গে 'অভাগা' গল্পের টুইলার আচরণের মিল আছে। টুইলার বৌকে কয়লাখনির ম্যানেজার ধর্ষণ করলে বৌ আত্মহত্যা করে। তখন টুইলা ম্যানেজারের বৌকে বিষবাণে হত্যা ক'র তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যায়। সে ছেলে (রৌপ্পা) টুইলার আশ্রয়ে বড়ো হয়। 'বিবাহ' গল্পের (প্রথমে 'জোহানের বিহা' নামে প্রকাশিত) খোঁড়া পলহানের সঙ্গে টগরীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দুধ নিতে আসা বাঙালীবাবু বিনয়কে সন্দেহ করা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া হয়। শেষপর্যন্ত পলহান আত্মহত্যা করে। তখন, "জীবনে যাহার জন্য শোক-তাপের কোনও লক্ষণই দেখা যায় নাই, আজ মৃত্যুর পর তাহারই জন্য" টগরী কাঁদতে থাকে। শৈলজানন্দ সাঁওতাল পাত্রপাত্রীর আত্মহত্যা ঘটিয়ে অনেক গল্পে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। গল্পটি অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হওয়ায়, গল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুকুমার সেনের মত এক্ষেত্রে যথার্থ—সংক্ষেপ করায় গল্পটি উন্নত হয় নি। পাত্রপাত্রীর নাম পরিবর্তনও সুসঙ্গত হয় নি।১২

শৈলজানন্দ এইসব কয়লাকুঠির মানুষদের গল্প লিখে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বাঙালী পাঠকসমাজ এই আগন্তুকদের যথাসময়ে অভ্যর্থনা করে নিতে দেরী করেনি। কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতা সৃজনের জন্য তিনি বহু প্রশংসিত। শ্রীযুক্তা দীপ্তি ত্রিপাঠী আঞ্চলিক ঔপন্যাসিকের ত্রিবিধ দায়িত্বের কথা বলেছেন—(ক) অঞ্চলটি সম্বন্ধে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা (খ) সহানুভূতি (গ) নির্লিপ্তি।১৩ এখানে তথ্য হিসাবে স্মরণীয় যে শৈলজানন্দের বাল্যকাল কেটেছে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে। তিনি কিছুদিন চাকরীও করেছেন কয়লাখনিতে। তবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও রূপায়ণ বিষয়ে দক্ষতার বিচারে তিনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলার সগোত্র ছিলেন না। কয়লাখনি ও মজুরদের সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "জারমিনাল" (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৫) রচনার উদ্দেশ্যে জোলা "immersed himself in the relevant documentation, here industrial and labour problems. Then

he spent weeks studying a great strike that was in progress—acting as secretary to a radical leader so that he would be accepted by the miners and taken into their confidence. But, once the writing was begun, Zola integrated the facts from his books and observations imaginatively, and as a result, a whole community came to life and grew on his pages…"১৪

বস্তুতঃ শৈলজানন্দের মধ্যে এই তথ্য সংগ্রহে ও রূপায়ণে নিষ্ঠা ছিল না। তবে, তিনি সংগৃহীত তথ্যকে কিছুটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন—পরিবেশ বর্ণনায়, চরিত্রসৃজনে ও শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক উপস্থাপনে। প্রয়োজনে একাজে পরিভাষা, আঞ্চলিকসঙ্গীত ও সংলাপরীতিকে ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর "নির্লিপ্তি"ও অনেকাংশে অটুট। লেখক যে নির্যাতিত ও দরিদ্র কয়লাখনির মজুর সম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল সেটা বোঝাও কষ্টকর নয়। কিন্তু শৈলজানন্দের রচনায় ব্যাপ্তি বড় কম। কয়লাখনির গল্প বা উপন্যাসে খনিজীবনের ভূমিকা নিতান্তই পরিবেশ রচনাতে নিঃশেষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেকালে স্পষ্টতই বুঝেছিলেন—"The worker is the victim of the facts of existence—capital, competition, industrial crisis"১৫ কিন্তু বহুকাল ধরেও শৈলজানন্দ তা বুঝতে পারেননি বা চাননি। বস্তুতঃ তাঁর দৃষ্টি এসব সামাজিক প্রসঙ্গের পরিবর্তে ব্যক্তিক সুখ দুঃখ বঞ্চনার দিকেই ঝুঁকেছে। 'দিনমজুর', 'সাঁওতালী', 'কয়লাকুঠি' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে এবং 'কয়লাকুঠির দেশ', 'ষোল আনা' প্রভৃতি উপন্যাসে আঞ্চলিক চিত্র এসেছে, কিন্তু তাঁর অদ্যাবধি প্রকাশিত অজস্র রচনায় আর কয়লাখনি বা অন্য আঞ্চলিক পরিবেশ রেখাপাত করেনি।*

* এই প্রসঙ্গে এক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সাহিত্যে আঞ্চলিকতাসৃজনে অধিকতর আত্মনিয়োগ করবেন কিনা এ সম্পর্কে সংশয়ী শৈলজানন্দ শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে অত্যন্ত নিরুৎসাহিত করেন এই বলে যে, সে সাহিত্য "কেউ বুঝতে পারবে না।" অনুরূপ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকে করলে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর দেন। তিনি শৈলজানন্দকে শুধু আঞ্চলিক সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেন তা নয়, বলেন—"আমি যে ওদের ভাষা জানি না, না হলে আমিই লিখতাম!" (কাছে বসে শোনা—ভবানী মুখোপাধ্যায়, অমৃত ৫ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, পৃঃ ১৮৬-৮৭) দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথ নন, শরৎচন্দ্রের উপদেশের দ্বারাই তিনি এক্ষেত্রে প্রভাবিত হন।

আঞ্চলিকতার প্রতি এই সাময়িকমনস্কতার কথা অবশ্য এমিল জোলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জোলা-ও "জারমিনাল ছাড়া কয়লাখনি-জীবনাশ্রিত বা অন্য কোন অঞ্চল-কেন্দ্রিক উপন্যাস লেখেন নি। ডি, এইচ, লরেন্স-এর Sons and Lovers এবং Lady Chatterley's Lover উপন্যাসে কোথাও কোথাও কয়লাখনির পরিবেশ থাকলেও মজুর জীবন উপেক্ষিত এবং আঞ্চলিকতা সৃষ্টি লেখকের প্রধান বিষয় ছিল না। অন্যান্য তরুণ লেখকদের লরেন্স-প্রীতি থাকলেও (যেমন, বুদ্ধদেব বসু) শৈলজানন্দের সম্পর্কে এরকম কিছু জানা যায় না। বরং বলা চলে, পঠনমাধ্যমে নয়, চাকরী ও বাল্য-পরিবেশ সূত্রেই তিনি এ ধরণের গল্প উপন্যাস লিখেছেন। তাই, টমাস হার্ডি বা তারাশঙ্কর আঞ্চলিক অর্থে যতটা ব্যাপক ও বিশিষ্ট, শৈলজানন্দ তা নন। তিনি সাময়িক কালের জন্য আঞ্চলিক চিত্র (Local colour) নির্মাতা মাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন— "শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ, কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসে নি।"৫৬ তবে, অস্বীকার করা যায় না, শৈলজানন্দের আঞ্চলিকতাচিহ্নিত গল্পে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যসন্ধানী মনোভাব আছে, আছে অপরিচিতকে পরিচিত করানোর আগ্রহ। বস্তুতঃ, এদিক থেকে কল্লোল পর্বে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে।

এবার শৈলজানন্দের শহর ও গ্রামের মধ্য ও নিম্নবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক গল্পগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। কয়লাকুঠির কাহিনী নিয়ে শুরু করলেও প্রথমাবধি তিনি বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্য ও নিম্নবিত্তের মানুষদের নিয়ে অজস্র গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে সমকালীন অন্যান্য তরুণ লেখকদের থেকে তাঁর তফাৎ এইখানে যে, অভিজ্ঞতার বাইরের জগৎকে গল্পে রূপ দেবার প্রলোভন তিনি দমন করেছেন এবং বিদেশী বইপড়া চিন্তা ও পরিস্থিতিকে স্থানকালবিস্মৃত হয়ে বাংলা গল্পে রূপ দেবার ব্যাপারে আকৃষ্ট হন নি। শৈলজানন্দের প্রথমদিকের বই 'অতসী' (১৩৩২)-তে "ধ্বংসপথের যাত্রী এরা" গল্পটির প্রথমে মেসবাড়ীর অতিদীর্ঘ বর্ণনা তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা প্রসূত। চাকরীর খোঁজে নায়ক অজিত পাড়াগাঁ থেকে সহরের মেসে এসে নানা চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়, জল নিয়ে জাতিবিরোধ দেখে। একদিন পথে কাঙালী ভোজন দেখে সে বিস্মিত। ভিড়ের চাপে মৃতপ্রায় একটা কাঙালী মেয়ে অতসীকে সে উদ্ধার ক'রে তার মার হাতে তুলে দেয়। ফেরার পথে এক অন্ধ ভিখারীর হাত ছিনে ক্ষত বিক্ষত করছে দেখে কষ্ট পায়। কলকাতার এ নির্মম পরিচয়ে সে স্তম্ভিত। একদিন মেসের রান্নাঘরে অতসীর মাকে ভাত চাইতে দেখে অজিত তাকে মুঠো মুঠো ভাত তরকারী দেয়। এদিকে বিকালে জল নিয়ে বিরোধের সময়, অতসীর মা নর্দমার মুখ

গুঁজে পড়ায়, অজিত দরদবশতঃ তাকে তুলে তাদের বস্তিতে নিয়ে যায়। এজন্য মেস বাসিন্দাদের কাছে সে অসন্তোষ ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়। আর একদিন অর্থ সাহায্যের জন্য বস্তিতে গেলে বস্তিবাসীরা তাকে মারতে আসে। ম্যানেজার এসব জেনে তাকে মেসে রাখতে চায় না। এক বাড়িতে ছাত্র পড়াবার সময় অতসীর মাকে ভিক্ষে চাইতে দেখে অজিত টাকা দেয়, তার চোখ ছলছল করে। এই রচনাটিতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'পাঁক' ও 'বেদে'র তুলনায় অধিকতর "সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব" লক্ষ্য করেছেন।১৭ কথাটা ঠিক নয়। কারণ, নায়ক অজিত তথা লেখকের দরিদ্র-প্রীতি এ পর্যায়ে কিছুটা আন্তরিক হলেও গভীর নয়, তা অনেকটাই যুগের হাওয়ায় চলা। গল্পের মাঝে মাঝে দারিদ্র্যের বর্ণনা প্রদর্শন-ইচ্ছা থেকে এসেছে। ভিখারী মায়ের সংলাপে অ-ভিখারীর স্পর্শ লেগেছে। এ সব জায়গায় লেখক কল্লোলের তরুণদের সমধর্মী। 'ব্যানার্জী' নামক গল্পে লেখক তাচ্ছিল্যযোগ্য চরিত্রের মহত্ত্ব দেখালেন। ব্যক্তিত্বহীন অল্পশিক্ষিত ব্যানার্জী ঘরসংসার, রান্নার কাজও করে দেয়। সদ্য চাকরী যাওয়া অবস্থায় পুরানো বন্ধুর দারিদ্র্য বিচলিত হয়ে, পাওয়া পাঁচ টাকার চারটিই তাকে দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর আবার কুলি-তদারকের কাজ পেলে মৃতবন্ধুর ছেলের নামে মানিঅর্ডার করে। সবাই ঠাট্টা করে, সে বুঝি বৌকে টাকা পাঠাল। পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এরকম চরিত্র মেলে। 'জামাতা বাবাজীউ" গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত জামাতা চরিত্রের অহঙ্কারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পের মত এ গল্পের সূচনাও মেসবাড়ীর বর্ণনায়। জামাইষষ্ঠীতে সুদূর বিহারে যাবার সময় মেসবাসিন্দা রতনকে তার বাবা শিখিয়ে দেয়, চেনঘড়ি, বিয়ের পণের বাকী গোটাষাটেক টাকা সে যেন নিয়ে আসে। অনেক কষ্টে ছুটি পেয়ে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছালেও স্ত্রী প্রভাবতী অনেক রাত করে ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। রতন ফিরে তা দেখে ক্রুদ্ধ হয়। আবার ভোরবেলা ঘুমভেঙে প্রভা রতনকে গভীরভাবে নিদ্রিত দেখে তার ঘুম ভাঙাতে সাহস পায় না। অসন্তুষ্ট রতন সকালেই টাকা ও রেল টিকিট নিয়ে রওনা হয়, ঘড়ি ছাড়া রূপোর চেন ফিরিয়ে দেয়। সহরে ফিরে সে বাবাকে মিথ্যে কথা বলে, পয়সা আদায় না হওয়ায় বিনা টিকিটে আসছিল বলে তাকে রাস্তায় আটক থাকতে হয়। বাবা আবার ছেলের বিয়ে দেবে ঠিক করে, ছেলেও অরাজী দেখা যায় না। জামাই আর তার বাবার নৃশংসতা, হৃদয়হীনতা, ঘৃণ্য লোভ এ গল্পে সুন্দরভাবে প্রকাশিত। 'আলো আঁধারি' গল্পে যাত্রাজগতের কিশোরদের অনাদৃত অনাহারক্লিষ্ট জীবনের প্রতি লেখকের সহানুভূতি স্পষ্টতঃ প্রকাশিত। প্রচুর আলোর নীচে যে সব ছেলে কৃষ্ণ বা রাধিকা সাজে, আলোময় আসরের অন্তরালে সামান্য একটা সিগারেট বা একটা বাড়তি চায়ের জন্য তারা অন্যের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে। এজন্য

পালাশেষে তাদের মার খেতে হয়। একটি গল্পের নাম তৎকালে প্রচলিত একটি ভাদু গানের প্রথম পংক্তি অনুসারে ঃ 'আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে।" গল্পাংশ বিশেষ সংহত নয়, অতিবিস্তৃত পরিসরে দরিদ্র পরিবারে ভাদুগানের আসর এবং গায়ক মানিকের লাঞ্ছনা বর্ণিত। এ গল্পেও 'আলো আঁধারি' গল্পের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে। মানিক যাত্রাদলে রাধা সেজে গান করে। তাকে বাড়ীতে ভাদু গাইতে বলা হয়। এতে বাড়ীর জামাই রেগে গিয়ে তাকে মারে। অবহেলিত অনাদৃত মানিকের প্রতি নারানীর দরদ দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। এই অংশে শরৎচন্দ্রের রচনা স্মরণে আসে। 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পের মতো এখানেও পাদটীকায় ভাদুগান সম্পর্কে গল্পাতিরিক্ত তথ্য সংযোজিত হয়েছে। 'বধূবরণ' (১৩৩৬) গল্পগ্রন্থের নামগল্পটি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গল্প। মামীর গঞ্জনা এবং সমবয়সী বিবাহিত মেয়েদের সঙ্গে ননীমাধবের বয়ঃসন্ধিকালের একাংশ কেটেছে। সৎমা তাকে যত্ন করে ব'লে বাবার সেটা সহ্য হয় না, অগত্যা ননীমাধব পালায়। অনেক বছর পরে তাকে সাহেবী সজ্জায় ট্রেনে দেখা যায়। কিন্তু এই পরিবর্তিত জীবনের সূচনা হয় কিভাবে, বর্তমান জীবিকাই বা কি স্পষ্ট জানা যায় না। কামরায় একটি মেয়ের কানের দুল চুরি করতে ব্যর্থ হয়ে ননীমাধব শেষ পর্যন্ত আলাপসূত্রে তাদের সঙ্গেই যায় (একি নারীত্বের, গৃহবন্ধনের আকর্ষণে ?) এবং মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেলে। কিন্তু তার ছোটবেলার নারীসাহচর্য স্মরণ করেই সম্ভবতঃ বৌকে পাড়ায় অল্পবয়সী ছেলেদের কাছে যেতে দেয় না। একদিন সে বৌকে নিয়ে মামীর কাছে যাবে বলে রওনা হয়। কিন্তু মধ্যবর্তী এক ষ্টেশনে বৌ-এর গয়নার বাক্স নিয়ে সরে পড়ে। ননীমাধবের যৌন জটিলতা ও মানসিক অস্থিরমতিত্ব দেখানোই লেখকের উদ্দিষ্ট বোঝা যায়, কিন্তু তিনি বিষয়টি যথাযোগ্যভাবে বিন্যস্ত করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বা পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এককালীন মানসিকতা বিষয় বিন্যাসে যে ভাবে সিদ্ধ শৈলজানন্দের মানসিকতা তার অন্তরায়—এ গল্পের ব্যর্থতায় সে কথা প্রমাণিত। 'অতি ঘরন্তি না পায় ঘর' গল্পে বধুর মানসিক জটিলতা প্রধানত বর্ণিত। ছেলে হয়না বলে সুষমাকে গ্রাম্য শাশুড়ী ও অন্যান্যরা নির্মম কটু কথা বলে। কলকাতাবাসী স্বামী শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যায়। গঞ্জনা থেকে সুষমার মনে তখন অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়। শূন্যতা কাটাতে সে পাড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে মেশে, পুতুল কেনে, কাল্পনিক সন্তান নিয়ে মগ্ন হয়। কিছুদিন পর সইয়ের স্বামীর পুনর্বিবাহের কথা শুনে মর্মাহত হয়ে সে আত্ম-হত্যা করে। পোষ্ট-মর্টেম-এ জানা যায় সে সন্তান-সম্ভবা ছিল। গল্পের বিষয় বিন্যাসে পূর্বোক্ত গল্পের মত অস্বাভাবিকতা না থাকলেও লেখক এখানে ভাববস্তুকে নিছক গল্পত্বের নির্মোক ছিন্ন করে উন্নীত করতে পারেন নি। 'ভজুর' গল্পটিও বিন্যাসের ত্রুটির জন্য

পাঠককে তেমন করে আকৃষ্ট করতে পারে না। কাচের গ্লাস ভেঙে ফেলার জন্য চড় মেরে অনুতপ্ত প্রভাকর অফিস যাবার পথে রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসের তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। তখন সে চিন্তা করতে লাগল, সে যদি মরে যেত তাহলে তার বাড়ীর লোকেরা মৃত্যুটা কেমন ভাবে গ্রহণ করত? এই মৃত্যুচিন্তার পর "আজ সবাই তাহার কাছে যেন নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী যে এত সুন্দর ইহার পূর্বে সে কথা প্রভাকরের কোন দিনই মনে হয় নাই।" ফেরার পথে অন্যমনস্কতার জন্য সে মোটর চাপা পড়ে মারা যায়। গল্প এখানে শেষ করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরণের গল্প জীবন সম্পর্কিত বক্তব্য বা তির্যক মন্তব্যে পাঠককে ভাবিত করার পথেই সার্থকতা পায় (যেমন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কোনো গল্পে) অথবা, ভাষা ব্যবহারে বর্ণনাগুণে তা আকর্ষণীয় হয় (যেমন, বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো গল্পে)। শৈলজানন্দ এখানে কোনো পথেই অগ্রসর হতে পারেন নি। 'মৃত্যুভয়' গল্পে পুত্রের অকাল মৃত্যুতে পিতা-মাতার মনোবিকারকে দেখানো হয়েছে। বহুবাঞ্ছিত সন্তানের হাস্যকলরবে গৃহস্থালী ছিল মুখরিত। ছেলের বায়নায় বিসর্জনের সময় সরস্বতীর মুণ্ড এনে তাকে দেওয়া হয়। সেই ছেলে ঝুঁকে ঠাকুর দেখতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মারা গেলে "মাঝদরিয়ায় নৌকাডুবি হইলে যেমন হয়, ইহাদেরও ঠিক তেমনি হইয়া গেল!" তখন আর তাদের বেঁচে সুখ নেই। শেষ পর্যন্ত সরস্বতীর মুণ্ড বিসর্জন দিয়ে স্বামী স্ত্রীর আতঙ্কমুক্তির কথা বলে লেখক গল্পের সুরটাকে নষ্ট করে ফেলেছেন। অচিন্ত্যের 'রুগ্ন' গল্পের সঙ্গে এ গল্পের প্রথমাংশের মিল আছে। আবার সন্তানমৃত্যুর মনোবিকারের দিক থেকে তারাশঙ্করের 'সন্ধ্যামণি', 'স্থলপদ্ম' এবং মানিকের 'মাটির সাকী' গল্পের কথা মনে পড়ে। তারাশঙ্কর-এর চরিত্রগুলির অবশ্য মানসিক জটিলতা নয়, ছিল শোকের তীব্রতা; মানিকের গল্পটিতেই জটিলতার পরিচয় মেলে। শৈলজানন্দ এ ক্ষেত্রে বিষয়টির সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি বলা যায়। "বেনামী বন্দর: জনি ও টনি' গল্পের বিষয় পশু ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। জনি ও টনি দুটি কেনা কুকুর দুই বাড়িতে থাকে। এক বাড়ির ছেলে বাঁটুল। সে জনিকে কিছুতেই এ বাড়ি থেকে তার বাচ্চাদের নিতে দেবে না। একদিন গভীর রাতে জনি তার শেষ বাচ্চাটাকে নিয়ে এল। কিন্তু আগুন লেগে বাঁটুলদের ঘর পুড়ে গেলে বাচ্চাটা মরে যায়। জনি রেগে গিয়ে বাঁটুলকে কামড়ে দেয়। এ গল্পে অবশ্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী, শরৎচন্দ্রের মহেশ, তারাশঙ্করের কালাপাহাড় প্রভৃতি গল্পের মতো পশুর প্রতি বাৎসল্য তেমন তীব্রতায় বর্ণিত নয়, তবুও পশু মানুষের সম্পর্ক, জনির মধ্যে প্রবল মাতৃত্ব বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নারীমেধ' গল্পসংগ্রহের নাম-গল্পটিতে কি

বিষয় নির্বাচনে, কি তার রূপায়ণে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা সত্যই অভূতপূর্ব। বস্তুত এমন গল্প শৈলজানন্দের সমগ্র গল্পধারাতেও বিরল। গুরুমার কৃপায় চাষীর মেয়ে ছবি ঝি-এর কাজ পায় নয়নতারার বাড়িতে। নয়নতারা তার ভাই পঞ্চুর বৌ মায়ার ছেলে না হওয়ায় তাকে কটু কথা বলে, কিন্তু তার নিজেরও ছেলে নেই, গোপনে গুরুমার কাছে ওষুধ চায়। নয়নতারারই যোগ্য ভাই পঞ্চু কয়লাকুঠির চাকুরে—যেমন দুশ্চরিত্র, তেমনি ধূর্ত। ছবির প্রতি তার কামদৃষ্টি লুব্ধ জন্তুর মতো অনুসরণ করে। একরাত্রে মায়া অসুস্থ এবং নয়নতারা নিদ্রিত থাকার সময়ে ক্লান্ত ছবিকে সে ধর্ষণ করে। এরপর চলে নিরুপায়ত্বের পুনরাবৃত্তি। মাতৃত্ব দেখা দিলে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেবার স্তোক দিয়ে এক ধাই-এর সাহায্যে পঞ্চুর নির্দেশে ওষুধ দিয়ে অকালে ভ্রূণ প্রসব করানো হয়। কিন্তু ছবি মারা যায়। তখন পঞ্চু আর তার দলবল পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে খাদে ফেলে দেয়। ডাক্তারের কাছে শুধু নিজের দোষই উড়িয়ে দেয় না, পঞ্চু এই কলঙ্কের ভার নিজের জামাইবাবুর ওপরই চাপিয়ে দেয়। তারপর বাড়ি ফিরে গুজব উড়িয়ে দিয়ে, ঘরে ঢুকে সে বৌকে প্রবলবেগে আদর করে চুমু খায়। পঞ্চু চরিত্রের লোলুপতা, নৃশংসতা, নয়নতারার কুটিলতা ছাড়াও মায়ার শান্ত নির্যাতিত অবস্থা বা ছবির অসহায়তা অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ গল্পে যৌনতা আতিশয্য সৃজনের প্রেরণা দেয় নি বা যন্ত্রণা উচ্ছ্বসিত হয়ে তারল্যে পর্যবসিত হয় নি। লেখকের এই নির্মম নিরাসক্তি জগদীশ গুপ্তের মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। শ্রীসুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—এ গল্পের "অনতিশয়িত নিষ্ঠুর বাস্তবিকতা আমাদের বাংলা সাহিত্যে অভিনব।"১৮ এই গ্রন্থের 'যখের ধন' গল্পেও লেখকের কৃতিত্ব বজায় আছে। (পরে 'সমাপ্তি' নামে সংকলিত) নাম পরিবর্তন থেকে অনুমান হয়, লেখক সম্ভবতঃ অর্থলোলুপতার বদলে করুণ পরিণামের দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। অর্থপিশাচ তিনকড়ি তার বোন তেনানীর বিয়ে দিল অর্থপিশাচ পশুপতির সঙ্গে। অগ্রিম টাকা না পেলে পশুপতি বৌ-এর কাছে আসতে নারাজ ব'লে, তেনানীকে লোকের বাড়ি কাজ ক'রে টাকা জোগাড় করতে হয়। তিনকড়ি আর এক বোন তিগুণীকে এই পশুপতির সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিল। তেনানী প্রথমে কান্নাকাটি করলেও পরে অন্যত্র কাজ ক'রে বোনের জন্য টাকা জোগাড় করে। তিনকড়ি নিজের মেয়ে বাসনার বিয়ে দিয়েছিল গ্রামের ছেলে ভোলানাথের সঙ্গে। কিন্তু এ জামাইও গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে বাসনাকে তাড়িয়ে দেয়। যথাসময়ে জানা গেল তিগুণী ও বাসনা গর্ভবতী। কিন্তু সন্তানের জন্ম দিয়ে বাসনা এবং পিতলের কলসীতে ঠোক্কর খেয়ে রক্তস্রাব হয়ে তিগুণী মারা যায়। তারপর একদিন তেনানী বাসনার ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। সমগ্র গল্পটি একটু ব্যঙ্গের সুরে বর্ণিত হওয়ায় (যা

মানিকের কথা স্মরণ করায়) তাৎপর্যে গভীর হয়েছে। অন্যদিকে চরিত্র বর্ণনায় ও সংলাপ রচনায় লেখক সত্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। 'জনি ও টনি'র মতো 'পোড়ারমুখী' গল্পেও পশুপ্রীতি প্রধানত আশ্রিত হয়েছে। সন্তানহীন পরিবারে বিড়ালের আবির্ভাবে স্ত্রী প্রথমতঃ বিরক্ত বোধ করলেও পরে তার মধ্যে বাৎসল্যের আধিক্য দেখা যায়। স্বামীকে অগত্যা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিড়ালটি সন্ধান করে নিয়ে আসতে হয়। সেই বিড়ালের বাচ্চা হলে তাকে সে মানুষের সন্তানরূপেই 'খোকন' বলে সম্বোধন করে। সন্তানহীরা নারীর অস্বাভাবিকতা আরও কয়েকটি গল্পের মতো এখানে প্রকাশিত হলেও তার দুঃখ আদৌ তীব্রতায় চিত্রিত হয় নি। শৈলজানন্দের বহু গল্পে সন্তানহীনতা, সন্তানহীনা নারীর গঞ্জনা, দুঃখ, বাৎসল্যের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে 'নন্দিনী' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। জমিদারের বৌ সৌদামিনী, তার মেয়ে মল্লিকাকে সোহাগে আহ্লাদে মানুষ করেও যখন খুশী দেখতে পাওয়ার সাধে গ্রামান্তরে বিখ্যাত কুলীন অথচ গরীব যোগীনের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কিন্তু যোগীনের দাদু অর্থলোভী, যোগীনও তাই। সে যাত্রা করে বলে মল্লিকার দুঃখের অন্ত নেই। মল্লিকার একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ এলে মল্লিকাকে তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় সম্পত্তির লোভে। যোগীন সেখানে গিয়ে একাধিকবার টাকা নিয়ে আসে, গঞ্জনা দেয়। এ নিয়ে মল্লিকা ও তার পিতার দুঃখের অন্ত থাকে না। মল্লিকার ভাই হওয়ায় সংবাদে তাই যোগীনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ে। সে বৌকে কথায় কথায় বলে 'তুমি এক কাজ কর, তার চেয়ে নিয়ে এসো কাল একবার ছেলেটাকে আমার কাছে। দিই টুটি টিপে মেরে। তারপর মরা ছেলেটাকে তেমনি শুইয়ে দিয়ে আসবে ধীরে ধীরে।' আড়ি পেতে কথাটা শুনে মল্লিকার মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এরপর থেকে মল্লিকার মা কন্যা ও জামাতাকে পরম শত্রুভাবেই গণ্য করতে থাকে কিছুতেই নবজাতককে স্পর্শ করতে দেয় না। মল্লিকার উভয়তঃ দুঃখের অন্ত থাকে না। এর কিছুদিন পর যাত্রা করতে গিয়ে কলেরা হয়ে যোগীন মারা যায়। তখন মল্লিকা ফিরে যেতে চায় শ্বশুর বাড়িতে। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে মল্লিকা মন্দিরের রাঁধুনিরূপে নিজের ভাইকে চিনতে পেরে বিচলিত হয়। কিন্তু 'এক মা'র পেটের সন্তান ভাই আর বোন। একজন বড়লোক, একজন গরীব। লোকে ইহা বিশ্বাস করবেই বা কেন? অবরুদ্ধ পরিচয়ের বেদনা নিয়ে মল্লিকা অসাবধানে পায়ের ওপর গরম তরকারি উলটে ফেলে। গল্পটির প্রশংসনীয় দিক এর বর্ণনার চাপা ব্যঙ্গের ধরনটি। দ্বিতীয়ত, চরিত্রচিত্রণ। কিন্তু অতিবিস্তৃত হওয়ায় গল্পটির রসহানি হয়েছে।

শৈলজানন্দের গল্পে দরিদ্রশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমাবধি

লক্ষ্য করা যাবে। অতসীর মা (ধ্বংসপথের যাত্রী এরা), যাত্রাদলের ছেলেরা (আলো আঁধারি), ছবি (নারীমেধ) প্রভৃতি চরিত্রচিত্রণ তার সাক্ষ্য দেয়। 'সত্যমিথ্যা' ('গল্পসঞ্চয়ন) গল্পে এরকম এক ঝি-এর সাক্ষাৎ মেলে—যে অল্প বেতনে কাজ করে, কিঞ্চিৎ বাচাল ও পূর্বাবস্থার স্বচ্ছলতার কথা বলতে চায়। প্রচণ্ড জ্বরে সে অসহায় অবস্থায় মারা যায়। অবশ্য এ গল্পে লেখকের দরদটুকুই দ্রষ্টব্য আর কিছু নয়। জলধর সেন ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প প্রসঙ্গত মনে পড়ে। বরং 'গরীব' গল্পটি সে তুলনায় পরিণত ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। প্রসন্নময়ী আর তার মেয়ে আন্নাকালীর কষ্টে দিন কাটে। দূর সম্পর্কিত বড়লোক আত্মীয়ের বিয়েতে তারা অনাহুত হয়েই যায়; ভাবে শাড়ী যদি নাও মেলে, ভালো খাবার তো মিলবে। কিন্তু বিয়েবাড়ীতে তারা সামান্য স্বীকৃতিটুকুও পেল না, বরং যৌতুকের টাকাটা নায়েব খাজনার দায়ে নিয়ে নিল। তাছাড়া, একটি হারানো সোনার কাঁটার সন্ধানে তাকে মলিন পোশাকের জন্যই চোর সন্দেহ করা হয়, কাপড় টানাটানিতে সংগৃহীত বাসি লুচি বোঁদে ও সন্দেশ ছড়িয়ে যায়। অপমানিত মা, ক্ষুধার্ত মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাবার পথে পুকুরের জল খাইয়ে নেয়। মাঠের মধ্যে শাদা ধুলার ঘূর্ণি দেখে প্রসন্ন নিজের দুরবস্থার কথা ভাবে। এ গল্পে, বিশেষতঃ বিবাহ বাড়ির রন্ধনশালায় লুব্ধ প্রসন্নের ঘোরাঘুরি শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনে সন্তানদল সহ দীনু চক্রবর্তীর আচরণকে মনে করিয়ে দেয়, যেমন সমাপ্তিতে ঘূর্ণির পরিকল্পনা সহজেই 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের সমাপ্তিকে মনে করায়। 'কাঞ্চনমূল্য' গল্পে 'যখের ধন'-এর মতই অর্থ কি ভাবে জটিলতা আনে তা প্রকাশ পেয়েছে। নিস্তারিণী জন্মসূত্রে দরিদ্র না হলেও স্বামীর অকালমৃত্যুতে অন্যের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ নেয়। গৃহকর্তার তার প্রতি দরদের জন্য তার চাকরী যায়। সে আর এক বাড়ি কাজ নেয়। বাড়ির বৃদ্ধকর্তা এই নিস্তারিণীর পুত্রকে সম্পত্তির বড় একটা অংশ লিখে দিলে বৃদ্ধের পুত্র রিভলবার নিয়ে পিতাকে ভয় দেখিয়ে উইল বদলাতে চায়। এদিকে নিস্তারিণীর পুত্রকে গুরুতর আহত করায় তাকে ধরতে পুলিশ আসে। বৃদ্ধপিতা পুত্রকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন না, বরং প্রশ্নের উত্তরে জানান, অর্থই এসব অনর্থের মূলে। বলাবাহুল্য বৃদ্ধকর্তার এই আচরণ রবীন্দ্রনাথের 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'র রামকানাইয়ের আচরণকে স্পষ্ট মনে পড়িয়ে দেয়।

শৈলজানন্দের মধ্যও নিম্নবিত্তজীবন কেন্দ্রিক গল্পগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, শরৎচন্দ্রের বড় গল্পগুলির মতই তিনি এখানে বাংলা সমাজের নির্দিষ্ট জীবন পরিসরের চিত্র রচনায় অবিশ্বস্ত নন। তবে তিনি এই জীবনচিত্রকে ব্যক্তিক পরিসরে সীমিত না রেখে সামাজিক পরিবেশে অন্বিত করতে পারেন নি, যা গল্পকে আরো

গভীরতর বাস্তবতার তাৎপর্যে মণ্ডিত করতে পারত। দ্বিতীয়ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত মধ্য ও নিম্নবিত্ত বাঙালী জীবনের মূল্যবোধে ভাঙাগড়া কম হয় নি। কিন্তু শৈলজানন্দ সেই অভিজ্ঞতার জগতে সংস্পৃষ্ট থাকলেও নির্বিকার। পরবর্তীকালে তিনি জীবনচিত্র রচনা অপেক্ষা নিছক গল্প বলাতেই মন দিয়েছেন। সেখানে মূল্যবোধের কোনো পরিবর্তন যেমন নেই, গল্পের আঙ্গিকেও তেমনি কোনো নূতনত্ব নেই, তাই সচেতন পাঠকের মনে আর জীবনাগ্রহ সঞ্চারিত হয় না।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দের উপন্যাসগুলির মধ্যে "উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ" না দেখতে পেলেও তাঁর ছোটগল্পের প্রশংসাই করেছেন।১৯ শ্রীসুকুমার সেনের মন্তব্যেও একথার সমর্থন মেলে : "শৈলজানন্দের উপন্যাস বা বড় গল্পগুলিতে তাঁহার ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও সৌষ্ঠব নাই।"২০ এই দুই বিদগ্ধ সমালোচকের প্রশংসা সীমিত ক্ষেত্রে অসঙ্গত বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দরিদ্রজীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা' এবং 'লেখবার শক্তি'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, যেকালে নূতন সাহিত্যে 'দাপট' বা জাহিরপনা'য় তিনি ছিলেন যথেষ্ট বিরক্ত। বস্তুত, কল্লোলপর্বের তরুণ লেখকদের মধ্যে অভিজ্ঞতার সংগ্রহে শৈলজানন্দ অনন্য। জীবনকে দেখার নবীন আগ্রহই তাঁকে একদা সাঁওতাল কুলিমজুর বিষয়ে লিখতে প্রবৃত্ত করে। বস্তুত, একথা সত্য যে, "বাঙলা কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দই প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক যাঁর গল্পে এই 'স্থানীয় রঙে'র (Local colour) আবির্ভাব ঘটল।"২১ তবে, আঞ্চলিকতাসৃজনে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা ইতিপূর্বে কয়লাকুঠি বিষয়ক গল্প আলোচনার কালে দেখানো গেছে।

তাঁর গ্রাম্যজীবনকেন্দ্রিক গল্পধারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের বড়ো গল্পগুলিকে। এ গল্পগুলিতে পারিবারিক পরিবেশের রূপায়ণে এবং অব্যর্থ নিখুঁত বর্ণনায় তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসা দাবী করতে পারেন। শরৎচন্দ্রের মতোই তিনি চোখের জলের রূপকার।* তবে মূল্যবোধের গভীরতা সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ। তিনি গল্প বর্ণনায় অনুচ্ছ্বসিত এবং নিরুত্তাপ (যদিও গল্পের দৈর্ঘ্য বিষয়ে তাঁকে সংযমী বলা চলে না)। এইদিক স্মরণ করেই সম্ভবত মোহিতলাল তাঁর 'নিরাসক্তি' বিষয়ে মন্তব্য করেছেন,২২ বা বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—"the most detached writer ever to be born in

* সমকালে Advance পত্রিকার সমালোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণীয় : "Sympathy is the golden word at the touch of which characters may be made human and Sailajananda has it in an ample measure." ('দিনমজুর' গল্পসংগ্রহের শেষে উদ্ধৃত)

Bengal।"২৩ আবার, শৈলজানন্দের রচনার নিরাসক্ত বাস্তবতার প্রশংসা করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত অচ্যুত গোস্বামী এমনকি তাঁকে প্রাকৃতবাদী (Naturalist) আখ্যা দিয়ে বসেন।২৪ কিন্তু, শৈলজানন্দের রচনায় কুসংস্কার ও আদর্শায়ণকে বর্জনের চেষ্টা, বিষয় নির্বাচনে নির্বিচারত্ব, পরিবেশকে যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখানোর দিকে ঝোঁক, চরিত্রগুলির বংশানুক্রমিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রতি গবেষণাগারে পরীক্ষার মনোবৃত্তি, মানুষের সর্ব ইচ্ছার পিছনে এক ভবিতব্যতার কথা নেই—অপরপক্ষে প্রাকৃত-বাদী সাহিত্যের এসব হল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।২৫ অন্যদিকে তাঁর বহু প্রশংসিত 'বাস্তবতা' সম্পর্কে বলা যায় গল্পের উপকরণ 'বাস্তব' জগৎ থেকে গৃহীত হলেও যে-তাৎপর্যে রচনা 'বাস্তব' হয়ে ওঠে অনেকক্ষেত্রেই তার অভাব আছে। তাঁর অভিজ্ঞতার পরিমাণগত বিস্তৃতির অনেক প্রশংসা করা হলেও রচনার গুণগত ন্যূনতার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। আমাদের ভোলা উচিত হবে না যে,—"A writer does not need wide experience so much as deep experience."২৬

পরবর্তীকালে শৈলজানন্দ নিজের সম্পর্কে বলেছেন—"জীবনের সত্যানুসন্ধানের অভিসার যাত্রা আমার এখনও চলছে।"২৭ কিন্তু একথা কতদূর সত্য ? প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে যে কাল-সচেতনতা আমাদের তরুণ সাহিত্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা দেখা যায়, তা কিন্তু শৈলজানন্দে লভ্য নয়। শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঠিকই বলেছেন—"তাঁর অধিকাংশ রচনায় এই আধুনিককাল একরকম অনুপস্থিত। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের এই বাঙালী তরুণ লেখককে তাঁর চারপাশের সমকালীন সমবয়স্ক লেখকদের যুদ্ধোত্তর চেতনাসম্পন্ন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রায় অনবহিত বলে মনে হয়।"২৮ বহু ব্যাপ্ত দেশকালপ্রবাহে তাঁর উদাসীনতার কারণেই তাঁর গল্পধারার "ভেতর থেকে কোনো সুনিশ্চিত জীবন-বাণী প্রায় কখনোই দোলায়িত হয়ে ওঠে না মৃদুতম কম্পনেও।"২৯ এ কারণেই শৈলজানন্দ যোগ্যতার কিছু পরিচয় দিয়ে আধুনিককালের লেখক হলেও যথার্থভাবে আধুনিকতার অধিকারী নন।

।। খ ।।

রবীন্দ্রনাথ শৈলজানন্দের 'লেখবার শক্তি'র প্রশংসা করেছিলেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি দিক অনুধাবন করা যাক। সাধারণভাবে গল্প উপন্যাস রচনার তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে—প্রত্যক্ষ বা মহাকাব্যিক, আত্মজীবনীমূলক এবং প্রামাণিক পদ্ধতি।৩০ শৈলজানন্দের অধিকাংশ গল্পই প্রথম পদ্ধতিতে রচিত। অর্থাৎ লেখক এখানে ঐতি-হাসিকের মত দর্শকদৃষ্টিতে যেন অত্যন্ত সহজ সরল ও স্পষ্টতার মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুই

বলে যান। তবে কিছু কিছু গল্প উত্তমপুরুষের জবানীতে বর্ণিত। সেখানে আত্মজীবনের প্রক্ষেপ থাকলেও থাকতে পারে। প্রামাণিক পদ্ধতি অর্থাৎ চিঠিপত্র বা ডায়েরী আকারে বা 'রিপোর্টাজ' ধরনের রচনার দিকে শৈলজানন্দের প্রবণতা তেমন চোখে পড়ে না। শৈলজানন্দের গল্পশৈলী প্রশংসিত হলেও এই গল্পশৈলী কোন কোন উপাদান সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, কোথায় বা তার প্রশংসনীয়, কোথায় বা তার বর্জনসাপেক্ষ উপাদান সে বিষয়ে অনেক সমালোচকই দৃকপাত করেন নি। প্রথমেই প্রশংসনীয় বর্ণনার কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ—

"পেটগুলা তাহাদের বেহালার মতো ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে, ক্ষুধার জ্বালায় নাড়িতে নাড়িতে পাক ধরিয়াছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা রৌদ্রদগ্ধ কচি পাতার মতো নেতাইয়া পড়িয়াছে।" (ধ্বংসপথের যাত্রী এরা) মাত্র চব্বিশ বৎসরের এক লেখকের পক্ষে সেকালে এরূপ বর্ণনা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শৈলজানন্দ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপাদানের থেকে উপমান সংগ্রহই পছন্দ করেন। ভাবগ্রাহ্য উপাদানকে ব্যবহারের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় অজস্র থাকলেও লেখক সেদিকে উদাসীন। তবে বর্ণনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের রচনাকে সহজেই স্মরণ করিয়ে দেন।

(ক) 'বুড়া অথর্ব গরু যেমন করিয়া গাড়ি টানে এই বাড়িটাও ঠিক তেমনি করিয়া এখনও পর্যন্ত ভাড়া টানিতেছিল।' (ধ্বংসপথের যাত্রী এরা) (খ) 'জীবনে তিনি রোজগার করিয়াছেন যথেষ্ট, কিন্তু আয়ের পাশেই ব্যয়ের যে সুবৃহৎ ছিদ্রটি তিনি নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে সর্বনাশা ফুটা দিয়া তাঁহার বুকের রক্ত দিয়া জমানো টাকাগুলি নিঃশেষে নির্গত হইয়া গিয়াছে।' (জামাতা বাবাজীউ) (গ) 'উত্তরাধিকার-সূত্রে-পাওয়া কৌলিন্যের এই রজত কাঞ্চনটি ভাঙাইয়া তিনি সংসার চালাইতেন।' (আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে) (ঘ) 'কর্মশেষে তাহার ভরা-যৌবনের মাদকতা-ভরা দৃষ্টির ভিতর একটা শান্ত সুন্দর দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।' (কয়লাকুঠি) রবীন্দ্রপ্রভাব এক্ষেত্রে সমালোচ্য নয়, বরং তরুণ লেখকের স্বীকরণ-দক্ষতার পরিচয় এখানে লক্ষণীয়। তাঁর বাকভঙ্গিতে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির পরিচয়ও আছে। যেমন—

(ক) 'খুঁটি সমেত তারগুলা খুলিয়া লইয়াছে, বাতিও আর জ্বলে না,—লোভের ও লাভের সংগ্রাম শেষ হইয়া গেছে ধরিত্রীর বুকটাকে ফোঁপরা করিয়া দিয়া নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীর দল উধাও হইয়াছে।' (নারীমেধ)— কয়লাখনির দুরবস্থার এই বর্ণনা লেখকের সাবালকত্বের পরিচয়বাহী। কল্লোলীয়দের সম্পর্কে দারিদ্র্য ও বীভৎসতার 'আস্ফালন' সংক্রান্ত অভিযোগ থেকে শৈলজানন্দ অনেকাংশে মুক্ত। তবে, গল্পের

প্রয়োজনবোধে নিষ্ঠুরতার বর্ণনায় সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন কয়েক জায়গায়। এক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র উত্তীর্ণ। যেমন—

(খ) 'নারীমেধ' গল্পে অকালজাত ভ্রূণের বর্ণনায়—'উঠিয়া কাছে গিয়া দেখিলেন, বিড়ালের ছানার মত কি একটা জিনিস—শুকাইয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া আছে; সর্বাঙ্গে তাহার পিঁপড়া ধরিয়াছে। জুতা দিয়া একটুখানি নাড়িয়া দিতেই পিঁপড়াগুলা সরিয়া পড়িল। তখন স্পষ্ট দেখা গেল, নিতান্ত খর্বাকৃতি অপরিণত একটি মানব শিশু,—একান্ত অনিচ্ছায় নিতান্ত অবহেলায় হত্যা করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে; চার-পাঁচ মাসের বেশি নয়, ভ্রূণের মধ্যে মুখ চোখ আকার প্রকার তখনও ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই।' (গ) ঐ একই গল্পে প্রসূতি ছবির মৃত্যু-পরিণাম বর্ণনায় বীভৎসতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এই বীভৎস-সৌন্দর্য সত্যই অতুলনীয়। 'কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গার উপর পায়ে ধরিয়া এমনি করিয়া তাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে, যে, অমন সুন্দর লম্বা কালো চুল ইহারই মধ্যে ধূলায় একাকার হইয়া জট পাকাইয়া গেছে, আসন্নপ্রসবা মাতার অনুন্নত সুন্দর শুভ্র দুটি স্তনে তখন দুধ জমিয়া জমিয়া বোঁটা দুইটি কালো হইয়া উঠিতেছিল, সাদা চামড়ার নীচে, মোটা মোটা সবুজ শিরাগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়,— কিন্তু প্রাণহীন নিস্পন্দ সে দেহটার উপরেও অত্যাচার লাঞ্ছনার কোথাও কিছু অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। যন্ত্রনায় ছটফট করিতে করিতে উপুড় হইয়াই হয়ত সে মরিয়াছিল, তেমনি করিয়াই অতখানা পথ ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতে গিয়া মুখ হইতে বুক পর্য্যন্ত ধারালো পাথরের কুচিতে মৃতদেহটাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া দিয়াছে।' এই মৃতদেহটাকে যখন ধ্বসে পড়া খাদের মুখে তুলে ধরা হয়েছে, তখন, তার কালো চুলের গোছা সমেত মাথাটা লুটোচ্ছে, কোমরের কাছটা ভেঙে পড়েছে। তারপর তাকে গভীর খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। এভাবে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়। এখানে লেখকের 'Quietness' যে 'terrible' তা সত্য।৩১ 'জীবন সম্পর্কে এই নিষ্ঠুর নিরাসক্তি'র দিক থেকে জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর তুলনাও অসঙ্গত নয়।৩২ যেমন অসঙ্গত হবে না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ।

দেখা যায়, উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগের দিকে তাঁর ঝোঁক কম। বাংলা বাক্য-গঠনরীতি অনুযায়ী বাক্যে সাধারণতঃ সমাপ্তির দিকেই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় এবং অসমাপিকা ক্রিয়া (স্বতন্ত্র বা যৌগিক ক্রিয়ার প্রথমাংশ হিসাবে) সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বেই বসে থাকে। কিন্তু শৈলজানন্দ এক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াকে বাক্যের বা খণ্ডবাক্যের শেষে বসিয়ে ভিন্নস্বাদ পরিবেশন করেছেন। অবশ্য এ বৈশিষ্ট্য প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের রচনাতেও লভ্য, তবে চলিত ভাষায়। শৈলজানন্দের প্রয়োগ সাধুভাষায়, মানিক বন্দ্যো

পাধ্যায়ের মতো। যেমন—'থাক সে ওই পাড়া-গাঁয়ে টেপির মাকে লইয়া; এখানে সে বেশ ভালই থাকিবে।' (অতি ঘরন্তি না পায় ঘর)

সাধু ভাষায় বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ একটি মৃদু স্বগতোক্তিময় প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহারের দ্বারা বর্ণনা বা বক্তব্যকে আন্দোলিত করে দেবার প্রবণতার দিক দিয়েও শৈলজানন্দ মানিকের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন— (ক) 'কেহ আর বোধকরি জাগিয়া নাই। জাগিয়া থাকিবেই বা কেন? কোলের কাছে ছেলে শোয়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে সকলেই ঘুমাইতেছে। ঘুম নাই শুধু এই হতভাগীর চোখে।' (অতি ঘরন্তি না পায় ঘর) (খ) 'মুখ দিয়ে কথা সরে না, চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া আসে। কি করিবে সে—কি করিবে? জলে ডুবিবে? বিষ খাইবে? (সমাপ্তি) বাক্য ব্যবহারের অন্যান্য বৈচিত্র্য : (ক) কর্তৃপদবর্জিত—'আসিল না।' 'ডাকিলাম, পালিয়া।' (খ) অসমাপিকা ক্রিয়ায় বাক্যসূচনা—'বলিবামাত্র হুজুগ পাইয়া মেয়েগুলো লন্ঠন লইয়া বর দেখিতে ছুটিল।' (গ) সংক্ষিপ্ত বাক্য—'না লাগিবারই কথা।' (ঘ) ক্রিয়াবর্জিত—'পৌষের সন্ধ্যা।' 'সুষমা নীরব।' (ঙ) কর্তৃ ও ক্রিয়াপদের স্থান বিপর্যয়—'কথা বলিতেছিল মালতী।' তাঁর সাধুভাষায় রচিত গল্পগুলিতে তুলনায় দীর্ঘবাক্যরচনার দিকেই প্রবণতা বেশী। চলিতভাষায় রচিত গল্পে কিন্তু তা নয়।

শৈলজানন্দের রচনায় আঞ্চলিকতাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আঞ্চলিকতা রচনায়—কয়লাকুঠির আবহ বর্ণনায়—লেখকের প্রযত্ন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।

পরিবেশগত চিত্র : 'চার নম্বর খাদের শেষ সীমানায় গায়ের দেওয়ালের মধ্যে কয়েকস্থানে তিন নম্বরের আগুন ও ধোঁয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। জায়গাটায় অবিশুদ্ধ গ্যাসও হইয়াছিল যথেষ্ট। কাজেই সে ভয়াবহ স্থানে ফুটা বন্ধ করিবার জন্য ফায়ার ক্লে (আগুন-নিভানো মাটি) ছুঁড়িতে কেহই যাইতে রাজি হইতেছিল না, এবং সেইজন্য কুলি-কামিনদিগকে দ্বিগুণ হাজরির প্রলোভন দেখানো হইয়াছে।' (বলিদান) এরকম বর্ণনা অনেক গল্পে আছে। কয়েকটি গল্পে লেখক প্রসঙ্গটি পাঠকের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিবেচনা ক'রে গল্পের মধ্যে বা কখনও পাদটীকা সংযোজন ক'রে বলে নিয়েছেন। যেমন — 'বিচার' গল্পের পাদটীকায় আছে 'অন-সেটার' প্রসঙ্গে চারের অধিক পংক্তি বিশিষ্ট উল্লেখ, কিংবা 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পে রেজিং রিপোর্ট কি জানিয়েছেন, কিংবা 'আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে' গল্পে ভাদুগান সম্পর্কে প্রায় দশ পংক্তির মত পাদটীকা আছে। এ ছাড়া কয়লাখনি অঞ্চল ও মজুরজীবন সম্পর্কিত অনেক শব্দ ও প্রসঙ্গ পাদ-টীকায় বলে দেওয়া হয়েছে। তবে এ প্রবণতা তরুণ রচনাতেই লভ্য। এরকম কয়েকটি উদাহরণ— (বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে অর্থ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ লেখকেরই দেওয়া)

চাণক (কূপের মত খনির মুখ গহ্বর), হ্যাংগিংকোল (খনির মধ্যে বিপজ্জনক ঝোলা কয়লা), ফিরফিরি (খেলনা), শাঙা (বিবাহ), বোঁয়ানঝোঁপ (আঞ্চলিক উদ্ভিদ বিশেষ), আড়কাঠি (চা বাগানে যে ব্যক্তি ভুলিয়ে কুলি-কামিন পাঠায়), শিয়াড়ি পাতার ছাতি (এক ধরনের বড় বড় পাতা যা দিয়ে সাঁওতালরা ছাতা বানায়। বর্ষার প্রাক্‌কালে ছুটি নিয়ে দল বেঁধে এই পাতা নিয়ে আসে জঙ্গল থেকে), বোঙা (সাঁওতাল দেবতা) কুঁকুড়ি (মোরগ), ধাওড়া (সাঁওতাল কুলিদের কুঁড়ে বা বস্তি), সি-পি (সদার জাতীয় লোক), সিঙ্গারণ নদী (আঞ্চলিক উপনদী), সিংচাঁদো (সূর্য), দামুন্দর (দামোদর নদ), মারাংবুরু (প্রকাণ্ড পর্বত), বিন্তি (মন্ত্র), পিলার কাটিং (খনির অভ্যন্তরে এক একটা জায়গা পিলারের মত রেখে চারধার থেকে কয়লা কেটে নেওয়া), কাঁথি, গোফ (খনি অভ্যন্তরে স্থান বিশেষ)।

সংলাপের মধ্যেও এ ধরনের অনেক আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। (সংলাপ প্রসঙ্গে উল্লিখিত) আঞ্চলিক পরিবেশ রচনায় নিবিড়তা আনার প্রবণতা থেকেই শৈলজানন্দ তাঁর গল্পে পাত্রপাত্রীর মুখে গান ব্যবহার করেছেন। এদিক থেকে তিনি তারাশঙ্করের সঙ্গে তুলনীয়। শৈলজানন্দের রচনায় শুধু বাংলা নয়, সাঁওতালি গানও ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের চরিত্রের ভাবপ্রকাশে এ গানগুলির কিছুটা ভূমিকা আছে। নীচে কিছু গানের প্রথম পংক্তির উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে—

বাংলা গান— (ক) কোন সাঁজে তুই গেছিস চ'লে আমার পিয়ারী। (খ) বান এলো, বরষা এলো, ভেসে এলো পই পাতা। (গ) তুমি এসেছ কি এসো নাই। (ঘ) নদীতে পড়েছে বান্‌ পার কর ভগবান্‌। (ঙ) হাওয়া-গাড়ী টম্‌-টম্‌ বাবুর বাগানে। (চ) বাবা ভোলা ভোলানাথ। (ছ) মাদল বাজা লো, বাদল নামে। (জ) কি করব, কোথা যাব, মরণ কেনে হলো নাই। (ঝ) সে এলে মারবো কুঁকড়ি গো। (ঞ) বনের মাথায় সোনার আলো।

সাঁওতালি গান— (ক) দে পেড়া দেলা পেড়া দে দুড়ুপ পে। (খ) সাঙ্গিং দিসম্‌ পচা, সঙ্গে বরিয়াৎ। (গ) দোড়ু মে তাড়াম্‌ তাড়াম্‌ মোড়ল ঘাটরে বাবু। (ঘ) গাতে গাতে লাং তাহে কানা। (ঙ) পানি বর্ষা ঝিপির ঝিপির।

বৈচিত্র্যময় গল্পের সার্থকতা সৃজনে সংলাপরচনার বৈচিত্র্য খুবই সহায়ক এবং অপরিহার্য। শৈলজানন্দ সংলাপ রচনায় তাঁর অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন। কয়লাখনির মজুর থেকে সহরবাসী শিক্ষিত, সাহেব থেকে সাঁওতাল, নানান শ্রেণীর মানুষের সংলাপ তাঁর গল্পে আছে।

(ক ইংরেজী মিশ্রিত সংলাপ—'Well, ম্যানেজারবাবু, একটা Question আমি আপনাকে রোজ করব ভাবি, but I forget altogether.

(খ) হিন্দী—উহি মোকান্‌কা বাঙালী লউণ্ডা হোগা—

(গ) নিম্নমধ্যবিত্ত-গ্রাম্যতাময় প্রৌঢ় (আঞ্চলিক শব্দ ও ভঙ্গিসমৃদ্ধ)—আমি চিরকাল এই ছোঁড়াটাকে বলে এসেছি, বলি, যাসনে হতভাগাটা, বাপের ব্যামো থাকলে মেয়ের থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু ও বেটা শুনলে না, মা-মরা বাছুরের মতো কঁদে ছুটল। (ঘ) আছে কিছু তোমার কাছে ? না, সেদিক দিকে নমস্পটুং ? (ঙ) না মা না, তোমরা সব দুচুচ্‌কোর দল তোমরা চুপ কর। (চ) দিষ্টি-কেপ্পণ সে মিনসেকে আমি চিনি না। (ছ) পেঙ্গা-কান্না কেঁদে কেঁদে শাশুড়ীর নামে লাগাবে তা আমি জানি। (ঘ, ঙ, চ, ছ-তে শব্দ বিশেষের ব্যবহার লক্ষণীয়) (জ) গ্রাম্যমহিলার ছড়াযুক্ত সংলাপ--যে মুখে বল তুমি দরিদ্দ বাম্ভণী, আবার সেই মুখেই বল তুমি চ্যাংমুড়ী কানি।

কোন্দলপরায়ণ, কুটিল ও নিগ্রহপরায়ণ গ্রাম্য প্রৌঢ়ার চরিত্র-চিত্রণে তথা সংলাপ রচনায় শৈলজানন্দ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে আদিবাসী ভাষা ব্যবহারে ও সংলাপে তাঁর কয়লাখনির গল্প পরিবেশানুগ হয়েছে। যেমন—

(ক) 'কি বিশ্বাস উ ইঁচড় পাকা ছেলেকে—দিবেক হয় তো হোই ডিল্লি পর্যন্ত ছুঁটোই। লে তখন, মর্ শালা তুঁই, বাঁধ মুড়ি চিড়া—' (খ) 'বন্দ্ চলা কানা টুইলা ? (অর্থাৎ, যাবি কোথা টুইলা ?) (গ) তুর্ লেহর্ করব কিসকে ? (লেহর—খোসামোদ) (ঘ) ও কারিন্ তুহিন কানা ? (তুই কোথায় থাকিস্ রে ? (ঙ) হুজুমে হো। (এখানে আয়) (চ) ওকাতেম চালাঃ আ ? (যাস কোথা ?) (ছ) আপে দো তুমদা ঃ রূইপে আর তিরিও অরংপে। (তোরা মাদল আর বাঁশী বাজা।) (জ) নি বাবা, হড়ইং সম্প্রতাপে কানা। (নাও বাবা, বধূকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি)। (ঝ) অত লারিগা তোমার সঙ্গে বক্‌তে। চেঁদড়-কলা করছ কেনে। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এই সংলাপ ব্যবহার কোনো 'আস্ফালন' প্রকাশ করতে আসেনি, বরং গল্পের ক্ষেত্রে এই সব সংলাপ অপরিহার্যতার পথ বেয়েই এসেছে। তবে, তারাশঙ্কর আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ রচনায় সংলাপে ভাবগভীরতা, নাটকীয়তা এবং অনেক জায়গায় চরিত্র সম্পর্কে ধারণা-সৃষ্টির সুন্দর সদ্ব্যবহার করেছেন। অপরপক্ষে শৈলজানন্দের সংলাপ নাটকীয়তাবর্জিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাব-গভীর নয়, যদিও চরিত্রানুগ ও মৃত্তিকাগন্ধী হয়েছে। তবে পরবর্তীকালের রচনায় লেখক একেবারেই বৈচিত্র্যবিমুখ।

শৈলজানন্দের গল্পের দৈর্ঘ্য অনেকক্ষেত্রেই যথেষ্ট। এই দৈর্ঘ্য বহুক্ষেত্রেই ছোটগল্প হিসাবে অপরিহার্য নয়। এছাড়া সূচনা ও সমাপ্তি বিচারে বলা যায়, তাঁর গল্পে ছোটগল্পত্ব অপেক্ষা 'টেল' জাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য অধিক। ছোটগল্পের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য—Subtle comment on human nature, কিংবা Compression by suggestion and implication৩৩ অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষা ক'রে লেখক সাদামাটা বর্ণনার দিকে ঝুঁকেছেন। এতে ছোটগল্পত্ব হানি হয়েছে। যে সব গল্পে বিষয়বস্তু বাস্তব এবং বিষয় ও বর্ণনা পরস্পর উপযোগী ও সংযত তার কয়েকটি হল—মরণবরণ, বলিদান (কয়লাখনি বিষয়ক) এবং নারীমেধ, যখের ধন (মধ্য ও নিম্নবিত্ত জীবন কেন্দ্রিক)। শৈলজানন্দের বাস্তবচেতনা সম্পর্কে যতই প্রশংসা করা হোক, তাঁকে এমনকি মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করা হোক, তাঁর মধ্যে 'বাস্তববোধের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক চেতনাও বেশ আছে।৩৪ মূলত সরল, আবেগধর্মী লেখক হিসাবে বুদ্ধি, বিচার, পটভূমি-সচেতনতা অপেক্ষা কতকটা শরৎচন্দ্রের মতো চোখের জলকেই তিনি প্রধান প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন। এখানেই তাঁর আন্তরিকতা, এখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা। একারণেই তাঁর তরুণ সতীর্থদের সঙ্গে লেখা শুরু করেও শৈলজানন্দ অনেকের আগেই পাঠকের মন থেকে আগ্রহের আসনটি হারিয়ে ফেলেন।

১। কল্লোল যুগ : পৃঃ ২১২ ২। কল্লোল যুগ : পৃঃ ২৫৫ ৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ৩৩০ ৪। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার : ভূদেব চৌধুরী, পৃঃ ৪৮৪ ৫। ঐ, পৃঃ ৪৮৭ ৬। কল্লোল যুগ : পৃঃ ২৮ ৭। গল্প লেখার গল্প, পৃঃ ৫৫ ৮। বাংলা উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৩০৫ ৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ), পৃঃ ৩৩০ ১০। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার : পৃঃ ৪৯৭ ১১। ঐ, পৃঃ ৪৯৩ ১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), পৃঃ ৩৩১ ১৩। সাহিত্য কোষ (কথাসাহিত্য) : অলোক রায় সম্পাদিত, পৃঃ ৬ ১৪। The Reader's Companion to World Literature, Ed. by Lillian Herlands Hornstein, 1942 ed. Pg. 184. ১৫। Germinal (Penguin

edition, 1958) Introduction by L. W. Tancock Pg. 6. ১৬। লেখকের কথা, পৃঃ ৩০ ১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ) : পৃঃ ৩৩২ ১৮। ঐ, পৃঃ ৩৩২ ১৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৬৪৮ ২০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ), পৃঃ ৩৩১ ২১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৯৬ ২২। 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থে 'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধ ২৩। An Acre of Green Grass, Pg. 74. ২৪। বাংলা উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৩০২ ২৫। The Reader's Companion to World Literature, Pg. 310. ২৬। Some Principles of Fiction : Robert Liddell, Pg. 22. ২৭। আমার সাহিত্য, দেশ, ১৪ই পৌষ ১৩৫৮ ২৮। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলাসাহিত্য, পৃঃ ৩০৩ ২৯। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃ: ৪৯৯ ৩০। Novelists on the Novel—Ed. by Miriam Allott, Pg. 258-59. ৩১। An Acre of Green Grass, Pg. 77. ৩২। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩০৩ ৩৩। The short story : Sean O' Faolain, Pg. 139. ৩৪। শরৎচন্দ্র ও তারপর : কাজী আবদুল ওদুদ, পৃ: ১৩১

—●—

অষ্টম অধ্যায় : যুবনাশ্বের ছোটগল্প

॥ ক ॥

তেজী ঘোড়ার মতোই টগ্‌বগিয়ে কল্লোলযুগের সাহিত্যে এসেছিলেন যুবনাশ্ব। এঁর গল্পের সংখ্যা অল্প, কিন্তু গল্প কবিতা মিলিয়ে তিনি সহজেই চোখে পড়েন। যুবক বয়সের 'পটলডাঙার পাঁচালী' বই হ'য়ে বেরোয় অনেক বছর পরে, প্রৌঢ় বয়সে লেখেন 'কনখল' (উপন্যাস) ও 'মান্ধাতার বাবার আমল' (আত্মস্মৃতি আশ্রিত) তবে জনপ্রিয় নয়। বরং কবিতার ধারাবাহিকতা বহুকাল লক্ষ্য করা যায়। আর স্মরণীয়, কবিতায় তিনি মণীশ ঘটক এবং গল্পে যুবনাশ্ব।

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে মণীশ ঘটকের যে পরিচয় পাই তা হল—"মণীশ দুর্ধর্ষ, উদ্দাম", "নির্বারিত", 'ছ-ফুটের বেশি লম্বা, প্রস্থে কিছুটা দুঃস্থ হলেও বলশালিতার দীপ্তি আছে তার চেহারায়।" তিনি তাঁর মধ্যে দেখেছেন—"জোয়ান ঘোড়া"র উদ্দামতা আর লেখায় অনুভব করেছেন—"উদ্দীপ্ত সবলতা।"১ বুদ্ধদেব বলেছেন—"তাঁর জিহ্বা সচল ও তীক্ষ্ণ, বারেন্দ্রভূমিসুলভ ঝকমকে রসিকতা তাঁর মুখ থেকে সহজে ছড়িয়ে পড়ে—।"২ একালের অবক্ষয়প্রিয় যুবকের চোখে—তাঁর "শান্তিপুরী ধুতির কোঁচা রাস্তায় লুটোচ্ছে, পায়ে গ্লেসকিট, হাতে নতুন বাঁকা বাঁটের ছাতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী আজানুলম্বিত। চওড়া কব্জিতে সোনার ঘড়ি, মুঠোয় দামী পেলমেল সিগারেটের প্যাকেট।" যিনি কলেজস্ট্রীটে এক বই দোকানের সিঁড়িতে হঠাৎ বসে প'ড়ে ব্র্যাণ্ডির শিশি ও রেসের বই বার করেন।৩ অন্যদিকে প্রগতিপন্থীযুবকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। "ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁকে সোচ্চার দেখা গেছে সামাজ্যবাদী আগ্রাসন ও উগ্রজাতি দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে, বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির স্বপক্ষে, ভারত ও চীনের কোটি কোটি জনগণের মৈত্রীর স্বপক্ষে।"৪

বন্ধুদের মধ্যে অচিন্ত্য ও মণীশ দুজনেরই আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। মণীশের পিতা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯২৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত আয়কর বিভাগে মণীশের কর্মজীবন। এই কৃতী ও সুস্থির পরিবেশে আবাল্য লালিত হয়েও, মণীশের মধ্যে আছে এক প্রবল অস্থিরতা—যার তাড়নায় তিনি কখনও কখনও প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ করে বসেন।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—"উনিশ-শো তিরিশের দশকে মণীশ ঘটকের ছোটগল্প বাংলাদেশে আলোড়ন তুলেছিলো।" কিন্তু কেন ? প্রথমতঃ, বলা যায় বিষয় নির্বাচনের

জন্য। মণীশের অধিকাংশ গল্পের বিষয়ই ছিল ভিন্ন ধরণের। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ভাষায়—"এ একেবারে একটা নতুন সংসার, অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা। কাণা, খোঁড়া, ভিক্ষুক, গুণ্ডা, চোর আর পকেটমারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা।"৫ এদের প্রতি সহানুভূতি যেমন সুপ্রকাশিত, তেমনি কয়েকটি গল্পে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের আচার আচরণের বিকৃতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিকৃতজীবনের এই স্বরূপ উদ্ঘাটন (যার অন্তরালে রয়েছে মানবিকতায় বিশ্বাসের বিপন্নতার বেদনা) সেকালে অনেকেই সহ্য করতে পারেন নি। "তাঁর বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির খড়্গ উদ্যত হয়েছে মাঝে মাঝে, কিন্তু তিনি স্বখাত বর্জন করেন নি।"৬ দ্বিতীয়তঃ, গল্পের বাকরীতি, বিশেষতঃ সংলাপ ও বর্ণনায় শক্তিমত্তার প্রকাশ তার পক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যের রাজপথ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করা এই লেখক যে আমাদের জন্য অনেক বিস্ময় নিয়ে এসেছিলেন, সেকথা তাঁর লেখা পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়।

কল্লোল কালিকলম প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশের আগে যুবনাশ্বের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত ঢাকার হাতে লেখা 'ফসল' পত্রিকায়। কল্লোলে তাঁর একাধিক কবিতা ছাড়া-ও প্রায় নটি গল্প প্রকাশিত হয়, দু-একটি প্রবন্ধও বেরিয়েছিল জানা যায়। 'প্রগতি' পত্রিকায় তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত লেখক, 'কবিতা'র পরিচালনাতেও তিনি বুদ্ধদেব বসুকে সাহায্য করেছেন লেখা দিয়ে এবং গ্রাহক সংগ্রহ করে দিয়ে। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'শিলালিপি' কবিতাভবন থেকেই বেরিয়েছিল। এছাড়া অপেক্ষাকৃত অপরিচিত 'বিষাণ' পত্রিকায় 'বৈঠকী' শিরোনামায় ধারাবাহিক গদ্যরচনা, নাচঘর, পরিচয়, প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকায় কবিতা রচনা এবং 'প্রবাসী'তে নিয়মিত সাহিত্য সমালোচনা করেছেন। বহরমপুর থেকে 'কার্তিক' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন তিনি আমৃত্যু সম্পাদনা করে গেছেন। একই সঙ্গে গদ্য ও কবিতা রচনা, বিদ্রোহী ও রক্ষণশীল পত্রিকায় অংশ গ্রহণ প্রভৃতি দিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর মিল আছে।

এ পর্যন্ত তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ 'পটলডাঙার পাঁচালী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, যদিও গল্পগুলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ত্রিশ বছর আগে। এছাড়া-ও আরো কতক-গুলি গল্প পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে।

"পটলডাঙার পাঁচালী" 'নাটিকা' হিসাবে প্রকাশিত হয়। সংলাপের প্রাধান্য থাকলেও অন্যান্য নাটকত্ব নেই। এই গল্পচিত্রে পটলডাঙার কাল্পনিক পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এটি এক ভিখিরী পাড়া। সারি সারি কুঁড়ে ঘরের আবহাওয়া নোংরা, বাসিন্দারাও তাই। কেউ অন্য জায়গা থেকে নানা হাত ঘুরতে ঘুরতে এসেছে,

কেউ আছে জন্মসূত্রে। সকালবেলায় এরা বেরিয়ে পড়ে রোজগারের ধান্দায়। নেত্রীর ভূমিকা দাপটের সঙ্গে পালন করে খেঁদি। এরা যেমন পরস্পরে গালিগালাজ ও মারামারি করে, তেমনি কখনও কেউ কাউকে সহানুভূতি দেখায়। যুবনাশ্বের ঝোঁক ক্লেদাক্ত পরিবেশ রচনায়—তাই বীভৎস ফকুরের তাড়ির গন্ধ, কলাপাতা থেকে সদির ভাত তরকারী চাটা, গুবরের কোমরের ঘা তড়পানো, বেশী খেয়ে বমি করে ঘর ভাসানো এই গল্পে এসেছে। গল্প হিসাবে নয়, এর মূল্য অভিজ্ঞত'র সম্প্রসারণে, বিশ্বস্ত রূপায়ণের সামথ্যে। শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় ঠিকই বলেছেন—"এমন মমর্ন্তুদ ছবি যুবনাশ্বের আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ লেখেন নি।"৭ 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিতগল্প—'গোষ্পদ' (পৌষ, ১৩৩১)। এ হল পটলডাঙার ভিখিরীদলের নেত্রী খেঁদির 'একটি ক্ষণকালিক সদিচ্ছার কাহিনী।' রবিবারের দুপুরে 'ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর ধ্বংসপথের যাত্রী ভিখিরীর দল দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এদের দলের মধ্যে ঢুকে বাইরের কারুর রোজগার করার উপায় নেই। রাস্তায় তাদের দলে একটি নতুন মেয়েকে দেখে খেঁদি তাকে একপাশে এনে তার পরিচয় নিতে গিয়ে দেখে সে ভদ্রঘরের মেয়ে। তখন ক্ষ্যান্তর ওপর দলের দায়িত্ব দিয়ে সে মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। খালি কাঁদতে থাকা মেয়েটির কাছ থেকে জানা গেল, সে ছিল পাড়া-গাঁর গৃহস্থ বউ, পরপুরুষ তাকে কালিঘাট দেখাতে এনে নেবুতলার এক বেশ্যা বাড়িতে আনে ও গয়নাগাটি টাকাকড়ি নিয়ে পালায়। একদিন তার ঘরে দুটো মাতাল ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে। মন ও শরীরের অসহ্য যন্ত্রনায় সে তখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কয়েকবাড়ি আশ্রয়ের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়ে শেষে এই দলে ভিড়ে যায়। এ কাহিনী শুনে খেঁদির মত মেয়ের মনেও সাময়িক সহানুভূতি দেখা দেয়, তাকে দলে ভর্ত্তি করে নেয়, তার নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। গরীবের মেয়ের প্রবঞ্চনায় লেখকের মমতা স্পষ্ট। হয়ত, এই নির্মম পৃথিবীতে ভিখারিণীর (খেঁদি) মনেও যে অতিসীমিত পরিসরে সহানুভূতি জেগেছে—'গোষ্পদ' নামের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পের পাত্র-পাত্রী এবং পটভূমি একই। ক্ষ্যান্তর ভাইপো বলে পরিচিত চঞ্চু ছিল দলের 'বদমাইস, হৃদয়হীন জানোয়ার'দের সেরা। এই চঞ্চু একদিন 'রোগা ও বোবা' এক মেয়ের এনে দলে ভর্ত্তি করার সুপারিশ করলে সবাই অবাক হয়। মেয়েটা দলে আসার পর, চঞ্চুর ফুর্তি ও পথে বেরুনো কমেছে। একদিন দলের পটলা রাস্তার একটা মেয়ের হাতের বালা ছিনিয়ে নিতে গেলে চঞ্চু তাকে দুটো চড় মারে। এতে দলের সবাই তার ওপর রেগে যায়। প্রশ্নের উত্তরে চঞ্চু বলে, শিয়ালদায় মেয়েটা ভিক্ষে করছিল, সেখান থেকে তুলে এনে নিজেকে ভাই পরিচয় দিয়ে নিয়ে আসে। রতন একটা কুৎসিত রসিকতা করতেই চঞ্চু তার ঘাড়ে লাফ দিয়ে প'ড়ে তাকে দু-হাতে কীল চড়

মরতে থাকে। এতে দলের নেত্রী খেঁদি রেগে যায়। তার আদেশ, মেয়েটাকে যেখান থেকে আনা হয়েছিল, সেখানেই ছেড়ে আসতে হবে, নইলে তাকেও দল ছাড়তে হবে। নিঃশব্দে চঞ্চু মেয়েটার হাত ধরে ঘরে যায় ও ভোরে আস্তানা ছাড়ে এতে রতনের টিপ্পনী : "শক্ত একটা কিছু বেঁধেচে বাবা। নইলে চঞ্চুর মতো স্যায়না ঘাগী—।" রতনের বোঝায় ভুল নাই, প্রেমের স্পর্শেই চঞ্চুর মতো ঘাগী ও বদলে গেছে। শেষ পর্যন্ত প্রেমিকাকে—হোক সে 'বোবা'—নিয়ে সে আস্তানা ছেড়েছে। প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা এ গল্পে কায়ারূপ লাভ করেছে। 'কালনেমি' গল্পের পরিবেশ একই। অবস্থার বিপাকে এসে পড়া একটি দরিদ্র পরিবার কিভাবে তাদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে আর দুটো অপমানুষে পরিণত হল তারই গল্প। জোয়ান মরদ ডাকুর পা ট্রেনে কাটা যায়। বেঁচে থাকার পথ না পেয়ে সে পটলডাঙার ভিখিরীপাড়ায় স্থান নেয়। তাদের জায়গা দিতে আপত্তি নেই, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বজায় রেখে গৃহস্থভাব রাখায় বাসিন্দাদের আপত্তি। ভোরে ডাকুকে মোড়ে বসিয়ে দেওয়া হয় ভিক্ষের জন্য, ওর বৌ ময়না যায় দলের সাথে। একদিন রতনা অনেকের সামনেই সন্ধেবেলা ময়নাকে জড়িয়ে ধরলে সে ঘুসি মেরে রক্ত বার করে দেয়। ময়নার যখন ছেলে হল, তখন স্বামী-স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে লাগল, রোজগারে বেরুনো ছেড়ে দিল। কিন্তু দলে এটা বেমানান। "সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাপ-মা, কোনো সম্পর্কেরই অস্তিত্ব ছিল না। ... সব শিশুদের ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হত, দেখবার শোনবার কেউ থাকত না। ... যারা হঠাৎ বেঁচে যেত তারা আর দশজনের মতোই বন্ধনহীনভাবে বেড়ে উঠত। .... মেয়েগুলোকে বয়স হওয়ামাত্র নেবুতলার মতন সব জায়গায় চালান করা হ'ত। ছেলেগুলো পকেট কাটা থেকে হাতে খড়ি পেত।" এমন জায়গায় ময়না ও ডাকুর গার্হস্থ্য জীবনযাপনের সাধ সকলেরই খারাপ লাগল। খেঁদি একদিন ময়নাকে এ নিয়ে গালিগালাজ করল। তারপর এক সন্ধ্যায় ময়নাকে একা পেয়ে নেশাগ্রস্ত রতন আরো দুজনের সহযোগিতায় তাদের "পশু-লালসা" মেটালো। খেঁদি রতনের দলের একাজকে সমর্থনই করল, কারণ সে-ও চায়, ওদের 'ভদ্দর লোকি' ভাঙুক। (হয়তো আমাদের তথাকথিত ভদ্রলোকত্ব এখানে লেখকের সমালোচ্য।) ময়নার পঙ্গুস্বামী বলে— "তা হোক গে, থাকতেই হবে যকন হেতায়, তকন কি হবে ঘাটিয়ে। (ডাকুর এই সংলাপ আকস্মিক) লালসা কিভাবে মানুষের বিবেক ও সাধারণ কর্তব্য-বোধকে ছাপিয়ে অভব্যভাবে বেড়ে ওঠে তার পরিচয় কোনো কোনো সতীর্থের মতো যুবনাশ্বের এ গল্পে মেলে। সদ্যধর্ষিতা স্ত্রীর সামনে ডাকুর 'মুখে মরমীর দরদের ছাপ' এর বদলে 'মত্ত পশুর ভুখের জ্বালা' কোলে টানতে চাওয়া আরোপিত মনে হয়। এখন তাহলে অক্ষম স্বামীর শরণ নিরর্থক জেনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে সমর্থ রতনার কাছে চলে যায়। ডাকু

তখনও বলছে—দোহাই তোর, একটিবার আসিস রেতে"—অক্ষম লালসার প্রকাশ হিসাবে যা পাঠকের মনকে ঘৃণায় ভরিয়ে তোলে। 'রাতবিরেতে' গল্পে আসে এই পটলডাঙা জীবনের আরেক বিকৃত রূপ। রাতের অন্ধকারে হাসপাতাল থেকে ছেলে বিক্রির কদর্য ব্যবসা চলে। হাসপাতালের আয়া সুখিয়া ঝুমন সর্দারকে সদ্যোজাত ছেলেমেয়ে বিক্রি করে দেয়। এসব ছেলেমেয়েদের বড়ো করে তারা ব্যবসায় লাগায়, না হয় বিক্রি করে। গল্পে পাই, সুখিয়া ঝুমনকে পনের টাকায় দুটি শিশু বিক্রি করে। আর, হাসপাতালের নার্স দু'টি ফিরিঙ্গি যুবকের সঙ্গে ফিটনে ওঠে, নেশার মজা লোটার ও পয়সা রোজগারের জন্য। ঝুমন সর্দার বাচ্ছা দুটোকে নিয়ে শহর প্রান্তে খালের ধারে পটলডাঙার নেত্রীর কাছে নিয়ে যায়। রাত ফরসা হয়ে আসে, রাস্তায় ময়লা ফেলা এক্কা চলতে থাকে আর বাচ্চা দুটো ওঞা-ওঞা করে কাঁদতে থাকে। এ রচনাটিকে ঠিক গল্প না ব'লে নৈশ কলকাতার বিকৃত জীবনখণ্ডের একটি রেখাচিত্র বলা চলে। 'ভুখা ভগবান'-এর পটভূমি গ্রামের দরিদ্র মুসলমান চাষীর জীবন। খাজনার দায়ে জমিদারের পেয়াদা কালুসেখকে ধরে নিয়ে গেলে তার বৌ ফতিমা রাত্রে দাওয়ায় ব'সে ভাগ্যের কথা ভাবছে। এমন সময় স-ইয়ার জমিদার পুত্রের পশু শক্তির কাছে "অনাহারী, স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থিরচিত্ত, কাহিল মেয়েটির সমস্ত বাধা ও আপত্তি রক্তমাংসের ক্ষিদের আগুনের মুখে নেহাৎ খড়কুটোর মতো পুড়ে ছাই হয়ে" যায়। অনেক রাতে প্রহৃত, ক্লান্ত কালু ফিরে ঝাঁপ খোলা ঘরে ফতিমাকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন এবং দরজার গোড়ায় পাঁচ-টাকার নোট দেখে বিস্মিত হয়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ফতিমা কাঁদতে থাকে। কালু কিন্তু বৌ এর দুর্গতির কথা তখনো বুঝতে পারেনি। সে নোট পেয়ে পেটের ভাবনার সাময়িক মুক্তির কথা ভাবে। কিন্তু তার ঘরে নোট কি করে এল সেকথা ভাবে না। এদিকে নোট দেখে ফতিমার মুখ ফ্যাকাশে হয়, সে কাঁদতে থাকে। কালু সব শুনে দা হাতে প্রতিকার করতে ছুটে যায়। সে বোঝে : "দীন-দুঃখীর মা বাপ নেই যে মুলুকে, সেথা হাতের জোরই জোর।" বৌ-এর নিষেধে কালু রাতে বেরোয় না। ভোর বেলা কালু পানা পুকুরে ফতিমার মৃতদেহ ভাসতে দেখে। মৃতদেহ তুলে নিয়ে এসে সে দাওয়ায় রাখে। সে তখন অবসন্ন, শোকাহত, ক্ষুধার্ত। কিন্তু এরপর যুবনাশ্ব কালুর বিক্ষোভ দেখান না, আচরণে তাকে অমানুষ করে তোলেন। কারণ, কালু তখন সেই নোটটা তুলে নিয়ে খাবারের দোকানের উদ্দেশে ছোটে। পাঠকমনে, এই সমাপ্তি স্বভাবতঃই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গল্পনামের মধ্যে যে বিদ্রোহাত্মক ইঙ্গিত নিহিত তা গল্পে কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এই অস্বস্তিকর সমাপ্তি 'কালনেমি' গল্পেও। ডাকুর সঙ্গে কালুর মিল—বিবেকহীনতায়। কল্লোলীয়দের ধূলিমলিন জীবনচিত্রে বিবেকবান মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত

কম। যুবনাশ্বের এই সব গল্প সেই ধারারই অনুসারী। 'মন্থশেষ' গল্পে মন্থন শেষে প্রাপ্ত অমৃত অর্থাৎ মানুষের সততা ও বাৎসল্য প্রাধান্য পেয়েছে। 'রাত বিরেতে'র মতো এ-টি ও ছেলে চুরির কাহিনী। একটা বাচ্চার গলার হার খুলে নেবার সময় পুলিশ দেখে বিন্দি ছেলেটাকে নিয়েই আস্তানার দিকে ছুট দেয়। দলনেত্রীর সঙ্গে হারের বখরা ঠিক হয় দশআনা ছ আনা। দলের মধ্যে ফুটফুটে ছেলেটা অনেক রুক্ষ বুকে স্নেহের সঞ্চার করে। এদিকে পুলিশের ভয়ে খেঁদি ও বাঞ্ছা ঠিক করে ছেলেটাকে মাঝরাতে খাল পার ক'রে রেখে আসবে। ছেলে ঘরে এনে বিন্দী বিচলিত। পেটের ও শরীরের ক্ষিদে মেটানোর পথ সে জানে, কিন্তু বাৎসল্যের ক্ষিদে তাকে অস্থির ক'রে তোলে। ছেলেটাকে বুকে চেপে সে উপুড় হয়ে থাকে, খদ্দেররা ফিরে যায়। তার আশঙ্কা দল হয়তো এমন সুন্দর ছেলেটাকে বেচে দেবে না হয় হাত পা খোঁড়া ক'রে রোজগেরে ক'রে তুলবে। ছেলেটার কথাবার্তা শুনে বাড়ী কোথায় হতে পারে অনুমান ক'রে গভীর রাতে সে ছেলেটাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যায়। কিন্তু সে ধরা পড়ে। হার চুরির দায়ে তাকে জেলে দেওয়া হয়। অবরুদ্ধ মাতৃত্বের জাগরণের গল্প হিসাবে এটি সুন্দর হয়েছে। সমাপ্তিতে বিন্দীর প্রতি বাঞ্ছার তীব্র শ্লেষে গল্পটি করুণ সৌন্দর্য লাভ করেছে। 'দুর্যোগ' গল্পের বিষয়, মধ্যবিত্ত-জীবনের বিকার। দোতলা স্টিমার যখন ঝড়ে উথাল পাতাল তখন গল্পের বক্তাকে এক মহিলা তার স্বামী অবিনাশবাবুর খোঁজ করতে অনুরোধ করলেন। অনেক সন্ধানের পর শুঁটকী মাছের একাধিক চ্যাঙারীর আড়াল থেকে অবিনাশবাবুকে (কল্লোলকালের সুপরিচিত এই নায়ক) আবিষ্কার করা গেল। তিনি একটি অর্ধনগ্ন জোয়ান কুলীমেয়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। এই অবিনাশবাবু কিন্তু স্ত্রীর ডাকার কথা শুনে বক্তার ওপরেই চটে ওঠেন। অবশ্য বক্তার ধমকে তার সুর নরম হয়। কিন্তু ওর আপত্তি স্ত্রী কেন পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলল। অথচ তিনি যা করছিলেন সেটা একবারও গর্হিত মনে হল না। অবিনাশবাবু "ডবকা বয়স" দেখে লোভ সামলাতে না পেরে দ্বিতীয়পক্ষে এই বিয়ে করেছেন—এসব লালসা, নীচতার কথায় বক্তার রাগ বাড়ছিল। বারবার স্ত্রীর ওই কথাবলা নিয়ে কদর্য ইঙ্গিত করতে থাকায়, বক্তা তার নাকে ঘুসি মারতে উদ্যত হলেন কিন্তু স্ত্রীর আগমনে নিজেকে সংবরণ করলেন। এ গল্পে এভাবে মধ্যবিত্ত মনের কামবিকার ও ইতরতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অপরপক্ষে সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান, স্বামীর কর্তৃত্ব-ও সমালোচিত হয়েছে। এটা যে এক সামাজিক দুর্যোগ সন্দেহ নেই। 'স্বাহা' গল্পটি 'পটলডাঙার পাঁচালী গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলেও সমসাময়িক নয়। (পরিচয়, কার্ত্তিক ১৩৪৩) এ পটলডাঙার নয়, উচ্চবিত্ত সমাজের পচাপাঁচের জীবন। ধাপে ধাপে বড়লোক হয়ে ওঠা মিঃ দাসের মেয়ে লতির রূপে-গুণে তুলনা ছিল না। তার মা মিসেস দাস অর্থের

অহঙ্কারে বিত্তবান সমাজে, পার্টিতে, তাদের রুচির বিকৃতি সুকৃতি বিচার না করেই ঘোরা-ফেরা ক'রে জাতে উঠতে চান। এই সমাজের বখে যাওয়া ছেলে টুটু। লটির মায়ের প্রশ্রয়ে সে এতদূর সাহসী হয়ে উঠেছিল যে একদিন লটিকে সিনেমা দেখিয়ে, বিরতিতে মাদক মেশানো কোল্ড ড্রিঙ্কস্‌ খাইয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে গাড়িতে বারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে যায়। রাত দেড়টায় বাড়ী ফিরে লটি মায়ের সাহায্য নিয়ে ঘরে ঢোকে। কিছুদিন পর আবিস্কৃত হলো সে গর্ভবতী হয়েছে। অপমানে লজ্জায় সে আত্মহত্যা করে। উচ্চবিত্ত সমাজের এই বিকারের চিত্ররচনায় লেখক যথেস্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তবে লেখক ওই সমাজের প্রতি স্পস্টতঃ ব্যঙ্গ প্রবণ নন, নাহলে শ্রেণী হিসেবে লটি চরিত্রের অসহায় কোমল মাধুর্য-ও সমালোচিত হত। 'প্রগতি'তে যুবনাশ্বের মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে একটি গল্প পাই, নাম—"উদয়াচলের সে তীর্থপথে।" জাতিভেদ বিয়ের পথে বাধা ব'লে সঞ্জয় ব্রাহ্ম হয়ে উর্ব্বশীকে বিয়ে করতে চাইলে তার বাবা রেগে যান। অগত্যা সে ল' পাশ করে বিলেত যায়। তারপর, দেশে ফিরে বহরমপুরে আবার দেখা হয় উর্ব্বশীর সঙ্গে—সে তখন বৃদ্ধ স্বামীর তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী। উর্ব্বশীর সম্মতিতে সঞ্জয় তাকে কলকাতায় নিয়ে আসে, কিন্তু একবাড়িতে থেকে-ও উর্ব্বশী তাকে বিয়ে করে না, স্পর্শও করতে দেয় না। সঞ্জয় অবশ্য একেই 'জন্মান্তরের পুণ্যফল' মনে করে। টাইগার হিলে উর্ব্বশীর পতন ও মৃত্যু হয়, সঞ্জয়-ও লাফ দেয়। উর্ব্বশী চরিত্রটি অস্বাভাবিক। মনে হয় লেখক প্রেমের এক কামগন্ধহীন স্বর্গীয় সুষমার কথা বলতে চেয়েছেন। তবে প্রেম সম্পর্কে এ ধারণাতো লেখকের মনের সঙ্গে মেলে না। সেই সবল যুবনাশ্বের পরিচয়ও মেলে না। বরং ওই পত্রিকার 'এয়োতি' গল্পে যুবনাশ্বের স্বধর্ম অনেকাংশে বজায় আছে। মাতাল লম্পটের স্ত্রী একটা টাকা আনতে গিয়ে পান ও অন্যান্য উপকরণ সময়মত স্বামীকে সরবরাহ করতে না পেরে মার খায়। এই লাঞ্ছিতা স্ত্রী এক ভিখিরী বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে কথা বলছিল। বুড়ী এতো দারিদ্র্যের মধ্যেও বুড়োকে ভালবাসে দেখে তার ভাল লাগে। পরের দিন স্বামীর কাছে মেয়েটি তার বাপের বাড়ীর দেওয়া গয়নাগুলো ফেরৎ চায় ও লালসার্ত স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে। সে রাত্রে ভিখিরী বুড়ী তার কাছে হাত পাতলে সে তার সোনা বাঁধানো নোয়াটা তাকে দিয়ে দেয়। নোয়াটা এখানে যথার্থ এয়োতির চিহ্ন, নিজ ব্যর্থজীবনের বৈপরীত্যে ভিখিরী দম্পতির সকল ভাল-বাসাকে যেন নোয়া উপহার দিয়ে স্বীকৃতি জানানো হল। যুবনাশ্বের আরো কয়েকটি গল্পের মত—নারীত্বের অবমাননা এবং প্রেমের স্বীকৃতি এ গল্পের-ও প্রধান উপজীব্য। এই সূত্রেই 'বুচি' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। (১ম প্রকাশ, চতুরঙ্গ শ্রাবণ ১৩৬৫) কিশোর প্রেমের উষ্ণমধুর গল্প। কিশোর কিন্টু কিশোরী বুচিকে

ভালোবাসার বিনিময়ে গাব দিতে চেয়েছিলো, কৃষ্ণযাত্রার প্রভাবে বাছাই বুলি বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই বুচির বোন কিষ্টর কাছা খুলে দিয়ে পালায়। তারপর বাড়ী ফিরে বুচি ও কিষ্ট দুজনেই প্রথম প্রেমের আবেগে, আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। একমাস পর বুচির বিয়ে হয়, কিন্তু চার-বছরের মধ্যে সে বিধবা হয়ে বাড়ী ফিরে আসে। কিষ্ট বাবার দোকানে বসতে না চেয়ে ওভারসিয়ারি পড়তে সহরে যায়। বুচি কিষ্টর মার সঙ্গে কিষ্টর বিয়ের কথা বলে, নিজ বোনের সঙ্গে কয়েকবছর আগের সেই গাব দেওয়া নেওয়া নিয়ে কথা বলে। জানতে পারে, সে ঘটনার পর লজ্জায় কিষ্ট তার বিয়েতেও আসেনি। এদিকে গরমের ছুটিতে কিষ্ট বাড়ি এসেছে। এক কালবৈশাখীর রাত্রি, ঝড়ে সব কিছু তছনছ হয়ে যেতে চায়। কিষ্ট লন্ঠন নিয়ে রাতের অন্ধকারে আম কুড়াতে বেরোয়। তা দেখে বুচি-ও বেরিয়েছে। তার কোনো ভয় ডর নেই বললেও সে কিষ্টকে আগিয়ে দিতে বলে। ইচ্ছে ক'রে আছাড় খেয়ে হাত ধ'রে টেনে তুলে ধরে নিয়ে যেতে ও ঘরের মাচায় বসিয়ে দিয়ে ভোর পর্যন্ত গল্প করতে বলে। আর তারপর হঠাৎ কিষ্টকে কাছে টেনে নেয়। কিন্তু সে লজ্জা পেয়ে বাড়ি ছুটে পালায়। পরের দিন বুচি নিজেকে গুটিয়ে নেয়। রাতের আবেগটাকে ডুবিয়ে মাতৃত্বের বোধে বড়োবয়সী হ'য়ে ওঠে! কিষ্টকে দেখে-ও পায়ের কাপড় না নামানো, পাঁঠার বাচ্চাকে দেখিয়ে সোহাগ জানানোর মধ্য দিয়ে তার ইচ্ছা অবদমনের চেষ্টাটা চমৎকার ফুটে ওঠে। বর্ণনা ও সংলাপে আদ্যন্ত আঞ্চলিক ভাষাশ্রিত এই গল্পে প্রেম সুন্দর আবেদন সৃষ্টি করেছে। তবে এ গল্পে অমলিন রোমান্টিকতা ছাড়া অন্য কিছু নেই। যুবনাশ্বের আর একটি গল্পের নাম— 'রাজিন্দর'। বাংলা কবিতা, মণীশ ঘটক সংখ্যা ১৩৭৯-এ প্রকাশিত এ গল্পটি ঠিক কবে লেখা হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না। গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ ও ইংরাজ শাসকদের চলে যাওয়ার উল্লেখ থেকে পঞ্চম দশকের গল্প বলে মনে হয়। তাঁর বামপন্থী মনোভাব এ গল্পে স্পষ্ট ও সার্থকভাবে শিল্পিত। খুন রাহাজানিতে অভ্যস্ত মকবুল আর এসব করতে চায় না বরং শোষকদের ভুঁড়ি ফাঁসাতেই তার সাধ হয়। শাল্কের রোলিং মিলের মজুররা ময়দানে জমায়েত হচ্ছে, তাদের দাবীর মিটিং হবে। মালিকপক্ষ মিটিং ভাঙতে চায়। খবর পেয়ে মকবুল তার মজুর বন্ধু হামিদ ও রাজিন্দরকে খবরটা দেবে বলে কারখানায় যায়। মকবুল রাজিন্দরের কাছে স্বীকার করে "তোরা যা চাচ্ছিস সে তো একলা কোন আদমির নালিশ না, তোর মতো মেহনতি মানুষের হাজারজনের দাবি।" অতএব রাজিন্দরের সেখানে অংশগ্রহণ জরুরী স্বীকার করেও সে হাঙ্গামার কথা ভেবে তাকে যেতে বারণ করে। কিন্তু রাজিন্দরের দৃঢ়তা দেখে সে বলে "সাবাস! রাজিন্দর বেটা, সাবাস। বেফিকির চলে না মিটিং-এ। বালবাচ্চার

জন্যে ভাবতে হবে না তোকে।" বিকেল চারটের সভায় যথারীতি গণ্ডগোল হল আর রাজিন্দরকে প্রাণ দিতে হল। হামিদ তার মাথা কোলে নিয়ে দাবীর কাগজগুলো দেখিয়ে মজুরদের বলে: "জান দিয়ে রাজিন্দর আমাদের জান বাঁচানোর রাস্তা করে দিয়ে গেছে।" বলাবাহুল্য এ গল্প যুবনাশ্বের পরিবর্তন সূচিত হয়। শ্রমিকজীবনের এই সদর্থক রূপায়ণ তাঁর নিজের সাহিত্যজীবনেরও সদর্থকতাকে স্পষ্ট প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, 'দোস্ত তাদের জাগাও' এবং শহীদ মোহিত মৈত্রের ওপর লেখা কবিতা 'বাঙালীর ছেলে'র (১৯৩৭) জন্য তাঁকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে যেতে হয়েছিল। যুবনাশ্ব যে বিবেকহীনতার পরিবেশেও মাঝে মাঝে নির্মমভাবে সত্যনিষ্ঠ তার পরিচয় শেষ বয়সের কবিতাতেও মেলে। কিন্তু আমাদের আক্ষেপ, এই বামপন্থী যুবনাশ্বের আর কোনো গল্প পেলাম না পরবর্তীকালে।

কল্লোল-পর্বে বরাবরই রোমান্টিক ভাবালুতার পাশে পাশে বাস্তবতার একটা ধারা ছিল। গোকুলনাগের পাশেই ছিলেন শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেবের পাশেই ছিলেন যুবনাশ্ব। বিষয় ও আঙ্গিকে দুইক্ষেত্রে নূতনত্ব সৃজনের তাগিদ থেকেই একদল তরুণ সমাজের নীচুতলার জীবন, তথাকথিত নিষিদ্ধ, অবাঞ্ছিত জীবন নিয়ে গল্প লেখা শুরু করেন। শৈলজানন্দ তুলে ধরেন কয়লাখনির ধূলিমলিন মানুষগুলিকে, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, যুবনাশ্ব আনেন বেশ্যাপল্লী ও বেশ্যাজীবনের নানা পরিচয়, দেখান বেশ্যার মধ্যে মানবীয় গুণবৈচিত্র্য। বিশেষতঃ যুবনাশ্বের লেখায় কাণা খোঁড়া ভিক্ষুক গুণ্ডা চোর পকেটমারের দল ভিড় করে এলো। নীচের মহলের এই ক্লেদজ কুসুমগুলি উপহার পেয়ে আমরা সত্যই চমকে যাই। শরীরী প্রেমের প্রতি আকর্ষণ তরুণ লেখকদের পক্ষে স্বাভাবিক। রক্ষণশীলদের মুখপাত্র সেজে তরুণ সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ করেন, তরুণদের পত্রিকায় স্ত্রী-পুরুষের প্রচলিত পারিবারিক সম্পর্ককেও কু-সংস্কার বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা আছে। যুবনাশ্ব ছিলেন অভিযুক্তদের অন্যতম। তাঁর গল্পগুলি থেকে বোঝা যায়, হয়তো বয়সের কারণেই, দেহলালসা, পাশবিকতা তাঁর অধিকাংশ গল্পেই স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে স্পষ্টবাক্, অথচ অনুচ্ছ্বসিত। কল্লোলের কারুর মধ্যেই এ গুণ ছিল না। তরুণরা কিন্তু অনেকেই নূতনের পক্ষে ছিলেন। যুবনাশ্বের মধ্যে শ্রীঅমলেন্দু বসু 'নির্মম সত্যানুসন্ধান' দেখেছেন। গল্পের সঙ্গে তাঁর কবিতা মিশিয়েই কথাটা সুপ্রযোজ্য মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু 'পটলডাঙার পাঁচালী'কে 'বিশ শতকী হুতোম প্যাঁচার নকশা' বলেছেন।৮ কথাটা আংশিক সত্য, কারণ হুতোম যে সামাজিক পটের ব্যাপ্তিকে ধরতে চান, যুবনাশ্ব তা চান না। হুতোমকে শুধু নীচের মহলের ভাষ্যকার বলা যাবে না। তাঁর পরিহাসপ্রিয় মন আদৌ যুবনাশ্বের সমধর্মী নয়।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যের নূতন, বিদ্রোহাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলি (বিশেষতঃ, প্রেম-চিত্রণে) 'বিদেশের আমদানি' বলেছেন। কথাটায় আংশিক সত্য আছে। সমাজের নীচুতলার জীবনরূপায়ণে, একধরণের দায়িত্বহীন ভবঘুরে চরিত্র নির্মাণে নরওয়ের হ্যামসুন ও রাশিয়ার গোর্কী প্রেরণা জুগিয়ে থাকবেন। পটলডাঙার পাঁচালীর নীচের মহল রচনার পিছনে গোর্কীর Lower Depths-এর প্রভাব থাকতে পারে। যুবনাশ্ব গোর্কী প্রসঙ্গে ১৯৫৮-তে লেখেন—"তুমিই খুললে চোখ। তোমার কীর্তির/দূরাগত পরিচয়ে এলো করে. ভিড়/ভাগ্যহত ভবঘুরে লাঞ্ছিত ভিখারি/বিড়ম্বিত জীবনের নীচতলার সারি।" আর সমসাময়িকতার সাক্ষ্য দিয়ে শ্রীঅমলেন্দু বসু বলেন—"এই সময়েই মণীশদার সাহচর্যে আমরা পড়লাম গোর্কির লেখা।"৯ তরুণ লেখকদের প্রশ্নের উত্তরে গোর্কী জানিয়েছিলেন, তিনি যে এককালে সমাজ পরিত্যক্ত ও নীচুতলার মানুষের সম্বন্ধে লিখেছেন, তার কারণ আছে। তিনি বাস করতেন তুচ্ছ স্বার্থান্বেষী ও বিষয়ী মানুষের মধ্যে, যারা অন্যের রক্তশোষণ ক'রে বড়লোক হবার চেষ্টা করে। এই সব রক্তখেকো মশার মতো মানুষগুলোর প্রতি আত্যন্তিক ঘৃণায় তিনি বেছে নিয়েছিলেন নীচুতলার মানুষকে।১০ যুবনাশ্ব-ও যে অনুরূপ ঘৃণায় মধ্যবিত্ত বাংলাদেশের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু তাঁকে কতটুকু গোর্কীর পথানুসারী বলা যাবে? দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে গোর্কী বলেছেন, তিনি সত্যসন্ধানীর ভূমিকা নিয়ে শুধু পশুপ্রবৃত্তির দিকেই তাকিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য কিন্তু এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো নয়, বরং সমর্থন করে যাওয়া।১১ 'পটলডাঙার পাঁচালী' সম্পর্কে কথাটি প্রযোজ্য। আর, এ গল্পের বইয়ে যুবনাশ্ব খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেন না, কেন মানুষ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পশুর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হতে হয়। একমাত্র কিছু কবিতাই তাঁর পক্ষসমর্থনে দাঁড়াতে পারে। যেখানে তাঁর "রাগী উচ্চারণ ও স্বপ্নিল আশাবাদ, প্রবল আবেগ ও ঘৃণা স্বাভাবিক-বাদের শীতলতাকে উত্তপ্ত করে তোলে।"১২ তবু যুবনাশ্বের স্বল্পসংখ্যক রচনার মূল্য অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা হবে। পটলডাঙার "পরিবেশের কদর্য অন্ধকারে মানুষের জৈবযন্ত্রণার ছবি" পেয়ে আমরা অনালোকিত অথচ বাস্তব একটি জগতের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলুম। তখন থেকেই "ভিখারী সমাজ স্বদাবীতে স্বাধিকারে ঢুকে পড়ল বাংলাসাহিত্যের বাবুসমাজে, তারা থেকেই গেল।"১৩ প্রধানত তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় দু-একজন সংগ্রামী 'রাজিন্দর' তৈরী হল, সংগ্রামের প্রেরণা পেলেন কিছু বিবেকবান লেখক।

|| খ ||

যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালী' শুধু যে বিষয়ের দিক থেকে চমকসৃষ্টি করেছিল তা নয়, আঙ্গিক প্রকরণে-ও যথেষ্ট সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছিল। গঠন বিচারে, বলা যায়, এখানে দু-শ্রেণীর গল্প আছে। কতকগুলি গল্প নিছকই স্কেচ জাতীয় রচনা। বিষয়ের নূতনত্বকে পাঠকের কাছে শুধু উপস্থিত করে দিয়েই যেখানে লেখক কর্তব্য সমাপ্ত করেন : যেমন—গোষ্পদ, পটলডাঙার পাঁচালী, রাতবিরেতে। এদের মধ্যে আছে প্লটের একান্ত অভাব। ডঃ সুকুমার সেন যুবনাশ্বের সবকটি গল্পকেই 'গল্পচিত্র' আখ্যা দিয়েছেন।১৪ পূর্বোক্ত গল্পগুলির ক্ষেত্রে এ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শ্রীযুক্ত ভূদেব চৌধুরী-ও বলেছেন--"প্রথমত ছোট ছোট গল্পের আকারে রচিত হলেও এইসব লেখায় ছোটগল্পের অবয়ব কোনো সুচিহ্নিত রূপ ধরে নি। কেবল ছোটগল্পের কেন, যুবনাশ্বের এই সব গল্পে পরিচ্ছন্ন কোনো প্রকরণ-চিন্তার পরিচয়ই নেই।"১৫ এখানেও বলার কথা, এ মন্তব্য নি:সন্দেহে পূর্বোক্ত গল্পত্রয়ীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে, যুবনাশ্বের আর কতক-গুলি রচনা আছে, যাদের ছোটগল্প আখ্যা দিতে আমরা বাধ্য। এ রকম রচনা হল—কালনেমি, মন্বন্তরশেষ, মৃত্যুঞ্জয়, ভুখাভগবান, দুর্যোগ, স্বাহা, রাজিন্দর। দেখা যাচ্ছে এদের সংখ্যাই বেশী। এসব গল্পে লক্ষ্য ও ফলাফলের একমুখিনতা আছে, সূচনা ও সমাপ্তির ইঙ্গিতধর্মিতা আছে, বর্ণনা ও সংলাপে তির্যকতা আছে—যা সার্থক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

আমরা আপাততঃ তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি সূচনা ও সমাপ্তি অংশের উদাহরণ দিই :—(ক) 'সন্ধ্যের মহড়ায় চোরের মতো ইদিক-উদিক তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে আস্তানার গের্দয় পা দিতেই বাঞ্ছার কানে এল খেঁদি-পিসীর কটকটে বাজখাঁই গলার আওয়াজ, কি রে মড়া, হয়েছে কি ? অত হাঁপাচ্ছিস কেনে ? কি ওটা তোর কাঁকে ?' (মন্বন্তরশেষ) গল্পের এই সূচনাংশ আদর্শ ছোটগল্পের ধর্ম বজায় রেখেছে। পাঠক মুহূর্তের মধ্যেই এক অপরিচিত জগতে গিয়ে উপস্থিত হয়, উল্লিখিত চরিত্রগুলি এবং তাদের সংলাপ পাঠক-মনে নানান কৌতূহল জাগ্রত ক'রে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত ছোটগল্প 'বিকৃতক্ষুধার ফাঁদে'র সূচনার কথা এখানে মনে না পড়ে পারে না। দুইক্ষেত্রেই নীচের মহলের ছবি, মানুষের সংলাপে গল্প শুরু হয়েছে। 'মন্বন্তরশেষ' গল্পকে যুবনাশ্ব শেষ করেছেন একটি চরিত্রের বিদ্রূপের মধ্যে—"কথাটা শেষ করে আর একবার হুল্লোড় করে বাঞ্ছারাম হেসে উঠল।" যেখানে সমস্ত মানবিক সুকোমল অনুভূতিগুলি পরিত্যক্ত, সেখানে মাতৃভাবকে বাঞ্ছারাম বিদ্রূপ করায় বিন্দীর কারুণ্যই তীব্রতায় প্রকাশ পেয়েছে।

(খ) "কম্পিত ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দাস সায়েব উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন।" (স্বাহা) এই সূচনা থেকে কোনো একটা অবাঞ্ছিত অঘটনের প্রতিক্রিয়া

যে দাস সাহেবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেটা বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। এ গল্পের সমাপ্তি এরূপ : "ডাকু কাজে লাইনে ছিল। ফিরে চিঠি পেয়ে, সে লটিকে নিতে এসেছিলো, এইটুকু লটির জেনে যাওয়া হয় নি"। —এই সমাপ্তি উচ্ছ্বাসবর্জিত, মিতবাক, ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। লটির ভাগ্য-বিপর্যয় সম্পর্কে লেখকের সূক্ষ্ম আয়রনিটুকু এই সমাপ্তি অংশে সুন্দর ধরা পড়েছে। 'মন্থশেষ' গল্পে লক্ষ্য ও ফলাফলের একমুখিতা মোটামুটি রক্ষিত। গল্পে অমানুষদলের মধ্যে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও তার পরিণাম বর্ণিত। 'স্বাহা' গল্পের বিষয় বিকারগ্রস্ত ধনীর লালসা ও ছলনায় সরল মেয়ের আত্মাহুতি। পতিপত্নী সম্পর্কের ও বাৎসল্যের প্রচলিত পবিত্রতার ধারণা ভেঙে যাওয়ার গল্প 'কালনেমি'। মেহনতি মানুষের দাবীর লড়াইয়ে জান দিয়ে জান বাঁচানোর গল্প 'রাজিন্দর'। সুতরাং, নির্দ্বিধায় এগুলিকে ছোটগল্প বলা যাবে।

যুবনাশ্বের গল্পের চমকসৃষ্টিতে সংলাপ উপযোগী ও সহায়ক হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ ঃ— (ক) এই মাগী, তু কে লা ? (খ) ভ্যালা ঠ্যাকারের মধ্যে পড়ন্ যে। (গ) রুপুসি। কেলি শেষ করে দুপুর-রাতে কোঁদল করতে এলেন। বলি রূপ দেকে ক'জনার মন মজল লো, ক'জনার ট্যাঁকে হাত বুলোলি ? (ঘ) আবার একটা কাঁটা খসেছে ত' কি নাগিয়েচে দ্যাকো না। (অর্থাৎ গর্ভপাত বা গর্ভ হওয়া) (ঙ) গোড়ায়ই খাম করে দিস না সেগুলোকে। (অর্থাৎ, পঙ্গু করে দেওয়া) বাংলা গল্পে এইসব সংলাপ বৈচিত্র্য আনল, নূতন জগতের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঠিকই বলেছেন—"ভাষা কেবল 'শক্ত ও জোরালো' নয়, যে কদর্য পরিবেশের মধ্যে এরা বাস করে, সেই জীবন-পরিবেশ ও প্রবৃত্তি-সর্ব্বস্ব মানুষগুলির চরিত্র এই সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।"১৬ এই সঙ্গে উপরতলার মানুষের সংলাপ রচনাতেও তাঁর দক্ষতা স্মরণীয়। যেমন—"কি হবে দেখা করে ? ওখানে গেলেই তো ভায়োলেট মিত্তিরের ক্যাটকেটে গলার সুর ভাঁজা, না হয় রেণু চৌধুরীর damned Bengali Songs শুনতে হবে।" (স্বাহা) যুবনাশ্বের লেখকচরিত্রের (ব্যক্তি নয়) অনুচ্ছ্বসিত স্বভাবই তাঁর সংলাপে লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গল্পগ্রন্থটিতে তিনটি পৃথক স্তরের মানুষের সংলাপ আছে—নিম্নতম, মধ্য ও উচ্চবিত্ত। এই তিন ধরণের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি সংলাপের শব্দ নির্বাচনে ও বাক্যচয়নে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

যুবনাশ্বের গল্পকে বর্ণনাপ্রধান বলা যাবে না। তা' অনেকাংশে নাট্যধর্মী। তবুও মাঝে মাঝে স্বল্প-সংহত বর্ণনা লেখকের আতিশয্য, উচ্ছ্বাসবর্জিত স্বভাবের পরিচায়ক, যা কল্লোলীয়দের মধ্যে যথেষ্ট ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়তঃ, তাতে অবাস্তবতা, অস্বাভাবিকতা

থাকলেও কম। দু-চার-জায়গায় কিঞ্চিৎ প্রদর্শনমুখিতা অবশ্য আছে। যুবনাশ্বের বর্ণনায় বীভৎসতার দিকে ঝোঁক ছিল একসময় প্রবল। যেমন ঃ— (ক) পটলডাঙার বীভৎস পরিবেশ ঃ "সার সার মাটি-লেপা অন্ধকূপ। বিশ্রী গন্ধ। নোংরা। একটা ঘর থেকে অনবরত ধোঁয়া বার হয়ে দম ফেলবার উপায়টুকুও বন্ধ করেছে। একটা ঘরে কে মরেছে। মড়াটা টান দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটু ঢাকাও নেই—সর্বাঙ্গ মাছি ও পোকায় ছাওয়া।" যুবনাশ্বের এমন বর্ণনায় আছে প্রথাসিদ্ধ রোমান্টিকতাকে সক্রোধে পাশ কাটিয়ে অপরিচিত বাস্তবতাকে অধ্যয়ন ও রূপায়ণের চেষ্টা। এইরকম নমুনা মিলবে 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামের রচনার সূচনায়। অন্যত্র শরীর-বর্ণনার ক্ষেত্রেও এই বীভৎসতা আছে— (খ) "ঝাঁপ ঠেলে সদি ঘরে ঢুকল। তার বাঁদিকের গালের মাংস নেই—দুপাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। চিবি (চিবি ?) কপালের ওপর উষ্কখুষ্ক চুলগুলি বিঁড়ে করে বাঁধা। পরনের ছেঁড়া কানিটা একধারে অনেকটা উঠে গেচে, আর একধারে হাঁটু পর্যন্ত নাবানো। গায়ের শতচ্ছিন্ন আঁচলটা না থাকারই মতো।" এরকম শরীরী বর্ণনা অন্যত্রও আছে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই বুদ্ধদেব বসু পরবর্তীকালে যুবনাশ্বের বর্ণনাভঙ্গিকে "ঝাঁঝালো" আখ্যা দিয়েছিলেন।[১৭] পটলডাঙার দলের লোকদের সংলাপের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে বর্ণনাও অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিলে মিশে গিয়েছে। এর পাশে অন্যধরণের ভাষা ব্যবহারও আছে। (গ) 'দূর অতীতের কবরের তলা থেকে একখানা মুখ তার মুগ্ধদৃষ্টির ওপর ফুটে উঠল—বাপের ঠ্যাঙানোকে অভিভূত করে শান্তি প্রলেপের মত যার চোখের জল তার ব্যথাজর্জ্জর সর্বাঙ্গে একদিন ঝরে পড়েছিল, মুখখানা তার।" —সদির দুঃখবর্ণনায় এই ভাষা ব্যবহার কিছুটা বেমানান অস্বীকার করা যায় না। কিংবা, লেখক যখন লেখেন, 'খেঁদি বেকুবের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, **কথিত জায়গা থেকে** পয়সা বার করে নিল' তখন ভাষাগত ভারসাম্যের হানি হয়। যেমন হয় এই বর্ণনায়—"ডেকের **মথিত বিধ্বস্ত জনসংঘের মধ্যে** হাতড়ে হাতড়ে পথ ক'রে নিয়ে অবিনাশবাবুর খোঁজ শুরু করলাম।" তবে তৎসম শব্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও রাস্তার ভাষা অবলীলায় ব্যবহারে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। (ঘ) "মিসেস দাসকে হৃদয়হীনা মনে করলে ভুল করা হবে। হৃদয় তাঁর সত্যিই ছিল, শুধু মায়া মমতার জায়গায় সোসাইটি ও ফ্যাসন তাঁর সবটুকু জুড়ে ছিল।" (ঙ) "কুড়ি বছর বয়েসে তার পিয়ানোবাদন ও ইংরেজী অভিনয় পটুতার খ্যাতি দার্জিলিং মেলে সাঁড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছালো।" এই দুটি বর্ণনার বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির সঙ্গে তুলনীয়। (চ) "দিকব্যাপী নিবিড় নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানহীনা ধর্ষিতা নারীর বুকটা সমান তালে কেঁপে যেতে লাগল।"

(ছ) "শিকার কায়দায় পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন উদ্বিগ্ন আনন্দে গোঙরাতে থাকে, সমস্ত আকাশজুড়ে তেমনি একটা শব্দ হচ্ছে।" এই দুটি বর্ণনা (চ, ছ) গল্পগুচ্ছের অনুসারী। (জ) "তাই দৈত্যপুরীর সব ক'টা দানব যখন বাঁধনহারা উন্মত্ত উল্লাসে একসাথে ঘাড়ে এসে পড়লো, তখন একটা উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া সাহসে মনটা ভরে উঠল।" 'শ্রীকান্ত' (১ম) উপন্যাসে সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের বর্ণনায় দৈত্যের ব্যবহার আলোচ্য ঝড়ের বর্ণনার ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

যুবনাশ্বের রচনায় প্রকৃতি বর্ণনা বিরল হয়েও মেলে। যেমন— (ক) "কিন্তু প্রভাতের সজীবতা এখনো পটলডাঙার পচা পাঁকের পাহারা পেরিয়ে আস্তানায় কুঁড়েগুলোর ভেতরে উঁকি দিতে সাহস পায় নি।" (খ) "তেতলার একটা জানলা থেকে খানিকটা আলো বেরিয়ে এসে জমাট কুয়াসার জালে আটকা পড়ে থেমে গেচে।" (গ) "আম বাগিচার চেহারাডা ভালোবাসার রাত্রশেষে সোয়ামী স্ত্রীর বিছানার মতন।" এই তিনটি বর্ণনার নৈপুণ্য ও নতুনত্ব প্রশংসনীয়। 'গ'-এর বাড়তি আকর্ষণ উপভাষা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই গল্পটি (দলছুট বুটি) আলাদা উপভাষায় রচিত হ'য়ে আঞ্চলিকতার আস্বাদকে সুন্দর-ভাবে উপস্থিত করছে।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে, সংলাপে ব্যবহৃত অপরিচিত বা বিকৃত শব্দ নির্বাচনে লেখকের দক্ষতা বিস্ময়কর। যেমন—তু, কিচু, সুয়োরানী ঘাগী, দমবাজী, গের্দ, কপ্চাস, গুয়োটা, নিকুচি, চুনকুটী, গোঙড়ানি, ডমফাই, মদ্দমারা, দোহাত্তা, পেথম, দকুর, হুদাহুদি, গওনা, ভুরভুরি, বুকফাড়া ইত্যাদি। সহজেই বোঝা যায়, তৎসম থেকে বিকৃত ও অপাংক্তেয় শব্দে যুবনাশ্বের দখল জমানো।

গল্পরীতির এইসব উদাহরণ যুবনাশ্বের অনন্যসাধারণ দক্ষতাই সুপ্রমাণিত করে। দুর্ভাগ্য আমাদের, বাংলাগল্পে যুবনাশ্ব যে বিস্ময় নিয়ে এসেছিলেন, কল্লোলযুগে যে স্বতন্ত্র চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব তিনি আর পালন করলেন না।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছিলো	হবে
১৪	২১	তেমমি	তেমনি
২৩	১৮	আসদিবিহীন	আসক্তিবিহীন
২৮	১০	শেষপ্রশ্ন	শেষপ্রশ্নে
৩৮	২৪	উচ্ছৃঙ্খলতার পরিমণ্ডল	উচ্ছৃঙ্খলতার পরিমণ্ডলে
৪৮	৪	চূড়ান্তে	চূড়ান্ত
৬০	৩০	পরিচিত	পরিচিতি
৬১	৯	তা বলা কারণ	কারণ তা বলা
৬৪	২৮	আত্মনিরোগ	আত্মনিয়োগ
৭৪	২০	দালিয়া	দুরাশা
৮৪	১৭	১৫৪	১৩৫৭
৮৫	২০	সাহসিকতার	সাহসিকতায়
৮৭	২৯	অধ্যাত্র	অধ্যাত্ম
৮৮	১৯	fand	fund
৯০	২০	৪৯৯	৪৩৭
৯০	২৫	৪৯৪	৪৩৩
১০৬	৭	রাত্রে হাঁটছে	রাত্রে পথ হাঁটছে
১১৪	১৯	হলে	হলো
১১৯	১৯	সমাজপাটে	সমাজপটে
১২৪	১৫	সুখটার	মুখটার
১২৪	১৯	১৪২	১৩৪২
১২৭	২	স্বগতোত্রির	স্বগতোক্তির
১২৭	১৫	বন্ধ	বন্ধু
১৩১	২৯	বিতারিত	বিতরিত
১৩২	৮	পূর্ববর্ত্তী	পরবর্ত্তী
১৩৭	২০	(গ)	(ঘ)
১৩৮	৭	স্বরণীয়	স্মরণীয়
১৩৮	৩০	মুত্রির	মুক্তির
১৩৯	৩০	বকনি	বুকনি
১৪১	১৮	১৯৩১	১৩৩১
১৪৫	১৩-১৫	(ব্র্যাকেট)	১২-র পংক্তিতে
১৪৮	৪	ডাঙ্গার	ডাক্তার
১৪৮	২০	গুরুত্ব	গুরুত্বপূর্ণ
১৬৬	১৪	সাহস	সহসা
১৭৭	১৪	সেকালে	ভোলা সেকালে
১৯৫	২১	কাৰ্ত্তিক	বত্তি কা